প্রকাশক ঃ
মোহাম্মদ জিনাতউল্লাহ
ষ্টুডেন্ট ওয়েজ
বাংলা বাজার, ঢাকা-১

প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন ১৯৬৯

প্রচ্ছদপট ঃ মোহাম্মদ ইদ্রিস

ব্লক ঃ রূপরেখা

মুদ্রাকর ঃ
আবুল কালাম ফিরোজ এম. এ.
সারওয়ার প্রিন্টিং হাউস
১৬/২, পাঁচ ভাই ঘাট লেন
ঢাকা-১
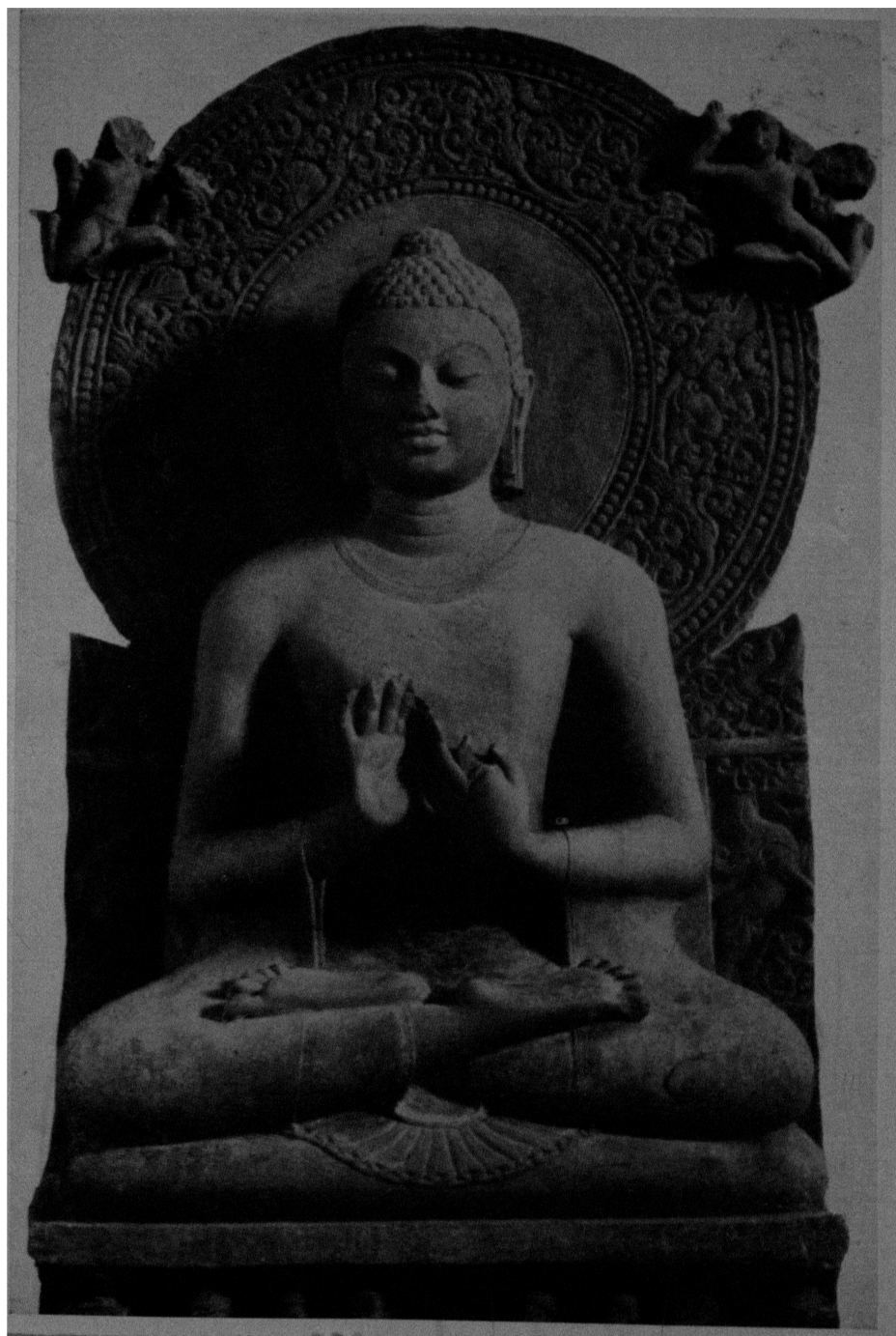
প্রণতি

আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলংকার নয়, একান্তে নিভৃতে যা তাঁকে বার-বার সমর্পণ করেছি সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রবাণী

এই ইতিহাসের [ভারতীয় সংস্কৃতির] বহুতর উপকরণ যে বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে বহুদিন-অনাদৃত এই বৌদ্ধশাস্ত্র য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন আমরা তাঁহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লজ্জার কারণ। সমস্ত দেশে পাঁচজন লোকও কি বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধার করাকে চিরজীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন না? এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে।

—ধম্মপদং, প্রাচীন সাহিত্য

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা প্রাচীন কাল হইতেই দেখিয়াছি, জড়ত্বের বিরুদ্ধে তাহার চিত্ত বরাবরই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে, ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌—তাহার উপনিষদ্‌, তাহার গীতা, তাহার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম, সমস্তই এই মহাযুদ্ধে জয়লব্ধ সামগ্রী।

—ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা, পরিচয়

বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধ-সভ্যতার প্রভাবে এদেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই।

—যাত্রার পূর্বপত্র, পথের সঞ্চয়

আমার শিক্ষাগুরু

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

ভগবান বুদ্ধ তথা বৌদ্ধসংস্কৃতির মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে। এই প্রকাশের দীপ্তিতে ভারতের মহিমা একদিন সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের বাণীসাধনায় বৌদ্ধসংস্কৃতির এই কালজয়ী মহিমা সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে বুদ্ধ ও বৌদ্ধসংস্কৃতির যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে তার তুলনা বিরল। রবীন্দ্রসাহিত্যের এই বিশেষ দিক্‌টি নিয়ে ইতিপূর্বে কিছু-কিছু আলোচনা হয়েছে বটে, কিন্তু আজও কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয় নি। এদিকে প্রথমে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আমার শিক্ষাগুরু বিশ্বভারতীর প্রাক্তন রবীন্দ্র-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়। পরবর্তী কালে তাঁরই প্রবর্তনায় আমি এরকম একখানি গ্রন্থ রচনায় আগ্রহী হই। গ্রন্থের বিষয়-বিন্যাসের পরিকল্পনাটিও তাঁরই নির্দেশক্রমে রচিত। পাঠকের পক্ষে বইখানি অনুসরণের সৌকর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিম্নে প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রধান বক্তব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

গ্রন্থের অবতারণা হিসাবে প্রথম অধ্যায়ে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের উদ্‌ভব ও পরিণতির ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া হয়েছে। এই অংশটি আলোচ্য বিষয়ের ভূমিকা মাত্র। তাই এই অংশটুকু সংক্ষেপে বিবৃত করতে হয়েছে। কিন্তু স্বল্প পরিসরের মধ্যেও অধ্যায়টিকে যথাসম্ভব পূর্ণতা দানের প্রয়াস পেয়েছি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমন পরিচয় দেওয়া তখন সম্ভবও ছিল না। আর, আধুনিক কালের বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে নূতন আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয়েছে, তা নলিনীনাথ দাশগুপ্ত-প্রণীত 'বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থের আলোচনা-পরিধির অন্তর্ভুক্ত হয় নি। বর্তমান গ্রন্থের অবতারণায় সেই দিক্‌টির উপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব দান করা হয়েছে। কারণ বাংলাদেশের এই পুনরুজ্জীবিত বৌদ্ধচেতনা রবীন্দ্রচিত্তে বৌদ্ধসংস্কৃতি সম্বন্ধে গভীর ঔৎসুক্যের সঞ্চার করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্রজীবনের বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির চেতনাসঞ্চারে সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ ও ভাবধারার একটা সুস্পষ্ট আভাস দানের প্রয়াসী হয়েছি। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চার কেন্দ্র স্থাপন এবং এশিয়ার

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বুদ্ধদেবের চরিত্রমহিমা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা আলোচিত হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। অন্যদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্যটুকু পরিস্ফুট করার চেষ্টাও আছে এই অধ্যায়ে। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বুদ্ধদেবের পরেই অশোকের স্থান। সেজন্য এই অধ্যায়ে অশোকের সম্বন্ধে আলোচনা করাও সমীচীন বোধ করেছি।

রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শে, শিক্ষাদর্শে ও সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তার বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। বৌদ্ধধর্মের মূলনীতিগুলিকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দেখেছেন, যথার্থ ইতিহাসের বিচারে তা কতখানি স্বীকার্য সে বিষয়েও বিশদভাবে আলোচনা করতে চেষ্টিত হয়েছি।

পঞ্চম অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রধান সাদৃশ্য ও পার্থক্য কোথায় তা সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

এই গ্রন্থ রচনায় যেসকল প্রামাণ্য পুস্তক ও প্রবন্ধ থেকে উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, গ্রন্থশেষে উৎসনির্দেশে তার একটি তালিকা দেওয়া গেল।

গ্রন্থখানি মূলত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-নিবন্ধ হিসাবে রচিত। এ বিষয়ে আমার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রবীন্দ্র-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয়। তাঁর সস্নেহ আনুকূল্য ও উপদেশ এই কাজে আমাকে নিরন্তর উৎসাহিত করেছে। নিবন্ধটি ১৯৬৬ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.ফিল. উপাধি-লাভের যোগ্য গবেষণা-নিবন্ধ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বর্তমানে এটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় ভূমিকা লিখে দিয়ে গ্রন্থখানির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন সাধকপ্রবর শ্রীমৎ আনন্দমিত্র মহাস্থবির মহোদয়ের উৎসাহ ও আশীর্বাদ গ্রন্থ রচনাকালে আমাকে নিয়ত প্রেরণা ও শক্তি দান করেছে।

বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় ও বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয়ের সহায়তা পেয়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছি।

আর যাঁদের কাছে আমি উৎসাহ ও সহায়তা পেয়েছি তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্ত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তান য়ুন-শান, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা শ্রীমতী গৌরী সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থশেষে সংযোজিত 'নামনির্দেশ' প্রস্তুত করে দিয়েছেন রবীন্দ্রভারতীর সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রীদীপককুমার বড়ুয়া। বন্ধুবর রথীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রুফ দেখার কাজে সাহায্য করে আমার ভার লাঘব করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা তিনটির লিপিচিত্র ও গ্রন্থের পরিশেষে সংকলিত 'বুদ্ধদেব' প্রবন্ধটি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত। বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুশীলকুমার রায় ও বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনের সহ-পরিচালক শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় এ বিষয়ে আমার সহায়তা করেছেন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সানন্দে তাঁর সংগৃহীত বোরোবুদুরে রবীন্দ্রনাথ চিত্রখানি প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে সন্নিবিষ্ট বুদ্ধদেবের আলোকচিত্রখানি অধ্যাপক শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী মহাশয়ের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত।

সাহিত্য-সংসদের কর্ণধার শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সাগ্রহে এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। এই প্রকাশনের কাজে শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষের সাহচর্য আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

সর্বশেষে স্মরণ করি বিশ্বভারতীতে আমার ছাত্রজীবনের অন্যতম অধ্যাপক অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেনের নাম। তাঁর সস্নেহ প্রেরণা ও আন্তরিক আগ্রহ ব্যতীত এত অল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হত না।

এঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ
কলকাতা-৯
মধুপূর্ণিমা, ১৩৭৪

সুধাংশুবিমল বড়ুয়া

আশীর্বাদ

এই গ্রন্থের লেখক শ্রীমান্ সুধাংশুবিমল বড়ুয়া আমার পরমস্নেহভাজন ছাত্র। তিনি যখন প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন তখনই তাঁর অকৃত্রিম সরল প্রকৃতি ও জ্ঞানার্জননিষ্ঠা দেখে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কিছুকালের মধ্যেই পালিসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান এবং রবীন্দ্রসাহিত্য তথা ইতিহাসের প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় পেলাম। মনে হল তাঁকে যদি রবীন্দ্র-চিন্তায় ও সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের প্রতিফলন সম্বন্ধে গবেষণায় উৎসাহিত করা যায় তা হলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। আমার এই আগ্রহের মূলে যে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার প্রেরণা কাজ করছিল তার কথা একটু বলা প্রয়োজন।

অতীত কালের বিভিন্ন পর্যায়ের বিচিত্র চিন্তা, কর্ম ও ঘটনাবলীর প্রভাব কোনো কালেই নিষ্ক্রিয় বা নিষ্ফল হয়ে যায় না। চিরকালই তার ক্রিয়া চলতে থাকে, আর তার ফলও ফলতে থাকে। আধুনিক কালটা তো সমগ্র অতীত ইতিহাসেরই সংহত রূপ মাত্র। আমাদের দেশের ইতিহাসে মানুষের মনে যত ধ্যান ও মনন, যত আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প, যত সুখ-দুঃখ ও আশা-নৈরাশ্য যুগে যুগে উত্থিত, আবর্তিত ও বিলীন হয়েছে, আমাদের বর্তমান কালের মানস-সত্তা তারই সমন্বিত ও পরিণত ফল ছাড়া আর কিছুই নয়, আর তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে ভাবী পরিণামের বীজ। আমাদের সমগ্র ইতিহাসটাই আমাদের অবচেতনায় নিগূঢ়ভাবে বিরাজমান থেকে ভাবী পরিণতির জন্যে কাজ করে চলেছে। মানুষের একটা সাধনা হচ্ছে সেই অতীত চিন্তা, কর্ম, সংকল্প ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারাকে অবচেতনার অনালোকিত গভীরতা থেকে চেতনার আলোকে তুলে আনা, নীরব অতীতকে বর্তমানের কাছে কথা বলানো। এই সাধনার মূলে যে শক্তি কাজ করে তারই নাম ইতিহাসবোধ। এই ইতিহাসবোধের ফলেই অতীত ভারত রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে উজ্জ্বল মূর্তিতে ধরা দিয়েছিল, আবার তাঁর অনুভূতিতেও প্রবল আবেগ সঞ্চার করেছিল। এই আবেগই স্পন্দিত হয়ে উঠেছে তাঁর এই উক্তিতে—

> "তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে,
> কেহ নহে নহে দূর,—
> আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
> তারি বিচিত্র সুর।"

এই অনুভূতির প্রেরণাতেই তাঁর মনে নীরব স্তব্ধ অতীতকে মুখর করে তোলার, বিগত দিনের মূক মুখে ভাষা দেবার আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। তাই তিনি বলেছেন—

"হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও।
… …
তব সঞ্চার শুনেছি আমার
মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয়
রেখে যাও মোর প্রাণে!
হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা-মাঝে
স্থির হয়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে
কথা কও, কথা কও॥"

রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে ভারতবর্ষের সমগ্র অতীত কালটাই যেন মুখর হয়ে উঠেছিল। তিনিও যেন অতীতের বাণী শোনবার জন্য কান পেতেই থাকতেন। বস্তুতঃ তাঁর—

"আমি কান পেতে রই আমার আপন হৃদয়গহন-দ্বারে।
কোন্ গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শুনিবারে॥
… … …
মাঝে মাঝে তার বারতা আমার ভাষায় পায় কী কথা রে,
ও সে আমায় জানি পাঠায় বাণী গানের তানে লুকিয়ে তারে॥"

এই উক্তিটি গোপন সঞ্চারী অন্য সব-কিছুর মতো দেশের অতীত কাল সম্বন্ধেও সমানভাবেই খাটে। অর্থাৎ বিস্মৃত অতীতও রবীন্দ্রনাথের হৃদয়দ্বারে আঘাত করেছে, তাঁর কানে নিজের বাণী পৌঁছে দিয়েছে, আর তাঁর ভাষায় আপন ভাষা পেয়েছে। তাই তো আজ তাঁর কবিতায় ও গানে এমন করে অতীতের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, তার হৃৎস্পন্দন অনুভব করতে পারছি।

রবীন্দ্রনাথের হৃদয় দিয়ে যেমন আমরা অতীত ভারতের হৃদয়কে অনুভব করি, তেমনি তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে দেখতে পাই তার সত্যস্বরূপটিকে। অতীত ভারতের রসরূপটি ধরা দিয়েছে তাঁর গানের সুরে ও কবিতার ছন্দে, আর তার সত্যরূপটি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গদ্যরচনার মননদীপ্তিতে।

বৈদিক কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসের সমস্ত যুগই রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে এই দুই রূপে। এই বিষয়টা অনুভব করে বহুকাল পূর্বে আমি রবীন্দ্রনাথের ভারতবোধ ও ভারতদৃষ্টির আলোচনায় ব্রতী হই এবং ক্রমে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। তার মধ্যে কতকগুলি সংকলিত হয়েছে আমার 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। এ কাজ করতে গিয়ে আমি অনুভব করি যে,—বুদ্ধদেবের চারিত্রমহিমা ও তাঁর প্রবর্তিত নীতি-ধর্মের প্রেরণায় একসময়ে ভারতের জাতীয় স্বভাব ও সংস্কৃতির যে অপূর্ব উজ্জীবন ঘটেছিল, রবীন্দ্রসাহিত্যে তার প্রতিফলিত সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব অন্য কোনো যুগের তুলনায় নিষ্প্রভ নয়। আরও অনুভব করি যে, এ বিষয়ে আরও গবেষণা এবং একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার প্রচুর অবকাশ ও প্রয়োজনীয়তা আছে। কিছুকাল পরে শ্রীমান্ সুধাংশুর যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে তাঁর উপরেই এ কাজের ভার ন্যস্ত করি এবং তাঁর আগ্রহ দেখে বিষয়ানুক্রমে গবেষণার পরিকল্পনাও রচনা করে দিই। তাঁর প্রতি আমার এই আস্থার মর্যাদা তিনি রক্ষা করেছেন। যে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় সহকারে তিনি এ কাজ সম্পন্ন করেছেন তা গবেষকমাত্রের পক্ষেই প্রশংসনীয়। আমি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর গবেষণা-কাজের নির্দেশক না হলেও তিনি গ্রন্থরচনার প্রত্যেক পর্যায়েই আমার সঙ্গে যোগরক্ষা করে চলেছেন। তাঁর এই একনিষ্ঠ সাধনা ব্যর্থ হয় নি। এ কাজের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-ফিল উপাধি দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। এই স্বীকৃতির গুরুত্ব হানি না ঘটিয়েও বলতে পারি, তাঁর সিদ্ধিলাভের এটাই শেষ কথা নয়। রবীন্দ্রসংস্কৃতির এই বিশেষ দিক্‌টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বাংলাসাহিত্যকে যে সমৃদ্ধি দান করলেন তার মূল্যই বেশি। আশা করব অতঃপর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা এ দিকে আকৃষ্ট হবেন এবং নূতন আলোক-সম্পাতে রবীন্দ্রচর্চার এই বিভাগটিকে পূর্ণতা দান করবেন। সকলেই যে গ্রন্থকারের সঙ্গে সব বিষয়ে একমত হবেন তা আশা করা যায় না। তাঁরা হয়তো পূর্ণতর এবং সুচারুতর গ্রন্থ রচনাও করবেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পথিকৃতের মর্যাদা তাঁরই থেকে যাবে। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও ভবিষ্যতে তাঁর এই প্রথম প্রয়াসের উন্নতিসাধনে ও পূর্ণতাবিধানে কারও চেয়ে পিছনে পড়ে থাকবেন না, অর্থাৎ এ বিষয়ে শুধু পথিকৃৎ নয়, অগ্রণীর মর্যাদাও তিনি লাভ করতে পারবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

গ্রন্থরচয়িতা হিসাবে সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীমান্ সুধাংশুর এই প্রথম পদক্ষেপ। এই প্রথম প্রচেষ্টাতেই তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাতে আশা করা যায়, এই সাফল্যই তাঁর শেষ পরিচয় হয়ে থাকবে না, বরং এ সাফল্য তাঁকে এগিয়ে নিয়ে চলবে নবতর ও মহত্তর সার্থকতার অভিমুখে। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু, শুভযাত্রাপথে অগ্রসর হয়ে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগকেও তিনি সমৃদ্ধ করতে থাকুন, শিক্ষক হিসাবে নবীন গ্রন্থকারের প্রতি এই আমার আন্তরিক আশীর্বাদ।

'রুচিরা'
শান্তিনিকেতন
১লা আশ্বিন, ১৩৭৪

প্রবোধচন্দ্র সেন

বিষয়নির্দেশ

প্রথম অধ্যায়

অবতারণা : বাংলায় বৌদ্ধধর্ম

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ক। জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যে : প্রাচীন ও মধ্যযুগ

বাঙালি জাতির কীর্তিতে কর্মে ও ধ্যানধারণায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অপরিসীম। বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে আসার সময় থেকে বাংলার জাতীয় জীবনে এক সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটে। বাংলার ইতিহাসে বৌদ্ধযুগ চিন্তায়-কর্মে শিল্পে-সাহিত্যে রাষ্ট্রসাধনায় ও প্রাণচেতনায় যে আদর্শ স্থাপন করেছে তা বাঙালি জাতির পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নয়। বস্তুত বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক প্রমথ চৌধুরীর কথায় বলতে গেলে, "বাঙালী সভ্যতার বুনিয়াদ যে বৌদ্ধ, হিন্দুস্তরের দু-হাত নীচেই যে বাংলার বৌদ্ধস্তর পাওয়া যায়, আজকের দিনে তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।"[১] আবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই সময়ে বাঙালির প্রভাব-প্রতিপত্তি বাংলা তথা সমগ্র ভারতের জন্য একটি স্থায়ী গৌরবের আসন অধিকার করে নেয়। আর কোন যুগেই বাংলাদেশ যুগপৎ স্বদেশ ও বিদেশে এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

মৌর্যসম্রাট অশোকের (খ্রী. পূ. ২৭৩—২৩২) সময় বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কালক্রমে বিস্তার লাভ করে। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়, পঞ্চম শতাব্দীতে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রভাব ছিল। পঞ্চম শতকের গোড়ার দিকে ফা-হিয়ান চম্পা থেকে গঙ্গার তীর বেয়ে বাংলাদেশে আসেন। তিনি তাম্রলিপ্তিতে দুই বৎসর অবস্থান করে বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা করেন এবং বুদ্ধমূর্তির ছবি আঁকেন। তিনি তাম্রলিপ্ত নগরীতে বাইশটি বৌদ্ধ বিহার দেখেন। সেখানে প্রত্যেক বিহারে বহু ভিক্ষু-শ্রমণ বাস করতেন। তিনি আরো বলেন, বৌদ্ধধর্ম তখন সেখানে সমৃদ্ধির পথে।[২] তাম্রলিপ্তিতে বৌদ্ধধর্মের তৎকালীন সমৃদ্ধির অবস্থা থেকে বাংলাদেশের অন্যত্রও অনুরূপ অবস্থা অনুমান করা যায়।

---

[১] প্রমথ চৌধুরী, বৌদ্ধধর্ম, 'নানাচর্চা', পৃ. ৭৯। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থের ভূমিকা-স্বরূপ লিখিত।

[২] Li Yung-hsi Ed. *Fa-hsien's Record of Buddhist Countries*, p. 77. The Chinese Buddhist Association, Peking.

ত্রিপুরা জেলার গুনাইগড়ে ৫০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ মহারাজ বন্যগুপ্তের একখানি তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, আশ্রমবিহার ও বিহারের অধিবাসী ভিক্ষুসঙ্ঘের সংরক্ষণের জন্য এক ভূমিখণ্ড দান করা হয়। তা ছাড়া উক্ত তাম্রশাসনে আশ্রমবিহারের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এক রাজবিহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩] হয়তো কোন রাজা এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সুতরাং পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সর্বত্রই যে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সপ্তম শতাব্দীতে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করে। হিউয়েন-সাঙ, শেংচি ও ই-ৎসিং-প্রমুখ চৈনিক পরিব্রাজকগণের বর্ণনা হতে একথা জানতে পারা যায়। এর মধ্যে হিউয়েন-সাঙের বিবরণ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন-সাঙ মগধ থেকে বাংলাদেশে আসেন। তিনি কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্তি—বাংলাদেশের প্রায় সব কটি অঞ্চল স্বচক্ষে দেখেছেন। তাঁর বর্ণনা থেকে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়।

হিউয়েন-সাঙ রাজমহলের নিকটবর্তী কজঙ্গলে ছয়-সাতটি বৌদ্ধবিহার দেখেন। সেখানে তিন শতাধিক ভিক্ষু বাস করতেন। পুণ্ড্রবর্ধনে বারটি বিহারে তিন হাজারের বেশি মহাযানী ও হীনযানী ভিক্ষু ছিলেন। রাজধানীর প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে পো-চি-পো সঙ্ঘারাম। এর প্রশস্ত অঙ্গন ও সমুন্নত কক্ষগুলি অতি চমৎকার। এখানে মহাযান-সম্প্রদায়ের সাত শত ভিক্ষু বাস করতেন। পূর্ব ভারতের বহু প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্য এই বিহারে ছিলেন। কর্ণসুবর্ণে দশটি বিহারে সম্মিতীয় শাখার দুই সহস্র ভিক্ষু বাস করতেন। এর নিকটবর্তী বিহার দুইটিতে ছিলেন দেবদত্তের সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষুগণ। রাজধানীর নিকটে লো-টো-বি-চি (রক্তমৃত্তিকা) বিহার বহুতলায় নির্মিত এবং এর কক্ষগুলিও প্রশস্ত। কথিত আছে দাক্ষিণাত্যের জনৈক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্যের সম্মানার্থ দেশের রাজা এই বিহার নির্মাণ করেন। সমতটের রাজধানীতে প্রায় কুড়িটি বিহারে তিন হাজার স্থবিরবাদী ভিক্ষু ছিলেন। তাম্রলিপ্তিতে প্রায় দশটি বিহারে সহস্রাধিক ভিক্ষু বাস করতেন।[৪]

উল্লিখিত বিবরণ থেকে বুঝতে পারা যায়, তখন বাংলাদেশে অনেক বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং সেখানে হাজার হাজার ভিক্ষু-শ্রমণ বাস করতেন। ধর্মীয় জীবনযাত্রা এবং জ্ঞানানুশীলনের দিক্ থেকে বাঙালি বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ

---

[৩] নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, 'বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম', পৃ. ৪৭-৪৮

[৪] Samuel Beal, *Life of Hiuen-Tsiang* (Popular Re-issue, 1914) pp. 131-33.

আদর্শস্থানীয় ছিলেন। ই-ৎসিং তাম্রলিপ্তির পো-লো-হো বা বরাহবিহারের রাহুলমিত্র নামে এক তরুণ শ্রমণের উল্লেখ করেছেন। জ্ঞানের গভীরতার জন্য অল্পবয়সেই তিনি পূর্ব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রমণ বলে খ্যাতিলাভ করেন।[৫]

ই-ৎসিংয়ের সমকালীন শেংচি নামে আরেকজন পরিব্রাজকের বিবরণ হতে জানা যায়, সমতটের রাজধানীতে চার হাজারের বেশি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ছিলেন। সমতটের রাজা রাজভট ত্রিরত্নের উপাসক; তিনি প্রতিদিন একলক্ষ বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করেন এবং প্রজ্ঞাপারমিতার লক্ষ শ্লোক পাঠ করেন। তিনি বুদ্ধ-দেবের সম্মানার্থে এক শোভাযাত্রা বের করতেন। এর পুরোভাগে থাকত অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি। এই সময়ে রাজা দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানও করতেন।[৬] এসকল বর্ণনা থেকে বুঝতে পারা যায়, সপ্তম শতকে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম রাজশক্তির সক্রিয় পোষকতাও লাভ করেছে। তা ছাড়া বাংলার বৌদ্ধসমাজের জ্ঞান ও ধর্মনিষ্ঠার খ্যাতি তখন দূর-দূরান্তে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

সপ্তম শতকের একজন বাঙালি বৌদ্ধ আচার্যের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি বাঙালিকুলতিলক শীলভদ্র। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি একসময়ে দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সমতটের এক ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী রাজবংশে তাঁর জন্ম হয়। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে তিনি হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, অথর্ববেদ, সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তারপর সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করে নালন্দার সর্বাধ্যক্ষ ধর্মপালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ধর্মপালের অবসর গ্রহণের পর তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত হন। হিউয়েন-সাঙ ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নালন্দায় এসে আচার্য শীলভদ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হিউয়েন-সাঙ বলেন, পাণ্ডিত্যের দিক্ থেকে তৎকালে নালন্দায় শীলভদ্রের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। শ্রদ্ধাবশত সেখানে কেউ তাঁর নাম উচ্চারণ না করে 'ধর্মনিধি' বলে উল্লেখ করতেন।[৭] এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ বাংলা তথা সমগ্র ভারতের গৌরব-স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ এই বাঙালি মনীষীর সশ্রদ্ধ উল্লেখ করে বলেছেন—

> বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আরো-একটি কথা আমাদের মনে রাখবার যোগ্য, নালন্দায় হিউয়েন-সাঙের যিনি গুরু ছিলেন তিনি ছিলেন বাঙালি, তাঁর নাম শীলভদ্র। তিনি বাংলাদেশের কোনো-এক স্থানের রাজা ছিলেন, রাজ্য ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। এই সংঘে যাঁরা

---

[৫] নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, 'বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম', পৃ. ৬৭
[৬] *History of Bengal*, Vol. I (D. U.), p. 414.
[৭] Samuel Beal, *Life of Hiuen-Tsiang*, p. 112.

> শিক্ষাদান করতেন তাঁদের সকলের মধ্যে একলা কেবল ইনিই সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারতেন।[৮]

হিউয়েন-সাঙের বিবরণী থেকে গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের বৌদ্ধ-নির্যাতনের একটি নির্মম কাহিনী পাওয়া যায়। হিউয়েন-সাঙ বাংলাদেশে আসার কয়েক বৎসর পূর্বে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। হিউয়েন-সাঙ বলেন, শশাঙ্ক নানা উপায়ে বৌদ্ধধর্মের বিনাশসাধনে ব্রতী হন। এর মধ্যে গয়ার বোধিদ্রুম সমূলে উৎপাটন, মন্দির থেকে বুদ্ধমূর্তি অপসারিত করে শিবমূর্তির প্রতিষ্ঠা, কুশীনগরের একটি বিহার থেকে ভিক্ষুদের বিতাড়িত করে বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদের চেষ্টা, বুদ্ধের পদচিহ্ন-সংবলিত প্রস্তরখণ্ড গঙ্গায় বিসর্জন প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়।[৯] আনুমানিক ৭০০—৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত আর্য মঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামক একখানি সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থেও শশাঙ্কের এই বৌদ্ধ-নির্যাতনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।[১০] ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার-প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এসকল কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলেন, হিউয়েন-সাঙ-বর্ণিত শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষের কাহিনী অনস্বীকার্য।[১১] এই প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। হিউয়েন-সাঙ বর্ণিত শশাঙ্কের কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য হলেও প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় উদারতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না, যদিও এরকম আরো দুয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত বাংলার ইতিহাসে বিরল নয়। ধর্মীয় উদারতা, সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বাঙালি চিরদিনই অগ্রণী।

অষ্টম শতকের মধ্যভাগে পালরাজগণের অভ্যুদয়ে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের ক্ষীয়মাণ দীপশিখাটি এই সময়ে বাংলাদেশকে আশ্রয় করে উজ্জ্বলতর দীপ্তিতে প্রকাশ পায়। একমাত্র মৌর্যসম্রাট অশোককে বাদ দিলে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে পালযুগের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি। এই যুগকে বাংলার ইতিহাসে সুবর্ণযুগ বলে অভিহিত করা যায়। জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী বিকাশে পালযুগ বাংলার ইতিহাসে অতুলনীয়। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন—

> এই সাম্রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালীর নূতন জাতীয় জীবনের সূত্রপাত হয়। ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যের অভ্যুদয়েই এই জাতীয় জীবন প্রধানত আত্মবিকাশ করিয়াছিল। পালরাজগণের

---

[৮] বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, 'শিক্ষা'
[৯] *History of Bengal*, Vol. I (D. U.), p. 67.
[১০] K. P. Jayswal, *Imperial History of India in a Sanskrit Text*, p. 49.
[১১] নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব), পৃ. ৬১০

চারিশত বর্ষব্যাপী রাজ্যকাল বাঙালী জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ।
ধর্মপালের রাজ্য বাঙালীর জীবনপ্রভাত।[১২]

পালরাজগণ ছিলেন মহাযান বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। হিউয়েন-সাঙ বাংলাদেশে যে হীনযানের প্রাধান্য দেখেছিলেন, পালযুগে মহাযান সে স্থান দখল করে নেয়। অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব থেকে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা ও মগধের ইতিহাসে এই পরিবর্তিত মহাযানের আধিপত্য। এই অপেক্ষাকৃত আধুনিক মহাযান মতবাদ কালক্রমে বজ্রযান, তন্ত্রযান প্রভৃতিতে পরিবর্তিত হয়ে এক নূতন আকার ধারণ করে। এই তান্ত্রিক সাধনার অন্যতম প্রধান ধারাই সহজযান। এ বিষয়টা পরে আলোচিত হবে। যা হক, পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সময়ে মহাযান বৌদ্ধধর্ম এক বিরাট আন্তর্জাতিক শক্তিতে পরিণত হয় এবং ভারতের বাইরে তিব্বত, যবদ্বীপ, মালয়, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।[১৩]

পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা, বিক্রমশিলা, সোমপুর, ওদন্তপুর প্রভৃতি মহাবিহারকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ তথা বাঙালির মহিমা সমগ্র বৌদ্ধ-জগতে পরিব্যাপ্ত হয়। বাঙালির রাষ্ট্রের এই আন্তর্জাতিক খ্যাতির সঙ্গে শীলভদ্র, শান্তিরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, কমলশীল, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, চন্দ্রগোমিন, অভয়াকর গুপ্ত, জেতারি, জ্ঞানশ্রী-প্রমুখ বৌদ্ধ আচার্যগণের নাম বিশেষভাবে জড়িত।[১৪] বস্তুত এই বৌদ্ধ আচার্যগণের জন্য বাঙালি সুদীর্ঘকাল ধরে সমগ্র বৌদ্ধজগতের গুরুস্থানীয় ছিল। একদিকে উত্তরে হিমালয়ের দুর্লঙ্ঘ পর্বতমালা অতিক্রম করে বাঙালি দীপঙ্কর তিব্বতে জ্বালিয়ে দিলেন বৌদ্ধ-ধর্মের আলোকবর্তিকা,[১৫] আবার দক্ষিণে সুদূর সমুদ্রপারে সুবর্ণদ্বীপে শৈলেন্দ্ররাজ শ্রীসংগ্রামধনঞ্জয়ের গুরুর পদে অভিষিক্ত বাঙালি কুমারঘোষ।[১৬] বাঙালি জাতির পক্ষে এ কম শ্লাঘার বিষয় নয়। আবার এই পালযুগেই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সূচনা হয়। এসকল দিক্ থেকে বিচার করতে গেলে, দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় পালযুগকে যথার্থই 'বিদ্যাযুগ' বলে অভিহিত করেছেন।[১৭]

---

[১২] রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস' (৩য় সং), পৃ. ৪১
[১৩] *History of Bengal* Vol. 1 (D. U.), p 416-17.
[১৪] রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস' (৩য় সং), পৃ. ২২৭-৩১
[১৫] স্মরণীয়— বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।
—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, আমরা
[১৬] R. C. Majumdar, *Hindu Colonies in the Far East,* p. 30.
[১৭] দীনেশচন্দ্র সেন, 'বৃহৎবঙ্গ', প্রথম খণ্ড (১০৪১), পৃ. ২৯২

ধর্মীয় উদারতার ক্ষেত্রেও পালযুগ বাংলার ইতিহাসে অনতিক্রান্ত ও অতুলনীয়। পালরাজগণের ধর্মীয় উদারতা অশোক, হর্ষবর্ধন ও আকবরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু একদিক্ থেকে মনে হয়, পালযুগ এঁদেরও অতিক্রম করে গিয়েছিল। পালরাজগণকে শুধু পরধর্ম-সহিষ্ণু বললে সব বলা হয় না, এর চেয়ে বড় কথা হল এঁরা পরকে কতখানি আপন করে নিয়েছিলেন। বস্তুত বাঙালি রামপ্রসাদের কবিকল্পনাতে যেমন কালী-কৃষ্ণ মিলেমিশে এক হয়ে গেছে তেমনি পালযুগে ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যেন অনেকটা রফা-নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। পরবর্তী কালে এই সমন্বয়ের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত রামচন্দ্র কবিভারতীর ভক্তিশতক গ্রন্থের এই শ্লোকটিতে—

> জ্ঞানং যস্য সমস্তবস্তুবিষয়ং যস্যানবদ্যং বচো
> যস্মিন্ রাগলবোঽপি নৈব ন পুনর্দ্বেষো ন মোহস্তথা।
> যস্যাহেতুরনন্তসত্ত্বসুখদানল্পা কৃপামাধুরী
> বুদ্ধো বা গিরিশোঽথবা স ভগবাংস্তস্মৈ নমস্কুর্মহে॥

—"জ্ঞান যাঁর সমস্ত বস্তু ও বিষয় ব্যাপী, বাক্য যাঁর নির্দোষ, যাঁর চিত্তে অনুরাগ দ্বেষ মোহ প্রভৃতি বিকারের লেশমাত্র নেই, যাঁর অহেতু অজস্র কৃপামাধুরী অনন্ত জীবের সুখ দান করছে, সেই ভগবানকে আমরা নমস্কার করি—তিনি বুদ্ধই হোন বা গিরিশই হোন।" রামচন্দ্র কবিভারতী ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে সিংহলে গমন করেন। সিংহলরাজ দ্বিতীয় পরাক্রমবাহু (১২২৫—৬০) তাঁকে 'বৌদ্ধাগমচক্রবর্তী' উপাধিতে বিভূষিত করেন।[১৮]

পরমসৌগত পালরাজগণের সময়ে গর্গ, দর্ভপানি, কেদারমিশ্র-প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ পুরুষানুক্রমে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত ছিলেন। এ ধর্মীয় উদারতারই পরিচায়ক। পালরাজগণ ব্রাহ্মণ্য-সম্প্রদায়ের যে সক্রিয় পোষকতা করেছেন সে দৃষ্টান্তও বাংলার ইতিহাসে বিরল নয়। এ প্রসঙ্গে নারায়ণপাল কর্তৃক শিব-মন্দির-প্রতিষ্ঠা ও তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভূমিদানাদি উল্লেখ করা যায়। এর থেকে অনুমান করা যায়, সেকালে পরস্পরের ধর্মমতের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা ছিল। তা ছাড়া ব্রাহ্মণ্য- ও বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কে কোন বাধা ছিল না। ধর্মপাল, রাজ্যপাল, প্রথম বিগ্রহপাল, তৃতীয় বিগ্রহপাল-প্রমুখ পালরাজগণ ব্রাহ্মণ্য রাজবংশের কন্যা বিবাহ করেছেন।

পালযুগের এই উদার আবহাওয়ার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ দেবদেবীদের মধ্যেও এক বৃহৎ সমন্বয়ের পালা চলছিল। বৌদ্ধেরা যেমন অনেক ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীকে স্বীকার করে নিয়েছেন তেমনি ব্রাহ্মণ্যসমাজও মহাযানমতের অনেক

[১৮] সুকুমার সেন, 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী', পৃ. ৩৩-৩৪

দেবদেবীকে গ্রহণ করেছেন। তারা, চামুণ্ডা, বাসলী, ভৈরব, গণেশ, লোকনাথ, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা এভাবেই প্রচলিত হয়। বুদ্ধ ও বিষ্ণুর একীকরণ এবং শিব-বুদ্ধ পরিকল্পনা এই সমন্বয়সাধনার অন্তর্গত। এমনি ভাবে তখন বাংলার জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়।

পালযুগে বাংলাদেশে যে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা বিকাশ লাভ করে সেকথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এই সহজিয়া বৌদ্ধমতকে অবলম্বন করে এক বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। সহজিয়া সাধকগণ তাঁদের ধর্মমতকে সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য যে পদগুলি রচনা করেন তা চর্যাপদ নামে পরিচিত। এই পদগুলি মোটামুটি দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত। চর্যাপদের মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

চর্যাগীতি এবং কাহ্ন সরহ-প্রমুখ সাধকগণের রচিত অপভ্রংশ দোহাগুলি থেকে সহজিয়া বৌদ্ধদের ধর্মসাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। সহজিয়া সাধকেরা মন্ত্রতন্ত্র, পূজার্চনা ও বাহ্যিক অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করতেন না। তাঁদের মতে এসব শুধু বিভ্রমের সৃষ্টি করে। শূন্যতা ও করুণার মিলনে যে বোধিচিত্ত লাভ হয় সেই পরম সহজানন্দ বা সুখাবস্থাই সহজিয়া সাধকদের একমাত্র কাম্য। আবার দেহকে অবলম্বন করে এই শূন্যতা ও করুণার তত্ত্বরূপের প্রকাশ দেখা যায়। সহজিয়ারা বলেন, এই দেহের মধ্যেই রয়েছেন সহজ-স্বরূপ। নরনারীর প্রাকৃত প্রেম বা কামবিলাসের মধ্য দিয়ে সহজ-স্বরূপকে উপলব্ধি করতে হয়। কোন ধ্যান-সমাধির দ্বারা তা পাওয়া যায় না। একমাত্র সদ্‌গুরুর নিকট হতে প্রাপ্ত তত্ত্বজ্ঞানে সহজিয়া সাধনায় এই শাশ্বত অনুভূতি লাভ করা যায়। গুরুই এখানে একমাত্র নির্ভর। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, যে সহজিয়া সাধকগণ প্রাচীন শাস্ত্র ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরাই আবার চরম গুরুবাদী। প্রসঙ্গ-ক্রমে উল্লেখ করা যায়, পরবর্তী কালে বাংলার কর্তাভজা, নাথপন্থী প্রভৃতি সাধকেরাও এরকম গুরুবাদী ছিলেন।

বাংলাসাহিত্য তথা বাংলাদেশে চর্যাপদাবলীর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ভাব ও আঙ্গিক উভয় দিক্ থেকেই এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী কালে এর প্রভাবে সহজিয়া গান, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত ও বাউল গান প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। এতদ্‌ব্যতীত বাংলাদেশে মধ্যযুগে বাউল, বৈষ্ণব, নাথপন্থী, অবধূত, কর্তাভজা প্রভৃতি যেসকল ধর্মমত প্রাধান্য লাভ করে তার উপর সহজিয়া বৌদ্ধমতের প্রভাব অপরিসীম। বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাসও সহজিয়া ছিলেন। চণ্ডীদাসের রজকিনী প্রেম প্রাচীন সহজিয়াদের পঞ্চকুলের অন্যতম রজকীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পরিশেষে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। বাংলার নিজস্ব তান্ত্রিক ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সহজপন্থীদের সাধনা যে পরিণতি লাভ করে তার সঙ্গে মূল বৌদ্ধধর্মের আদর্শের এক বিরাট ব্যবধান। সহজিয়া বৌদ্ধমতকে অনেকটা বাংলাদেশের বিশিষ্ট দান হিসাবে গ্রহণ করা যায়। এখানে ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধধর্মের চেয়ে বাঙালির নিজস্ব প্রভাব বেশি। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন—

> বাংলায় বৌদ্ধধর্মের যে রূপান্তর ঘটিয়াছিল...তাহাতে ইহাই ধর্ম-জগতে বাংলার বিশিষ্ট দান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অন্য যে সমুদয় ধর্মমত বাংলায় প্রচলিত ছিল, তাহা মোটামুটিভাবে নিখিল ভারতবর্ষীয় ধর্মেরই অনুরূপ, তাহার মধ্যে বাংলার বৈশিষ্ট্য কিছু থাকিলেও তাহা নিরূপণ করিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের যে রূপান্তর ঘটিয়াছিল, তাহার উপর বাঙালীর প্রভাবই যে বেশী, একথা সকলেই স্বীকার করেন। এই রূপান্তরই আবার বাংলার অন্যান্য ধর্মমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বাংলার ধর্ম ও সমাজে যে বিপ্লব ঘটাইয়াছিল, বাংলার মধ্যযুগে, এমন কি বর্তমান কালেও তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।[১১]

পালযুগের সমকালীন ও অব্যবহিত পরবর্তী কালে আরো কয়েকটি বৌদ্ধ রাজবংশ ও বৌদ্ধ নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ের প্রত্যেকটি রাজবংশ মহাযান মতাবলম্বী। দুর্বল পালরাজাদের সময়ে পূর্ব- ও দক্ষিণ-বঙ্গ তাঁদের হস্তচ্যুত হলে কয়েকটি স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এর মধ্যে হরিকেলের মহারাজাধিরাজ কান্তিদেবের রাজ্যই প্রাচীন। মনে হয় তিনি ৮৫০--৯৫০ খ্রী. কোনও সময়ে রাজত্ব করতেন। কান্তিদেবের অনতিকাল পরে লয়হচন্দ্রদেব নামে একজন স্বাধীন রাজা কুমিল্লা অঞ্চলে অন্তত আঠার বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ইনিও পরমসৌগত। দশম শতাব্দীর শেষার্ধে পূর্ববঙ্গের হরিকেলে চন্দ্রবংশ নামে একটি বৌদ্ধ রাজবংশ স্থাপিত হয়েছিল। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (৯৮০—১০৫৩) এই বংশের সন্তান বলে কেউ কেউ অনুমান করেন।

খড়্গবংশ নামে একটি বৌদ্ধ রাজবংশ দক্ষিণ- ও পূর্ব-বঙ্গে রাজত্ব করেন। সম্ভবত বর্তমান কুমিল্লার নিকটবর্তী বড়কামতা নামক স্থানে তাঁদের রাজধানী ছিল। দশম শতাব্দীর তৃতীয়পাদে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের (আ. ৯৬০—৯৮৮) সময়ে উত্তর- ও পশ্চিমবঙ্গে কম্বোজবংশীয় বৌদ্ধরাজগণ রাজত্ব করতেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজাধিরাজ রাজ্যপাল 'কম্বোজবংশতিলক' বলে বর্ণিত

[১১] বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় সং), পৃ. ১৫৫

হয়েছেন। এই বংশের রাজাদের 'পাল' উপাধি দেখে মনে হয় বাংলার পাল রাজবংশের সঙ্গে এ'রা অভিন্ন।

পালযুগের পরবর্তী কালে অন্তত আরো তিনজন বৌদ্ধ নৃপতির সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের পট্টিকেরা রাজ্যের রণবঙ্কমল্ল শ্রীহরিকালদেব ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে অন্তত সতর বৎসর রাজত্ব করেন।[২০] 'পঞ্চরক্ষা' নামক একখানি মহাযান গ্রন্থ থেকে জানা যায়, পরমসৌগত গৌড়েশ্বর মধুসেনের বিজয়রাজ্যে ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এই পুঁথি লিখিত হয়েছে।[২১] তিনি লক্ষ্মণসেনের বংশধর কিনা জানা যায় না। লামা তারনাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকান্তরিত ছগল বা চঙ্গলরাজ নামে জনৈক বাঙালি নরপতি রানীর প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে বুদ্ধগয়ার জীর্ণ মঠগুলি সংস্কার করেন।[২২]

পাল-চন্দ্র পর্বে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের যে জয়জয়কার এর পরে আর তেমন দেখা যায় না। পালযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের গৌরবরশ্মিও অস্তমিত। ত্রয়োদশ শতক ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের যুগ। বাংলাদেশে এই সময়ে সেনরাজগণের অভ্যুদয়ের ফলে শৈব- ও বৈষ্ণব-ধর্ম বেশ প্রতিপত্তি লাভ করে এবং বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মানুষ্ঠান, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি পুনরুজ্জীবিত হয়। পালযুগের সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যে উদারতা ছিল সেন-বর্মণযুগের রক্ষণশীল মনোভাবের মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, এই সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রতি একটা বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা দিয়েছে। এর পর তুর্কী আক্রমণের চরম আঘাতের ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রাণকেন্দ্র বৌদ্ধবিহারগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এমনি ভাবে বাংলাদেশ হতে লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম চট্টগ্রাম ত্রিপুরা প্রভৃতি বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে শেষ আশ্রয় লাভ করে। পূর্বাঞ্চলের এই বৌদ্ধেরাই আজও বাংলার একপ্রান্তে বৌদ্ধধর্মের অতীত গৌরবের ক্ষীণশিখাটি পরম অনুরাগে জ্বালিয়ে রেখেছে।[২৩]

বল্লালসেনের নামে প্রচলিত 'দানসাগর'-গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, কলিযুগে বল্লালসেনরূপী প্রত্যক্ষ-নারায়ণের আবির্ভাব হয়েছে ধর্মের অভ্যুদয় ও নাস্তিক বৌদ্ধদের পদোচ্ছেদের জন্য।[২৪] এর মধ্য দিয়ে তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যমনোভাবের

[২০] বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় সং), পৃ. ১১০
[২১] প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, পৃ. ৩০
[২২] বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম, পৃ. ২০৭
[২৩] Sudhansubimal Barua, Impact of Buddhist Culture in Bengal, *World Buddhism,* January 1963.
[২৪] বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম, পৃ. ২২০

কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। তবে বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন ধর্মবিষয়ে অনুদার ছিলেন না। তাঁর রাজসভায় বৌদ্ধকবি শরণাচার্য ছিলেন। তা ছাড়া লক্ষ্মণসেনের প্রসিদ্ধ সভাকবি জয়দেব গীতগোবিন্দ কাব্যের দশাবতার স্তোত্রে বুদ্ধদেবকে অন্যতম অবতাররূপে বন্দনা করেছেন।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে॥

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, প্রধানত গীতগোবিন্দ কাব্যের অনুসরণ করেই পরবর্তী কালে বাংলাসাহিত্যে তথা বাংলাদেশে বুদ্ধদেব অবতাররূপে পরিগণিত হয়েছেন। সেনযুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার সর্বানন্দ বন্দ্যঘটী তাঁর 'টীকাসর্বস্ব' (১১৫৯—৬০) গ্রন্থে মহাকবি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্য থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন।[২৫] এ ছাড়া গৌড়েশ্বর মধুসেনের বিজয়রাজ্যে ১২৮৯ খ্রী. লিখিত 'পঞ্চরক্ষা' নামক মহাযান-গ্রন্থের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

এর প্রায় দেড়শত বৎসর পরে ১৪৩৬ খ্রী. বেনুগ্রামে 'সদ্‌বৌদ্ধ-করণ-কায়স্থ ঠক্কুর' শ্রীঅমিতাভ বঙ্গাক্ষরে শান্তিদেবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বোধিচর্যাবতারে'র একখানি পুঁথি নকল করেন।[২৬] কিন্তু অতীত গৌরবের তুলনায় বাংলার ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের এই স্মৃতি অতি নগণ্য।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ ও ধর্মমঙ্গল সাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। শূন্যপুরাণের অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুষ্মায়' সদ্ধর্মীদের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের পরিচয় আছে।—

মালদহে মাগে কর না চিনে রাপন পর
জালের নাঞ্জিক দিসপাশ।
বলিষ্ঠ হইল বড় দসবিস হয়্যা জড়
সদ্ধর্মিরে করএ বিনাস॥[২৭]

এর ফলে ধর্মঠাকুর যবনবেশ ধারণ করে এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, "কোন্ ঐতিহাসিক মুসলমান উপদ্রবকে লক্ষ্য করিয়া এই কবিতা রচিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না; কিন্তু ব্রাহ্মণকৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ মনে করিয়া সদ্ধর্মীরা (বৌদ্ধগণ) যে হিন্দু দেবমন্দির প্রভৃতির উপর

---

[২৫] প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, পৃ. ৩১
[২৬] প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, পৃ. ৩০-৩১
[২৭] চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'শূন্যপুরাণ', পৃ. ২৩২

উৎপাত দর্শনে ত্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে।"[২৮] আদি ধর্মপুরাণকার যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণ' (১৬৯৬) কাব্যে বুদ্ধদেবকে ধর্মঠাকুরের দশম অবতার হিসাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে।—

দশমে বন্দিনু বৌদ্ধ কল্কি অবতার।
সত্য শুনে তার নাম মেলেচ্চ-আকার॥[২৯]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এক সময়ে অনুমান করেছিলেন, ধর্মঠাকুরের পূজা বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি। কিন্তু সে অনুমান এখন সমর্থন করা হয় না। তবে ধর্মপূজাবিধি ও ধর্মমঙ্গল সাহিত্য বৌদ্ধধর্মের দ্বারা যে অন্তত কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে সেকথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

ষোড়শ শতকের শেষপাদে রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বুদ্ধাবতার প্রসঙ্গে বলেছেন—

ধরিয়া পাষণ্ড মত নিন্দা করি বেদপথ
বৌদ্ধরূপী লেখে নারায়ণ।[৩০]

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে পুরীর জগন্নাথদেবকে বুদ্ধমূর্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩১] আবার চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত একটি পদেও একথা পাওয়া যায়।—

পুন তা ত্যজিয়া বৌদ্ধ অবতার হইল মূরতি তিন।
জগন্নাথ আর ভগ্নী সহোদর সুভদ্রা তাহাতে চিন্(চিহ্ন)॥[৩২]

জনৈক চূড়ামণি দাস লিখিত 'চৈতন্যচরিত' দেখে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, চৈতন্যদেবের জন্ম হলে বৌদ্ধেরাও আনন্দিত হয়েছিল বলে এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।[৩৩] চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বৌদ্ধদের আনন্দিত হবার কারণ জানা যায় না। তবে বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থ দেখে মনে হয়, বাংলার বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বৌদ্ধদের প্রতি নিতান্ত বিরূপ ছিল। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু তীর্থভ্রমণের সময় বৌদ্ধদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেছেন এর থেকে তখনকার গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মনোভাব অনেকটা অনুমান করা যায়।—

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ॥

---

[২৮] দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (৮ম সং), পৃ. ৩৩
[২৯] পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, 'সাহিত্য প্রকাশিকা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭
[৩০] অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত, 'চণ্ডীমঙ্গল', পৃ. ১৬০
[৩১] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'বৌদ্ধধর্ম' পৃ. ৯০
[৩২] নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'চণ্ডীদাস পদাবলী', পৃ. ১৮; বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত 'চণ্ডীদাস পদাবলী', পৃ. ১৭
[৩৩] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'বৌদ্ধধর্ম', পৃ. ৯০

জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥[৩৪]

এমন কি অশীতিপর বৃদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণদাস কবিরাজও 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে বৌদ্ধদের যথারীতি 'পাষণ্ডী' বলে অভিহিত করেছেন এবং 'ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর' একই পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন।[৩৫] এর থেকে বুঝতে পারা যায়, তখনকার দিনে বাংলাদেশে বৌদ্ধদের কত হেয়জ্ঞান করা হত।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে রামানন্দ ঘোষ একখানা রামায়ণ কাব্য রচনা করেন। সম্ভবত তিনি রাঢ় অঞ্চলের লোক এবং একসময়ে উড়িষ্যাতেও গিয়েছিলেন। রামানন্দ নিজেকে কলিযুগের বুদ্ধ-অবতার বলে পরিচয় দিয়েছেন। ম্লেচ্ছের অত্যাচার হতে দেশ উদ্ধারের জন্য তিনি কালীর শাপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।—

রামানন্দ কহে ভাই সংসারের লোক।
বুদ্ধ ভাষা শুনিয়া ঘুচায় দুঃখশোক॥
সর্বশক্তিমত আর ইচ্ছা কালিকার।
কলিযুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার॥
কলিতে জাগ্রত হইতে ত্রিলোকজননী।
শাপ দিয়া বুদ্ধদেবে আনিলা অবনী॥[৩৬]

রামানন্দের অভিপ্রায় ছিল—

যবন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব।
একচ্ছত্রে রাজা করি দারুব্রহ্মে দিব॥[৩৭]

রামানন্দের গ্রন্থের লিপিকাল ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ। এর থেকে অনুমান করা যায়, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগেও বুদ্ধাবতারে বিশ্বাসী এই সম্প্রদায় রাঢ় অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এ হল অতীতের জীর্ণ ভগ্নাবশেষ মাত্র।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্য, ধর্মমঙ্গল কাব্য, 'বুদ্ধাবতার' রামানন্দের গ্রন্থ প্রভৃতিতে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের ক্ষীণ আভাস মাত্র পাওয়া যায়। মধ্যযুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের এই স্মৃতি অকিঞ্চিৎকর। এমনি ভাবে আমাদের জাতীয় জীবন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের স্মৃতি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এ হল এক করুণ বিস্মৃতির অধ্যায়। এই বিস্মৃতির কথা বলতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলেছেন—

অর্ধশতাব্দী পূর্বে বুদ্ধ কে, তাঁর ধর্ম কি, বৌদ্ধ সঙ্ঘই বা কি, এ

[৩৪] চৈতন্যভাগবত, পৃ ৭৭, হরিনাম প্রচার সমিতি সংস্করণ
[৩৫] চৈতন্যচরিতামৃত, পৃ ৭৭২, বহরমপুর সংস্করণ
[৩৬] আদি-কাণ্ড
[৩৭] অযোধ্যা-কাণ্ড

প্রশ্নের উত্তর আমাদের মধ্যে কোটিতে একজনও দিতে পারতেন না; কারণ বৌদ্ধধর্মের এই ত্রিরত্নের স্মৃতি পর্যন্ত এদেশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। 'বৌদ্ধ' এই শব্দটি অবশ্য আমাদের ভাষায় ছিল, এবং বৌদ্ধ অর্থে আমরা বুঝতুম—একটি পাষণ্ড ধর্মমত; কিন্তু উক্ত পাষণ্ড মতটি যে কি, সে সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনরূপ ধারণা ছিল না।[৩৮]

যে বৌদ্ধধর্মের কল্যাণস্পর্শে একটা জাতি শিল্পে-সাহিত্যে, চিন্তায়-কর্মে, রাষ্ট্রসাধনায় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এতটা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল, ভাগ্য-বিড়ম্বনায় তার স্মৃতি পর্যন্ত এদেশের মন থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। এই আত্মবিস্মৃতির সুপ্তিভঙ্গের জন্য আরো বহুযুগ অপেক্ষা করতে হয়। অবশেষে নব্য ইউরোপের জঙ্গম মনের সান্নিধ্যে এসে আমাদের জাতীয় চিত্তে নবচেতনার সঞ্চার হলে বৌদ্ধধর্মের এই বিস্মৃত মহিমা পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

খ। বাংলার নবজাগরণ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি : জাতীয় চেতনায় ও সাহিত্যে

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার জাতীয় জীবনে এক অপূর্ব জাগরণের সূচনা হয়। মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের কথায় বলতে গেলে, এই জাগরণ বাঙালি জাতির 'প্রাণ মন ও আত্মার সুপ্তিভঙ্গ'। আর এই জাগরণ সম্ভব হয়েছিল নব্য ইউরোপের চিত্তপ্রতীকরূপ ইংরেজ তথা ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শে আসার ফলে। ইউরোপের জঙ্গম মনের সান্নিধ্যে এসে বাঙালির বহু-দিনের জড়তাগ্রস্ত ও স্থাবর চিত্তের উপর আঘাত পড়ে, এর ফলে সে আবার নূতন করে প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীর ভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর-কোনো বিদেশী জাত কোনো দিন এমন করে আসতে পারে নি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূরে আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির 'পরে ; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।[৩৯]

---

[৩৮] 'বৌদ্ধধর্ম', 'নানাচর্চা', পৃ. ৭৭; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থের ভূমিকা-স্বরূপ লিখিত।

[৩৯] কালান্তর (১৯৩৩), 'কালান্তর'

বাংলার সমতলভূমি যেমন উর্বর পলিমৃত্তিকায় গঠিত তেমনি বাঙালির মনোভূমিও কোন দিন মরুভূমির অসার রুক্ষতা প্রাপ্ত হয় নি। তাই দূর আকাশ থেকে আগত বৃষ্টিধারারূপী নব্য ইউরোপের চিন্তাধারা বর্ষণের ফলে বাংলার মনোভূমিতে সোনার ফসল বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে তা এতটা ব্যাপক ও বিচিত্ররূপে সম্ভব হয় নি। বাঙালির জীবনে ভাবকল্পনার দৈন্য কোন দিন ছিল না। তাই সে ইউরোপের জঙ্গম চিত্তের প্রভাব সহজে ও সানন্দে বরণ করে নিয়েছিল। এর ফলে বাংলার ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হয়। আর বুদ্ধ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা এইযুগেরই অন্যতম স্মরণীয় কীর্তি।

উনবিংশ শতাব্দীতে এই পুনরুজ্জীবনের যুগে প্রাচীন ভারতের সমস্ত আদর্শ আবার নূতনভাবে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। স্বামী দয়ানন্দ ও শ্রদ্ধানন্দ বৈদিক যুগের আদর্শকে আমাদের জাতীয় জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদর্শ ছিল উপনিষদের ব্রহ্মবাদের আলোকে ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করা, অনাগারিক ধর্মপালের উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ ভাবাদর্শের প্রবর্তন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের লক্ষ্য ছিল শঙ্করাচার্য তথা ভারতবর্ষের পৌরাণিক আদর্শকে পুনরুদ্দীপিত করা, বঙ্কিমচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, কৃষ্ণানন্দ-প্রমুখ মনীষিগণ বৈষ্ণবধর্মের মহিমা উদ্‌বোধনে প্রয়াসী ছিলেন, আর শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য ছিল যোগসাধনা তথা নবভাগবত ধর্মের প্রতিষ্ঠা।[৩০] তৎকালে আমাদের দেশে যে বিভিন্ন ধর্মান্দোলনের সূচনা হয় তার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম অন্যতম প্রধান।

ইতিপূর্বেই পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ বৌদ্ধসংস্কৃতি আলোচনার সূত্রপাত করেন। পণ্ডিত ম্যাক্‌স্‌মূলের, ওল্ডেনবার্গ, রিস্‌ ডেভিড্‌স্‌ দম্পতি, এডুইন আর্নল্‌ড-প্রমুখ মনস্বীদের আলোচনার ফলে আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের মনে বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি নূতন ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয়। এর মধ্যে এডুইন আর্নল্‌ডের Light of Asia (১৮৭৯) নামক সুপ্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ আমাদের দেশের ইংরেজি-শিক্ষিত মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বৌদ্ধ-সংস্কৃতির প্রতি নবজাগ্রত আগ্রহের ফলে ১৮৯২ সালে কলকাতায় Buddhist Text Society স্থাপিত হয়। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শরচ্চন্দ্র দাস। এই প্রসঙ্গে অনাগারিক ধর্মপাল কর্তৃক কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠা (১৮৯১) এবং মহাস্থবির কৃপাশরণ কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা বা Bengal Buddhist Association-এর প্রতিষ্ঠা (১৮৯২) বিশেষ

[৩০] প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ৫২

উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের নবজাগরণে এই দুই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সুদূরপ্রসারী।

২

বাংলাদেশে বৌদ্ধসংস্কৃতি আলোচনার পথিকৃৎ হিসাবে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২—৯১) নাম অমর হয়ে থাকবে। পরবর্তী কালে আমাদের দেশে রামদাস সেন, সাধু অঘোরনাথ ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-প্রমুখ যেসকল মনীষী বৌদ্ধ-সংস্কৃতির অনুশীলন করেছেন তাঁদের প্রায় সকলেই রাজেন্দ্রলালের নিকট ঋণী। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধচর্চার মূলেও রাজেন্দ্রলালের প্রভাব জাগ্রত। ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগের জন্যই রাজেন্দ্রলাল বৌদ্ধসংস্কৃতির গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থের মধ্যে ললিতবিস্তরঃ (১৮৭৭), An Introduction to the Lalitavistar (1877), Buddha Gaya—the Hermitage of Sakyamuni (1878), The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (1882) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাজেন্দ্রলালের পর রামদাস সেনের (১৮৪৫—৮৭) নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব আলোচনায় তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৮৭০ সালে রামদাস বহরমপুর সাহিত্য সমিতিতে Modern Buddhistic Researches সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। পরে তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি রামদাসের স্বাভাবিক অনুরাগের পরিচয় নিহিত আছে। তাঁর 'ঐতিহাসিক রহস্য'-গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে (১৮৭৬) বৌদ্ধধর্ম, শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়, বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন, পালিভাষা ও তৎসমালোচন, এবং বুদ্ধদেবের দন্ত সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। 'ঐতিহাসিক রহস্য'-গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে (১৮৭৯) বৌদ্ধজাতকের উপর একটি প্রবন্ধ আছে। রামদাসের শেষ গ্রন্থ 'বুদ্ধদেব' (১৮৯১) তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তিনি যে 'সমস্ত জীবন বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও বৌদ্ধধর্ম আলোচনা করেছেন' এই গ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি রামদাসের পরমবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের নামে উৎসর্গীকৃত।

যেসকল বাঙালি মনস্বীর ঐতিহাসিক আলোচনার ফলে আমাদের জাতীয় চিত্ত গৌতমবুদ্ধের মহত্ত্ব ও তৎপ্রচারিত ধর্মগৌরবের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮—৯৪) নামও উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধদেব বা বৌদ্ধ-ধর্ম প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তেমন বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। 'সাম্য' (১৮৭৯)

গ্রন্থে তিনি প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এখানে স্বল্প পরিসরের মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধবিপ্লবের ফল বিশ্লেষণে গভীর মননশীলতা ও ইতিহাসনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বুদ্ধদেবকে জগতের শ্রেষ্ঠতম সাম্যবাদী বলে অভিহিত করেছেন। বুদ্ধদেব ভারতবর্ষে বর্ণবৈষম্যের অভিশাপে নিপীড়িত মানুষের জন্য এনেছিলেন এক পরম মুক্তির বাণী। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

> যখন বৈদিক-ধর্ম্মসঞ্জাত বৈষম্যে ভারতবর্ষ পীড়িত, তখন ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের উদ্ধার করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে যত-প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালিক বর্ণবৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই।...প্রাচীন ইউরোপের বন্দী এবং প্রভু মধ্যে যে বৈষম্য, তাহাও এমন ভয়ানক নহে।[৬১]

বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, সাম্রাজ্যশক্তি ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে গৌরবলাভ করেছে মনীষী বঙ্কিমের দৃষ্টিতে তা সুন্দররূপে প্রতিভাত হয়েছে।—

> প্রায় সহস্র বৎসর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত রহিল। পুরাবৃত্তজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে, সেই সহস্র বৎসরই ভারতবর্ষের প্রকৃত সৌষ্ঠবের সময়। যে সকল সম্রাট্ হিমালয় হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত যথার্থ্যই একচ্ছত্রে শাসিত করিয়াছেন অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, শিলাদিত্য প্রভৃতি — এই কালমধ্যেই তাঁহাদিগের অভ্যুদয়। এই সময়েই তক্ষশিলা হইতে তাম্রলিপ্ত পর্য্যন্ত, বহুজনসমাকীর্ণ মহাসমৃদ্ধশালিনী সহস্র সহস্র নগরীতে ভারতবর্ষ পরিপূরিত হইয়াছিল। এই সময়েই ভারতবর্ষের গৌরব পশ্চিমে রোমকে, পূর্ব্বে চীনে গীত হইয়াছিল—তদ্দেশীয় রাজারা ভারতবর্ষীয় সম্রাট্দিগের সহিত রাজনৈতিক সখ্যে বদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মপ্রচারকেরা ধর্ম্মপ্রচারে যাত্রা করিয়া অর্দ্ধেক আশিয়া ভারতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শিল্পবিদ্যার যে এই সময়ে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন বৌদ্ধোদয়ের আনুষঙ্গিক বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞান সাহিত্যের বিশেষ অনুশীলনের কারানিরূপণ করা কঠিন, কিন্তু শাক্যসিংহের সম্পাদিত ধর্ম্মবিপ্লবের সহিত যে, সে সকলের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।[৬২]

---

[৬১] 'সাম্য'; বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড (সাহিত্য সংসদ), পৃ. ৩৮২-৮৩
[৬২] 'সাম্য'; বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড (সাহিত্য সংসদ), পৃ. ৩৮৩

বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্রও বলেছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগই সর্বাপেক্ষা গৌরবমণ্ডিত যুগ।—

> সহস্র বৎসর কাল বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত মধ্যে যে সময়টি সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র এবং সৌষ্ঠবলক্ষণযুক্ত, সেই সময়টিতেই বৌদ্ধধর্ম্ম এই ভারতভূমির প্রধান ধর্ম্ম ছিল।[৪০]

তৎকালে আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় রচনা দেখা যায়। ১৮৮০ খ্রী. (আশ্বিন ১৮০২ শক) থেকে এই পত্রিকায় রমানাথ সরস্বতী রচিত 'বুদ্ধদেব চরিত' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ললিতবিস্তর-গ্রন্থকে অবলম্বন করে লেখক এখানে বুদ্ধদেবের জীবনী ও চরিত্রমাহিমা বিবৃত করেছেন। এই সময়ে (শক ১৮০২। খ্রী. ১৮৮০) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখকের 'অশোকচরিত' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

৩

বাংলার জাতীয় চেতনায় ও সাহিত্যে বৌদ্ধসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র (১৮৩৮—৮৪) তথা 'নববিধান' আন্দোলনের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। বস্তুত নববিধানের প্রেরণায় আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অধিকতর আগ্রহের সঞ্চার হয়। রাজা রামমোহনকে (১৭৭৪—১৮৩৩) নিয়ে বাংলার নবযুগের সূচনা হলেও বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি নীরব ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭—১৯০৫) সম্বন্ধেও মোটের উপর এ কথা বলা চলে। রামমোহন—দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলন মূলত উপনিষদের ভাবধারার মধ্যে সীমিত ছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই ধর্মান্দোলনকে আরো ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দান করেন। ১৮৮০ খ্রী. নববিধানের সূচনা হয়। সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বমানবের ঐক্য প্রতিষ্ঠা ছিল নববিধানের মূল আদর্শ। এই আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য কেশবচন্দ্রের নির্দেশে তাঁর অনুগামী ভক্তগণ বিভিন্ন ধর্মের অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। সাধু অঘোরনাথ বৌদ্ধধর্মের, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় হিন্দুধর্মের, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার খ্রীষ্টধর্মের ও গিরিশচন্দ্র সেন ইসলামধর্মের অধ্যেতার পদে নিয়োজিত হন। অতঃপর এই পথ অনুসরণ করে চিরঞ্জীব শর্মা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ও মহেন্দ্রনাথ বসু শিখধর্মের অনুশীলনে রত হন। এর ফলে বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে

[৪০] সাংখ্যদর্শন, বিবিধ প্রবন্ধ

এক বিরাট সমন্বয়-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এসকল গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্ম ও মহাপুরুষের বাণীর মধ্যে সর্বত্র একটা সমন্বয় সাধনের সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি ব্রহ্ম সংগীতের মধ্যেও নববিধানের এই সমন্বয় সাধনার সুর অনুরণিত হয়েছে। যেমন চিরঞ্জীব শর্মা রচিত—

নব বিধানের জয় রে, কর ঘোষণা।
যার গুণে হল সর্বধর্ম সমন্বয় রে।
সত্যে সত্যে ভেদাভেদ, ঘুচিল এবার রে;
প্রেমানলে গলে সব হল একাকার রে।
যোগভক্তি কর্মজ্ঞান, ত্যজিল বিবাদ রে;
বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ গায় একেশ্বর রে।
ঈশামোহম্মদে জনক, আলিঙ্গন দেয় রে;
গৌরসিংহ শাক্যসিংহের গলা ধরে নাচে রে।[৪৪]

কিংবা কুঞ্জবিহারী দেব রচিত—

আয় কে যাবি পারে, বলে মাঝি ডাক্‌ছে সবে মধুর স্বরে;
লাগবেনা পারের কড়ি, বললে হরি, অনায়াসে যাবি তবে।
মহম্মদ শাক্য মুশা, গৌর ঈশা টানিছে দাঁড় ভক্তিভরে;
গেয়ে হরিনামের-সারি, সারি সারি যাচ্ছে জগৎ আলো করে।[৪৫]

এসকল গান নববিধানের ঐকতানের সুরে গাঁথা।

'নববিধান' সূচনার পূর্বেই কেশবচন্দ্র বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৫৯ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সিংহল গমন করেন। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও পুত্রপ্রতিম কেশবচন্দ্র। কেশবচন্দ্র ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সতীর্থ। সিংহলে গিয়ে কেশবচন্দ্র বৌদ্ধধর্মের জীবন্তরূপ প্রত্যক্ষ করেন। তখন থেকে তাঁর বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার হয়। সিংহলী বৌদ্ধদের ধর্মীয় জীবন, সমবেত প্রার্থনা প্রভৃতি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। পরে মহর্ষির সঙ্গে পরামর্শ করে ব্রাহ্মসমাজে মণ্ডলীগত উপাসনা প্রবর্তিত হয়। তা ছাড়া ব্রাহ্মসমাজের সদাচার, জাতিভেদের বিরোধিতা প্রভৃতির মধ্যে বৌদ্ধ ভাবাদর্শের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী কালে কেশবচন্দ্রের পারিবারিক দিক্ থেকেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি একটি সহজ অনুরাগ লক্ষ্য করবার বিষয়। কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর কৃষ্ণবিহারী সেন দীর্ঘকাল বৌদ্ধধর্মের অনুশীলনে রত ছিলেন। তিনি সাধনা পত্রিকায় ১৮৯১—৯২ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বুদ্ধের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

[৪৪] সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'সমন্বয় মার্গ' (১ম সং), পৃ. ৮৭
[৪৫] সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'সমন্বয় মার্গ' (১ম সং), পৃ. ৮৬

কৃষ্ণবিহারীর 'অশোকচরিত' (১৮৯২) বাংলাসাহিত্যে অশোকবিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। এই প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা মহারানী সুনীতি দেবীর (১৮৬৪—১৯৩২) রচিত The Life of Princess Yashodara (১৯২৯) গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধধর্মের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগের জন্যই কেশবচন্দ্রের পরিবারের সঙ্গে অনাগারিক ধর্মপালের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এমন কি তিনি ব্রহ্মানন্দের মাতৃদেবী সারদাসুন্দরীকে মা বলে ডাকতেন।[৩৬]

অনুরাগী ভক্তদের নিয়ে কেশবচন্দ্র একবার বুদ্ধগয়ায় তীর্থযাত্রা করেছিলেন। সেখানে তাঁরা সকলে বোধিদ্রুমতলে ধ্যান ও প্রার্থনা করেন। বুদ্ধগয়া থেকে আসার তিন মাস পরে কেশবচন্দ্র 'সাধু সমাগম' (১৮৮০) অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। এক একজন সাধুর সঙ্গে মনে-প্রাণে ও ধ্যান-ধারণায় মিলিত হওয়া এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। সাধু-সমাগমের তৃতীয় অনুষ্ঠান শাক্য-সমাগম। সংগীত ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যথারীতি ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে তা অনুষ্ঠিত হয়। সেই প্রার্থনায় তিনি বুদ্ধদেবের করুণা, জাতিভেদের বিরোধিতা ও মানবের দুঃখনিবৃত্তির পথ অনুসরণেব বিষয় বিবৃত করেন। এমনি ভাবে কেশবচন্দ্র যে বুদ্ধচেতনার সঞ্চার করেন তার ফলে কেশবমণ্ডলীর ভিতরে ও বাইরে বৌদ্ধধর্মের অনুশীলনে অধিকতর উৎসাহ দেখা দেয়।

কেশবচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুরাগী সাধু অঘোরনাথ (১৮৪১—৮১)। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে কেশবচন্দ্রের নির্দেশে তিনি বৌদ্ধধর্মের অধ্যেতার ব্রতে নিযুক্ত হন। অঘোরনাথ সংস্কৃত, পালি ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত বিভিন্ন বৌদ্ধগ্রন্থ অধ্যয়ন করে দুই বৎসরের কঠোর সাধনার পর 'শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' গ্রন্থখানি রচনা করেন। ১৮৮১ সালে রাওলপিণ্ডি থেকে ফিরবার পথে সাধু অঘোরনাথের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৮২ সালে এই বইখানি উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

'শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' নববিধানের সমন্বয়-সাহিত্যমালার প্রথম গ্রন্থ। আবার অন্য দিক্ থেকে সমগ্র বাংলাসাহিত্যের মধ্যে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে প্রথম সার্থক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, আমাদের দেশে তখনও মহাবোধি সোসাইটি, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা কিংবা Buddhist Text Society-র জন্ম হয় নি। এই গ্রন্থ রচনার সময় অঘোরনাথের হৃদয় যেভাবে বুদ্ধদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিল সেকথা তাঁর নিজের উক্তিতেই প্রকাশ পেয়েছে।—

> আমি তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছি, আমি তাঁহার নির্বাণরসের অমৃত পান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। সেই মুনিরত্ন আমার আত্মার ভূষণ।

[৩৬] 'সমন্বয় মার্গ' (১ম সং), পৃ. ২৮০

তিনি আমার জীবনের মূলে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার সমাধি ধ্যান বৈরাগ্য ও নির্বাণ পবিত্রতা ও দয়া আমার হৃদয়কে বশীভূত করিয়াছে। ...যিনি রাজপুত্র হইয়াও ভিক্ষুবেশে পথে পথে নগরে নগরে দয়ার্দ্রচিত্তে জীবগণের মুক্তি ও দুঃখ নির্বাণ করিবার জন্য ভ্রমণ করিলেন, যিনি অতুল ঐশ্বর্য ছাড়িয়া ভিক্ষায়ই পরম সুখ জ্ঞান করিলেন, যিনি রাজসিংহাসন ছাড়িয়া তরুতলে বাস সার করিলেন, তাঁহার এরূপ দয়া ও বৈরাগ্যের কথা মনে হইলে হৃদয় বিগলিত হয়, অশ্রুবেগ সংবরণ করা দুরূহ হইয়া পড়ে। এমন মহানুভবের প্রতি হৃদয় চিরকৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারে না। সেই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমি এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।[৩৭]

মূলত সংস্কৃত ললিতবিস্তরকে অবলম্বন করে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অঘোরনাথ তাঁর গ্রন্থে বুদ্ধদেবের পিতামাতার কাহিনী ও সমকালীন অবস্থা, জন্ম ও কৈশোর, পরিণয়, বৈরাগ্য ও নিষ্ক্রমণ, বিলাপ, সিদ্ধিলাভ ও নির্বাণ প্রভৃতি বর্ণনায় ললিতবিস্তরের আদর্শ অনুসরণ করেছেন। নির্বাণতত্ত্ব নিয়েও তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের শেষভাগে ৫২ পৃষ্ঠাব্যাপী 'বুদ্ধ-বচনসার' উদ্ধৃত করে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন দিক্ সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণে লেখকের মৌলিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট।

কেশব-মণ্ডলীর অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫১-১৯৩৬)। সাধু-সমাগম অনুষ্ঠান ও অঘোরনাথের 'শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' প্রকাশের ফলে বৌদ্ধধর্মের সম্বন্ধে যে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয় তার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের রচিত 'বুদ্ধদেব-চরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' (১৮৮৩)। এই গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক মতবাদ, ধ্যান-সমাধি, বৌদ্ধধর্মে নারীর স্থান, বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচার-প্রণালী প্রভৃতি সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থকারের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হল, বুদ্ধদেব নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না এবং খ্রীষ্টধর্ম বহুলাংশে বৌদ্ধধর্মের নিকট ঋণী।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বহু মূল্যবান নিবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের (১৮৮৩) অন্তর্গত 'বুদ্ধাবতার' অংশে তিনি বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের বিশদ আলোচনা করেছেন। বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে তিনি বৌদ্ধসম্রাট অশোকের উদারতা ও হর্ষবর্ধনের দানধর্মের অনুষ্ঠান প্রভৃতি উল্লেখ করেছেন। অশোকের ধর্মীয় উদারতার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

[৩৭] গ্রন্থকারের প্রস্তাবনা, পৃ. ২৭, 'শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' বুদ্ধজয়ন্তী সংস্করণ

> অবনিমণ্ডলের অপরাপর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ীরা এ অংশে যদি অশোকের পদরেণু কণামাত্র গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে অসংখ্য লোকের ধর্ম্ম দ্বেষ নিবন্ধন অকালে কালগ্রাস প্রবেশ নিবারিত হইত।[৩৮]

তা ছাড়া এখানে খ্রীষ্টধর্মের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্বন্ধেও আলোকপাত করা হয়েছে।

ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর 'ভারতকাহিনী' (১৮৮৩) গ্রন্থের অন্তর্গত অশোক, ভারতে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের প্রাধান্য, হিউয়েন-সাঙের ভারতভ্রমণ প্রভৃতি রচনায় বৌদ্ধভারতের চিত্রটি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

৪

আমাদের দেশে বৌদ্ধ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে বাঙালি বৌদ্ধ সাহিত্যিকদের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে বাংলাসাহিত্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতির আলোচনার সূত্রপাত করেন ঊনবিংশ শতকের বৌদ্ধ সাহিত্যিকগণ। বাংলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিভৃত পল্লীনিবাসে বসে তাঁরা যে সাধনার সূত্রপাত করেন তা বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতাগণের অগোচরে থাকলেও উপেক্ষণীয় নয়। ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্মের ক্ষীয়মাণ শেষ শিখাটি যেমন এ'রা পরম মমতায় আঁকড়ে আছেন, তেমনি বাংলাসাহিত্যের বৌদ্ধসংস্কৃতির ধারাকেও এ'রা সঞ্জীবিত রেখেছেন।[৩৯] বাংলার বৌদ্ধ সাহিত্যিকগণের মধ্যে কবি ফুলচন্দ্র বড়ুয়ার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি কবি নবীনচন্দ্র সেনের জন্মভূমি চট্টগ্রামের নয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ফুলচন্দ্রের পূর্বে বাঙালি বৌদ্ধ-সমাজে প্রচলিত পালাগান ইত্যাদি জাতীয় কয়েকটি রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু রচয়িতার নামধাম কিছু জানা যায় না। কবি ফুলচন্দ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের রাণী পুণ্যশীলা কালিন্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় 'বৌদ্ধরঞ্জিকা' (১৮৭৩) নামক এক সুললিত কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। 'চাক্‌মা জাতি'র কৃতী লেখক সতীশচন্দ্র ঘোষের ভাষায় বলতে গেলে, "ইহাতে বুদ্ধদেবের জন্মবিবরণ হইতে ধর্মপ্রচার, নির্বাণঘোষণা এবং পরিশেষে প্রিয়তম শিষ্য আনন্দের উপর যাবতীয় ভার ন্যস্ত করিয়া তিরোভাব ইত্যাদি সমুদয় কথা সরল পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে।"[৪০]

---

[৩৮] অক্ষয়কুমার দত্ত, 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' ২য় ভাগ (২য় সং), পৃ. ২৮২-৮৩

[৩৯] সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, বাঙালিমানস ও বৌদ্ধসংস্কৃতি, প্রবাসী, আষাঢ় ১০৬৯, পৃ. ৩৭২

[৪০] সতীশচন্দ্র ঘোষ, 'চাক্‌মা জাতি', পৃ. ১১৪

ফুলচন্দ্রের পর পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়ার (১৮৬০-৯৪) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৎকালে বাংলাদেশে পালিভাষা ও সাহিত্যে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ধর্মরাজ বহু বৌদ্ধগ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর প্রথম বৌদ্ধগ্রন্থ 'সুত্রনিপাত' (১৮৮৭) পালি সুত্তনিপাতের 'সরল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ' রূপে কলকাতা হতে প্রকাশিত হয়। এর পর তাঁর 'ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত', 'সিঙ্গালকসুত্ত', 'হস্তসার' ১ম ভাগ ও 'শ্যামাবতী' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। ধর্মরাজের 'হস্তসার' ১ম ভাগ (১৮৯৩) নিত্যপাঠ্য গ্রন্থরূপে বাঙালি বৌদ্ধদের প্রতি গৃহে স্থান লাভ করেছিল। বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ বেণীমাধব বড়ুয়ার কথায় বলতে গেলে, "যতদিন 'হস্তসার' নামটি থাকিবে, ততদিন ধর্মরাজের পুণ্যস্মৃতি বাংলার বৌদ্ধসমাজে দেদীপ্যমান থাকিবে"।[৫১] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, 'হস্তসার' গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথ প্রায় সময় নিজের কাছে রাখতেন। 'নটীর পূজা' ও 'চণ্ডালিকা' নাটিকার অধিকাংশ মন্ত্র এই গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

নবরাজ বড়ুয়া (১৮৬৬-৯৬) তাঁর স্বল্প জীবনকালের মধ্যে 'নীতিরত্ন', 'বৌদ্ধালঙ্কার', 'শিক্ষাসার' 'প্রকৃত সুখী কে', ' প্রসন্নজিতোপাখ্যান' ও 'বুদ্ধ-পরিচয়' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তৎকালীন বৌদ্ধ-গ্রন্থপ্রণেতারূপে ডাক্তার রামচন্দ্র বড়ুয়া (১৮৪৭-১৯২২), ভিক্ষু অগ্‌গসার (উপসম্পদা ১৮৮৩—মৃত্যু ১৯৪২) ও কবি সর্বানন্দ বড়ুয়ার (১৮৭০-১৯০৮) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সর্বানন্দ অল্পবয়সেই তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয় দেন। এডুইন আর্নল্‌ডের 'লাইট্ অব এশিয়া' অবলম্বনে তিনি 'জগজ্জ্যোতিঃ' কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের সাধারণ পাঠকের উপযোগী সংস্করণ 'শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত'। কবি নবীনচন্দ্র সেন 'জগজ্জ্যোতি'র পাণ্ডুলিপি পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, "সর্বানন্দ, তুমি 'জগজ্জ্যোতিঃ' লিখবে জানলে আমি 'অমিতাভ' লিখতাম না।"[৫২] এই উক্তির মধ্যে সর্বানন্দের কবিপ্রতিভার পরিচয় নিহিত আছে। এ ছাড়া সে যুগে বাঙালি বৌদ্ধদের আরো অনেকেই আমাদের জাতীয় চেতনায় ও সাহিত্যে বৌদ্ধ ভাবধারার প্রবর্তনে প্রয়াসী ছিলেন। এই সময়ে বৌদ্ধসংস্কৃতিমূলক যে কয়েকটি পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে তার মধ্যে বৌদ্ধ পত্রিকা, বৌদ্ধবন্ধু, জগজ্জ্যোতিঃ, জাগরণী, বুদ্ধিষ্ট্ ইন্ডিয়া, সংঘশক্তি, বৌদ্ধবাণী, উদয়, সম্বোধি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এর থেকে বুঝতে পারা যায়, আমাদের জাতীয় চেতনায় বৌদ্ধসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে বাংলার বৌদ্ধ সাহিত্যিকগণের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল।

---

[৫১] বেণীমাধব বড়ুয়া, বাংলাসাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ-অবদান, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫২শ ভাগ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৬২

[৫২] সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫২শ ভাগ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৬৬

৫

গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধদেব-চরিত' নাটক ও নবীনচন্দ্র সেনের 'অমিতাভ' কাব্য বাংলাসাহিত্যে বুদ্ধদেববিষয়ক প্রথম সার্থক সৃষ্টিধর্মী রচনা। বাংলার জাতীয় চিত্তে বুদ্ধমহিমা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ-দুখানির প্রভাব অপরিসীম। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় যথার্থই বলেছেন—

> গিরিশ ঘোষের 'বুদ্ধদেব-চরিত' নাটক এবং নবীন সেনের 'অমিতাভ' কাব্যে শুধু যে তৎকালীন বাঙালি মনই প্রতিফলিত হয়েছে তা নয়, এসব গ্রন্থ তখনকার জাতীয় চিত্তকে গৌতম বুদ্ধের মহত্ত্বের প্রতি উন্মুখ করে তুলতেও অনেকখানি সহায়তা করেছিল।[৫৩]

গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২) 'বুদ্ধদেব-চরিত' নাটক (প্রথম অভিনয় ১৮৮৫, প্রকাশিত ১৮৮৭) বাংলাদেশে এক অপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করে। ইতিপূর্বে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম নিয়ে যে আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে তা ছিল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আবদ্ধ, সাধারণের সঙ্গে এর অন্তরের যোগ ছিল ক্ষীণ। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নাটক আমাদের দেশের আপামর সকলের হৃদয় লুট করে নিল। গিরিশচন্দ্র বুদ্ধমহিমাকে আমাদের জাতীয় চিত্তে যে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলাসাহিত্যে তার তুলনা নেই। আরো একদিক্ থেকে গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব-চরিত' নাটক উল্লেখযোগ্য। এর পূর্বে বা পরে বুদ্ধদেবের জীবনী নিয়ে বাংলায় এমন পূর্ণাঙ্গ সার্থক নাটক আর রচিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ মালিনী, নটীর পূজা, চণ্ডালিকা প্রভৃতি নাটক রচনা করলেও বুদ্ধদেবের জীবনচরিত নিয়ে কোন নাটক রচনা করেন নি।

এডুইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' কাব্য অবলম্বনে 'বুদ্ধদেব-চরিত' নাটক রচিত। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকখানি আর্নল্ডের নামে উৎসর্গ করেন। ১৮৮৫ খ্রী. ১৯শে সেপ্টেম্বর স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনয়ের দিন আর্নল্ড স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

গিরিশচন্দ্র নাটকের প্রারম্ভে বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতাররূপে চিত্রিত করেছেন। এ ছাড়া প্রায় সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ ও ঐতিহাসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছে। সিদ্ধার্থের জন্ম, বিবাহ, গৃহত্যাগ, সাধনা ও বোধিজ্ঞানলাভ প্রভৃতি বর্ণনায় গিরিশচন্দ্রের নাট্যনিপুণতার স্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে। পুত্রশোকাতুরা নারীকে বুদ্ধদেবের প্রবোধদান, পাপাচারী দস্যুকে সৎপথে আনয়ন ও ছাগবলির পরিবর্তে বুদ্ধদেবের আত্মবিসর্জনের কামনা হৃদয়ে এক অপূর্বভাবের সৃষ্টি করে। পুত্রকামনায় রাজা বিম্বিসার সহস্রবলির

[৫৩] প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ৫০

আয়োজন করেন। অসহায় পশুর কাতর ক্রন্দনে বিচলিত সিদ্ধার্থের করুণসুন্দর রূপটি এখানে গিরিশচন্দ্র এক অপরূপ মহিমায় প্রকাশ করেছেন।—

করি পুত্রের কামনা,
কর জগন্মাতা উপাসনা;—
কেন তবে কর বধ কোটি কোটি প্রাণী?
জগন্মাতা—
পুত্র তার ক্ষুদ্র কীট আদি!
দেখ নীরব ভাষায়
ছাগপাল মুখ তুলে চায়!
যদি, নৃপ, কৃপা নাহি কর—
দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ?
নির্দয় যে জন—
দেবগণ নির্দয় তাহার প্রতি।
নরপতি!
কেন প্রাণীনাশ করি ভাসাইবে ক্ষিতি?
রাজকার্য দুর্বল-পালন—
দুর্বল এ ছাগপাল;
হায়! হায়! ভাষায় বঞ্চিত—
নহে—উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত তোমায়—
'প্রাণ যায় রক্ষা কর নরনাথ!'

রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের গোবিন্দমাণিক্যের মুখে যেন এই উক্তির প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্রের নাটকে বুদ্ধদেবের অপার করুণার বাণী ও সীমাহীন আত্মত্যাগের কাহিনী সেদিন বাঙালির অন্তর জয় করে নিয়েছিল।

গিরিশচন্দ্রের বৌদ্ধধর্ম-সম্পর্কিত আরেকটি নাটক 'অশোক' (১৯১১)। অশোকাবদানের কাহিনী অবলম্বনে এই নাটক রচিত। এখানে ক্ষমা ও অহিংসার বাণীই কীর্তিত হয়েছে।

গিরিশচন্দ্রের অল্পকাল পরেই শরচ্চন্দ্র দেবের 'শাক্যসিংহ প্রতিভা বা বুদ্ধদেব-চরিত' (১৮৮৮) নাটক প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য গিরিশচন্দ্রের তুলনায় এই নাটক অনেকটা নিষ্প্রভ।

গিরিশচন্দ্রের বুদ্ধদেব-চরিতের পর নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) 'অমিতাভ' কাব্য (১৮৯৫) বাংলাদেশে বিশেষ সমাদর লাভ করে। নবীনচন্দ্রের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, কল্পনাশক্তি ও আন্তরিক প্রকাশের আবেগে বুদ্ধদেবের

মানবমহিমা এখানে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তবে গিরিশচন্দ্রের মত প্রথম থেকে অবতাররূপে কল্পনা করার জন্য এখানে বুদ্ধদেবের মানবিকতা কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে।

'অমিতাভ' রচনায় নবীনচন্দ্রের প্রধান অবলম্বন আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' কাব্যগ্রন্থ। এ ছাড়াও তিনি আরো বহু বৌদ্ধগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। জন্মভূমি চট্টগ্রামে তিনি যে বৌদ্ধধর্মের জীবন্ত আদর্শ প্রত্যক্ষ করেন তা'ও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

'অমিতাভ' কাব্য বুদ্ধদেবের জন্ম, কৈশোর, অশোকোৎসব, বিবাহ, মহানিষ্ক্রমণ, সাধনা, সিদ্ধি প্রভৃতি ঊনিশ সর্গে বিভক্ত। সমগ্র কাব্যের মধ্যে বুদ্ধদেবের মৈত্রী-করুণ রূপটি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের প্রায় যথাযথ অনুসরণ করা হয়েছে। পরিশেষে এই কাব্য-প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্রকে লিখিত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানা পত্রের অংশবিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে।—

> যেমন ভাগীরথী তীর তরুচ্ছায়া, নীলানন্ত প্রতিবিম্ব প্রভৃতি শত সহস্র শোভা বুকে করিয়া সমুদ্র অনুসারিণী, আপনার কাব্যতরঙ্গিণীও সেইরূপ শোভাময়ী, গাম্ভীর্যময়ী, আবেগময়ী হইয়াও অনন্ত অনুসারিণী। সেই অনন্তের ছায়া আপনার কবিতার ছত্রে ছত্রে অনুভূত হয়।[৩৪]

'অমিতাভ' কাব্যের মূল্যায়নে কবি-সমালোচকের এই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি অর্থহীন নয়।

৬

১৮৯১ সালে সিংহলের অনাগারিক ধর্মপাল (১৮৬৪-১৯৩৩) বৌদ্ধধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় আসেন। ইতিপূর্বেই আমাদের জাতীয় চিত্ত গৌতমবুদ্ধের মহত্ত্বের প্রতি উন্মুখ হয়ে ছিল। সেজন্য ধর্মপাল যখন বৌদ্ধধর্মের বাণী নিয়ে কলকাতায় আসেন তখন তিনি সহজেই শিক্ষিত বাঙালি-মনের আনুকূল্য লাভ করেন। তিনি যেসকল বাঙালি মনস্বীর আন্তরিক সমর্থন লাভ করেন এর মধ্যে নরেন্দ্রনাথ সেন, নীলকমল মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণবিহারী সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সহায়তা নিয়েই ধর্মপাল কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটি (১৮৯১) প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর এর মুখপত্ররূপে মহাবোধি পত্রিকা প্রকাশিত

[৩৪] 'আমার জীবন', নবীনচন্দ্র-রচনাবলী ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৬-৪৭

হয়। এ ছাড়া ধর্মপালের আরো বহু কর্মপ্রচেষ্টার নিদর্শন আছে। তিনি বুদ্ধগয়ার মোহান্তের হাত থেকে মহাবোধি মন্দির উদ্ধার করেন এবং ভারত ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন স্থানে মহাবোধি সোসাইটির কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করেন। কলকাতায় ধর্মরাজিক চৈত্যবিহার (১৯২০) এবং সারনাথের মূলগন্ধকুটি বিহার (১৯৩১) প্রতিষ্ঠা ধর্মপালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ১৯৩১ সালে ধর্মপালের উপস্থিতিতে মূলগন্ধকুটি বিহারের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'বুদ্ধদেবের প্রতি' (ওই নামে একদিন ধন্য হল...) নামক প্রসিদ্ধ কবিতা রচনা করেন। তা ছাড়া বুদ্ধদেবের মৈত্রী, করুণা ও সেবাধর্মের প্রতিষ্ঠাদানে ধর্মপালের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক সমর্থন ছিল।

১৮৯৩ সালে তরুণ ধর্মপাল শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদান করে জগদ্বাসীর সম্মুখে বৌদ্ধধর্মের আদর্শ সগৌরবে তুলে ধরেন। সেখানে সমবয়সী বিবেকানন্দের সঙ্গে ধর্মপালের যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল।[৩৩]

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবনে ধর্মপালের সঙ্গে আরো একজনের নাম করতে হয়। ইনি কর্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবির (১৮৬৫-১৯২৬)। ধর্মপাল কর্তৃক মহাবোধি সোসাইটি প্রতিষ্ঠার অত্যল্পকালের মধ্যেই কৃপাশরণের উদ্যোগে কলকাতায় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা (১৮৯২) প্রতিষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া গুণালঙ্কার লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা ও বৌদ্ধধর্মের মুখপত্ররূপে জগজ্জ্যোতিঃ পত্রিকা প্রকাশ কৃপাশরণের স্মরণীয় কীর্তি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি শিক্ষার প্রবর্তনেও কৃপাশরণের প্রভাব ছিল। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। ধর্মাঙ্কুর সভার সঙ্গেও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যা হক, ধর্মাঙ্কুর সভার প্রতিষ্ঠা ও জগজ্জ্যোতির প্রকাশের ফলে বাঙালি মনস্বীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবনে ধর্মপালের ন্যায় কৃপাশরণের নামও অমর হয়ে থাকবে।

৭

কেশবচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাধু অঘোরনাথ ও কৃষ্ণকুমার মিত্র বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ক যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এর পর দেখা যায় নববিধান সমাজের 'শ্লোক সংগ্রহ' গ্রন্থের তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণে (১৮৮৬) ললিতবিস্তরের বচন স্থান পেয়েছে। পরে মহাপরিনির্বাণ সূত্র ও

[৩৩] সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, ধর্মপাল ও বিবেকানন্দ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪

ধর্মপদের বাণীও গৃহীত হয়। এতদ্‌ব্যতীত নববিধানমণ্ডলীর মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্মের অনুশীলন প্রসঙ্গে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কালীশঙ্কর দাস, কৃষ্ণবিহারী সেন, ব্রজগোপাল নিয়োগী ও বিনয়েন্দ্রনাথ সেন-প্রমুখ সুধীবৃন্দের নাম উল্লেখযোগ্য।

কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর কৃষ্ণবিহারী সেন (১৮৪৭-৯৫) কর্তৃক ইংরেজি ও বাংলায় লিখিত বৌদ্ধধর্ম-সম্বন্ধীয় রচনাবলী তৎকালে বিশেষ সমাদর লাভ করে। ১৮৯১ সালে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ও রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় 'সাধনা' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। সাধনার প্রথম বর্ষ থেকে কৃষ্ণবিহারীর 'বুদ্ধদেব-চরিত' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণবিহারীর 'অশোক-চরিত' (১৮৯২) বাংলাসাহিত্যে অশোকবিষয়ক প্রথম সার্থক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'অশোকচরিত' নাটক সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কৃষ্ণবিহারীর আরো অনেক কাল পরে ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথের Asoka, The Buddhist Emperor of India (১৯০১) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয। এর দুবছর পরে প্রকাশিত হয রিস্ ডেভিড্‌সের সুবিখ্যাত Buddhist India (১৯০৩) গ্রন্থখানি। কৃষ্ণবিহারীর 'অশোক-চরিত' প্রকাশিত হলে 'সাধনা' পত্রিকায় যে সমালোচনা করা হয় তা এখানে উল্লেখযোগ্য।—

> এই গ্রন্থখানি সকলেরই পাঠ করা উচিত। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় দুর্লভ। শুধু বঙ্গভাষায় কেন, কোন বিদেশীয় গ্রন্থে অশোকের চরিত এত বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা সমস্ত জানিতে হইলে অনেকগুলি গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। তাহা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। গ্রন্থকার তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ফল একাধারে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ পাঠক-বর্গের মহৎ উপকার করিয়াছেন। এই অশোকচরিত পাঠ করিলে তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস, অবস্থা, ভাষা, সভ্যতার উন্নতি প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গ্রন্থের আরেকটি গুণ এই যে, ইহা অতি সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। গ্রন্থের উপসংহারে অশোকচরিত সম্বন্ধীয় একটি ক্ষুদ্র নাটিকা সংযোজিত হইয়াছে। ইহাকে একটি ফাউস্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে। ফাউটিও ফেলার সামগ্রী নহে, উহাতেও একটু বেশ রস আছে।[৪৪]

কৃষ্ণবিহারীর 'অশোক-চরিত' যথার্থই তাঁর 'অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ফল।' এখানে তাঁর গভীর ইতিহাসনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে এই

---

[৪৪] সাধনা, ১২৯৯ পৌষ, পৃ. ১৭৯-৮০; প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে উদ্‌ধৃত, পৃ. ৭০

ধারা অনুসরণ করে বাংলাভাষায় অশোকবিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে চারুচন্দ্র বসু রচিত 'অশোক বা প্রিয়দর্শী' (১৯১১), সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোক' (১৯৪০) এবং প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ধর্মবিজয়ী অশোক' (১৯৪৭) গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। কৃষ্ণবিহারীর অশোকচরিতের পর ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৯০৭) এবং গিরিশ-চন্দ্র (১৯১১) যে 'অশোক' নাটক রচনা করেন তা'ও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মনীষী বিনয়েন্দ্রনাথ সেন (১৮৬৮-১৯১৩) তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য একসময়ে রবীন্দ্রনাথেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তাঁর Intellectual Ideal (১৯০২) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে শঙ্কর ও বৌদ্ধদর্শনের তুলনা করা হয়েছে। তাঁর 'আরতি' (১৯১০) বইটিতেও বৌদ্ধধর্মের বিষয় সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে।

বাংলাসাহিত্যে বৌদ্ধধর্মচর্চার ক্ষেত্রে বিজয়চন্দ্র মজুমদারের (১৮৬১-১৯৪২) একটি বিশেষত্ব আছে। এখানে তিনি গল্প, কবিতা, অনুবাদ ও ইতিহাস কোনটাই বাদ দেন নি। তাঁর বৌদ্ধযুগের ঐতিহাসিক কাহিনী ও কিংবদন্তী অবলম্বন করে রচিত গাথাকবিতা ও গল্পগুলি 'কথা ও বীথি' (১৮৯৩) এবং 'কথানিবন্ধ' (১৯০৫) গ্রন্থদ্বয়ের অন্তর্গত। কল্যাণী, চপলা ও মণিমালা প্রভৃতি গল্পে বৌদ্ধযুগ ও বৌদ্ধধর্মের মহিমা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শ্রমণ বসুমিত্রের প্রতি মিথিলার বণিক্‌দুহিতা সুনন্দার অনুরাগ নিয়ে রচিত 'সুনন্দা' গাথাকবিতাটি ঐকান্তিক নিষ্ঠা, প্রেম ও আত্মত্যাগের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। বিজয়চন্দ্রের 'যজ্ঞভস্ম' (১৯০৪) কাব্যগ্রন্থে সুজাতা এবং খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি কবিতা-দুটি স্থান পেয়েছে। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি কবিতায় বৌদ্ধভারতের বিগত মহিমা স্মরণ করে কবির মর্মবেদনা উৎসারিত। 'পঞ্চক মালা' (১৯১০) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সুগত-পঞ্চক'-এ মায়াদেবীর দেবপূজা, দেবশিশু, জাগরণ, নির্বাণ ও সুসমাচার—এই পাঁচটি ভাগে বুদ্ধদেবের জীবন-বৃত্তান্ত সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিজয়চন্দ্রের অন্যতম কীর্তি পালি 'থেরীগাথা' ও 'উদানের' স্বচ্ছন্দ পদ্যানুবাদ। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' কাব্যের প্রথম পাঁচটি সর্গও তিনি বাংলা পদ্যানুবাদ করেন। এর প্রথম সর্গ ও ধনিয় সুত্তের পদ্যানুবাদ 'হেঁয়ালি' (১৯১৫) কাব্যগ্রন্থের পরিশিষ্টে সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়া তিনি ভিন্ন ভিন্ন পালি গ্রন্থ থেকে কিছু কবিতা সংগ্রহ করে অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু কবির অনবধানতার জন্য সেগুলি আর রক্ষা পায় নি।

তৎকালে ঠাকুর পরিবারের মধ্যেও বৌদ্ধধর্মের চর্চা ছিল। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রকে নিয়ে সিংহলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা বৌদ্ধধর্মের প্রাণবাণী নিয়ে ফিরে আসেন।

তবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তেমন কিছু লেখেন নি। এই অভাব পূর্ণ করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র। মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর 'আর্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত' (১৮৯৯) নিবন্ধে বৌদ্ধদর্শন ও বেদ-বেদান্ত প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আলোচিত হয়েছে। মহর্ষির মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) রচিত 'বৌদ্ধধর্ম' (১৯০১) গ্রন্থখানি বাংলাসাহিত্যে নানাদিক্ থেকে একটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। ইতিহাস ও তত্ত্বের দিক্ থেকে গ্রন্থকার এখানে যথাযথভাবে বৌদ্ধধর্মের অনুসরণ করেছেন। তিনি হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বৌদ্ধমতের উপর কোনপ্রকারে হিন্দুমত আরোপের প্রয়াস করেন নি, বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্যের প্রতি বরাবর লক্ষ্য রেখেছেন। এখানেই বৌদ্ধধর্মের আলোচনায় সত্যেন্দ্রনাথের সার্থকতা।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) সত্যেন্দ্রনাথের অত্যল্পকাল পূর্বে Civilization of India (১৯০০) নামক ইতিহাস গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বৌদ্ধসংস্কৃতির গবেষণার ক্ষেত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সার্থক উত্তরসাধক। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপক গবেষণা ও বিষয়বৈচিত্র্যে তিনি রাজেন্দ্রলালকেও অতিক্রম করে গিয়েছেন মনে হয়। তিনি বৌদ্ধধর্ম-সম্বন্ধীয় বহু পুথি সংগ্রহ করে এর বিবরণ প্রকাশ করেছেন, বহু বৌদ্ধগ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। তা ছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, নারায়ণ প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তিনি ইংরেজি ও বাংলাতে বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ক বহু মূল্যবান রচনা প্রকাশ করেন। বাংলায় বৌদ্ধ-ধর্মের ইতিহাস উদ্ধার ও তার উপর নূতন আলোকসম্পাতে হরপ্রসাদের নাম অমর হয়ে থাকবে। বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের মূলে তাঁর কৃতিত্ব অনেকখানি। তিনি বৌদ্ধধর্ম-সম্বন্ধীয় যেসকল গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন তার মধ্যে Discovery of Living Buddhism in Bengal (১৮৯৭), বৌদ্ধগান ও দোহা (১৯১৬), বৌদ্ধধর্ম (১৯৪৮), বৃহৎ স্বয়ম্ভূপুরাণ (১৮৯৪-১৯০০), অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ কাব্য (১৯১০) ও আর্য্যদেবের চতুঃশতিকা (১৯১৪) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে সংস্কৃত পুথির বিবরণ-সম্বলিত যে তালিকা প্রকাশ করেন তার প্রথম খণ্ডটি বৌদ্ধ পুথির বিবরণ।

বৌদ্ধযুগের পটভূমিতে হরপ্রসাদ দুখানি উপন্যাসও রচনা করেছেন। তাঁর 'কাঞ্চনমালা' (প্রথম প্রকাশ, বঙ্গদর্শন ১৮৮২) উপন্যাস কুণাল-অবদান অবলম্বনে অশোকের রাজত্বের পটভূমিতে রচিত। হরপ্রসাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'বেণের মেয়ে' (১৯১৯)। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তকার সুকুমার সেন মহাশয়ের কথায় বলতে গেলে, "এই উপন্যাস-চিত্রটিতে দশম-একাদশ শতাব্দীর সপ্তগ্রাম অঞ্চলের কাল্পনিক আলেখ্য জীবন্ত ইতিহাস হইয়া ফুটিয়াছে।"[৫৭]

৮

আমাদের দেশে বুদ্ধচর্চার ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) ঐকান্তিক অনুরাগ ও উৎসাহের পরিচয় দিয়েছেন। মনে হয় একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে এদিক্ থেকে বিবেকানন্দের তুলনা পাওয়া কঠিন। বুদ্ধদেবের প্রতি বিবেকানন্দের এই আকর্ষণের কারণ ছিল তাঁর জীবনের মর্মমূলেই। লৌহের মধ্যে আকর্ষণী শক্তি আছে বলে চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করতে পারে। বিবেকানন্দের জীবনের মূলে সেই আকর্ষণী শক্তি ছিল বলেই বুদ্ধদেবের সীমাহীন মহত্ত্ব তাঁকে এমনি ভাবে আকর্ষণ করতে পেরেছে। তিনি নিছক পুরাতত্ত্ব কিংবা দর্শন আলোচনার জন্য বুদ্ধচর্চা করেন নি। বুদ্ধদেবকে তিনি জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, বুদ্ধবাণী সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মসাধনায়।

ধর্মীয় মতবাদের দিক্ থেকে বিবেকানন্দ ছিলেন বেদান্তের অনুগামী, বৌদ্ধদর্শনের নয়। নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি বৌদ্ধমত তাঁর ধ্যানধারণার অনুকূল ছিল না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও জগতের সকল মহাপুরুষের মধ্যে বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর সর্বাপেক্ষা বেশি আকর্ষণ ছিল। এমন কি বুদ্ধদেবকে তিনি নিজের ঈশ্বর বলে অভিহিত করতেন। বুদ্ধদেবের প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ-হেতু সন্ন্যাস জীবনের সূচনাতেই তিনি বুদ্ধগয়ায় ছুটে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি ধ্যান প্রার্থনাদি করেন। আবার জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও তিনি জাপানি মনীষী ওকাকুরার সঙ্গে বুদ্ধগয়ায় গমন করেন। একসময়ে ভারত-ভ্রমণকালে ভগবান বুদ্ধের ভস্মাবশেষ স্পর্শ করে তিনি যেভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, সেকথা তিনি বহুবার উল্লেখ করেছেন।[৫৮] এর থেকে অনুমান করা যায়, বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর কি গভীর ভক্তি ছিল।

---

[৫৭] সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় খণ্ড (৩য় সং), পৃ. ২৪২
[৫৮] ভগিনী নিবেদিতা, 'স্বামীজিকে যেরূপ দেখিয়াছি', পৃ. ২৪২, (উদ্বোধন সংস্করণ)

বিবেকানন্দের চরিত্রের অসাধারণত্ব কোথায় ও তাঁর বুদ্ধভক্তির কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় বলেছেন—

> সে চরিত্রের যে-দিক্‌টি অসাধারণ, যাহা মহামনীষিগণকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছে, সেই দিক্‌টির কথা এইবার বলিব। ভগবান বুদ্ধের প্রসঙ্গমাত্রে তাঁহার নিজের সেই অপূর্ব ভাবাবেশের কথা স্মরণ হয়, এবং তাহাতেই অনুমান করা যায়, বিবেকানন্দ আজীবন কি কারণে বুদ্ধকে এত ভক্তি করিতেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বেও যেমন তিনি বুদ্ধগয়ায় গিয়া বোধিবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া রোমাঞ্চকলেবর হইয়াছিলেন, তেমনই জীবনের সর্বশেষ তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন সারনাথে। তিনি এমন কথাও বলিতেন যে, অতি অল্প বয়সে ভাবাবেশে তিনি বুদ্ধের সাক্ষাৎ-দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। ইহা আশ্চর্য নয়, বুদ্ধের সঙ্গে তাঁহার আত্মার সগোত্রতা ছিল—তিনিও অতীত ও অনাগত বুদ্ধগণের বংশে জন্মিয়াছিলেন; বুদ্ধের মতই তিনি যত বড় সন্ন্যাসী, তত বড় প্রেমিক।[৩১]

বাস্তবিকই বুদ্ধদেবের সঙ্গে বিবেকানন্দের আত্মার সগোত্রতা ছিল। সেজন্য দেখা যায় বুদ্ধদেবের মত মানুষের প্রতি অসীম করুণা ও সহানুভূতিতে তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ, বুদ্ধদেবের মতই তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। বুদ্ধদেবের সঙ্গে বিবেকানন্দের আন্তরিক যোগসূত্র এখানেই।

বুদ্ধদেবের অপার করুণা ও অতুলনীয় সহানুভূতি বিবেকানন্দকে সর্বাপেক্ষা বেশি আকৃষ্ট করেছে। বুদ্ধমহিমার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

> নির্বাণে তাঁহার মহত্ত্ব বিশেষ কি? তাঁহার মহত্ত্ব in his unrivalled sympathy (তাঁহার অতুলনীয় সহানুভূতিতে)। তাঁহার ধর্মের যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতি গূঢ়তত্ত্ব, তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে; নাই তাঁহার intellect এবং heart, যাহা জগতে আর হইল না।[৩০]

ক্ষুদ্র ছাগশিশুর জন্য বুদ্ধদেবের জীবনদানের সংকল্প, বারবনিতা আম্র-পালির প্রতি করুণা, মৃত্যুর পূর্বেও অন্ত্যজ অস্পৃশ্যের গৃহে অন্নগ্রহণ, পাঁচশ বার পরহিতার্থে জন্মগ্রহণ ও আত্মবিসর্জন—এসকল কাহিনী বিবেকানন্দ কত বার গভীর আবেগের সহিত উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধদেবের এই সীমাহীন মহত্ত্বের জনাই তিনি নিজেকে বুদ্ধের দাসানুদাস বলে পরিচয় দিতে গৌরববোধ করতেন।

---

[৩১] মোহিতলাল মজুমদার, 'বাংলার নবযুগ', পৃ. ১৩৫
[৩০] পত্রাবলী (১ম ভাগ), পৃ. ৪৬

বিবেকানন্দের রচনার মধ্যে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' বুদ্ধবচনটি বারবার উল্লিখিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দের জীবনের প্রধান ব্রতও ছিল তাই। আর সে জন্যই তিনি মানবকল্যাণের শ্রেষ্ঠ প্রতীক বুদ্ধদেবের প্রতি এত শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।—

> আমি একমাত্র কর্ম বুঝি পরোপকার, বাকি সমস্ত কুকর্ম। তাই শ্রীবুদ্ধদেবের পদানত হই।[৬১]

বুদ্ধদেবের মত মানুষের দুঃখমোচনের সংকল্প ছিল তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা। এর কাছে তিনি ভক্তি-মুক্তি কিংবা শুষ্ক পাণ্ডিত্যকে অতি তুচ্ছ মনে করতেন। আর্ত ও নিপীড়িত মানবের কাতরক্রন্দনে যেমন মহাকারুণিক বুদ্ধ একদিন রাজ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ঘরছাড়া সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তেমনি দুঃখদৈন্য নিপীড়িত চিরপতিত ভারতবাসীর কাতর আহ্বানে বিবেকানন্দ সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আপন জীবনের দুঃখের অভিজ্ঞতাও তাঁর কম ছিল না। চোখের সম্মুখে দেখেছেন অনাহারে ক্লিষ্ট মা-ভাই-বোনের শীর্ণ মুখচ্ছবি। সেই দৃশ্য একদিন তিনি দেখতে পেলেন স্বদেশের বৃহৎ পটভূমিকায়। স্বদেশের অধঃপতিত মানুষের জন্য চিরদিন তাঁর হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ হয়েছে। দেশের মানুষকে তিনি যেভাবে ভালবেসেছেন তেমন করে আর কেউ পেরেছেন কিনা সন্দেহ। দেশের এই নিরীহ পদদলিত মানুষের প্রতি তাঁর অসীম ভালবাসা একটি পত্রে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে।—

> এস, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে দিবারাত্র দারিদ্র্য, পৌরোহিত্য-শক্তি এবং প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতদের জন্য প্রার্থনা করি। দিবারাত্র তাদের জন্য প্রার্থনা কর। বড়লোক ও ধনীদের কাছে আমি ধর্মপ্রচার করতে চাই না। আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই; না, না—আমি সাধুও নই। আমি গরিব—গরিবদের আমি ভালবাসি। আমি এদেশে (পাশ্চাত্ত্যে) যাদের গরিব বলা হয়, তাদের দেখছি—আমাদের দেশের গরিবদের তুলনায় এদের অবস্থা অনেক ভাল হলেও কত লোকের হৃদয় এদের জন্য কাঁদছে! কিন্তু ভারতের চিরপতিত বিশকোটি নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে? তাদের উদ্ধারের উপায় কি? তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বলো? তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পাচ্ছে না—তারা শিক্ষা পাচ্ছে না—কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে বলো? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? এরাই তোমাদের ঈশ্বর, এরাই

[৬১] পত্রাবলী (১ম ভাগ), পৃ. ৪১১

তোমাদের দেবতা হোক—এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক। তাদের জন্য ভাব, তাদের জন্য কাজ কর, তাদের জন্য সদাসর্বদা প্রার্থনা কর—প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন। তাকেই আমি মহাত্মা বলি, যার হৃদয় থেকে গরিবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়, তা না হলে সে দুরাত্মা।[৩২]

১৮৯৮ খ্রী. ২৫শে মার্চের পুণ্যতিথিতে মানসকন্যা নিবেদিতাকে দীক্ষাদানের সময়ও মহাপ্রেমিক বিবেকানন্দ যে-পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, তার থেকেও তাঁর চরিত্রের আসল দিক্‌টি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। ভগবান বুদ্ধের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে তিনি আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললেন—

যাও বৎসে, যিনি বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে পাঁচশবার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ ও প্রাণবিসর্জন করেছিলেন, সেই বুদ্ধকে অনুসরণ কর।[৩৩]

বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীতে বুদ্ধদেবের ত্যাগধর্মের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগের পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি দেশের যুব-সম্প্রদায়কে বারে বারে ডাক দিয়েছেন দেশের সেবায়—নরনারায়ণের সেবায় নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার জন্য। বিবেকানন্দ কর্তৃক সর্বত্যাগী ও মঠাশ্রয়ী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গঠনের মধ্যেও বৌদ্ধসংঘের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আজও বিবেকানন্দের অনুগামিগণ আমাদের দেশে সেবাধর্মের আদর্শ উজ্জ্বল করে রেখেছেন।

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে জগতের মহাপুরুষদের মধ্যে একমাত্র গৌতমবুদ্ধই সম্পূর্ণ অভিসন্ধিবর্জিত আদর্শ কর্মযোগী। বুদ্ধদেব ব্যতীত অন্য সকলেরই কর্মপ্রয়োজক প্রবৃত্তির কারণ ছিল বাইরের অভিসন্ধি। এঁদের কেউ জগতে অবতীর্ণ ঈশ্বর, কেউ বা ঈশ্বরের পুত্র, আবার কেউ ঈশ্বরের প্রেরিত প্রতিনিধি। তাঁদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেই স্বর্গলাভের অধিকারী হওয়া যায় বলে তাঁরা ঘোষণা করেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের মতে মানুষ নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা, অন্য কেউ তাকে মুক্তি দিতে পারে না। ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে সূক্ষ্মবিচারের কোন প্রয়োজন নেই। সত্য যা-ই হোক না কেন, কুশল কর্ম সম্পাদন করলে তা লাভ করা যায়। জগতের শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী বুদ্ধদেবকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিবেকানন্দ বলেছেন—

তিনি সম্পূর্ণরূপে সর্বপ্রকার অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন; আর কোন্‌ মানুষ তাঁহা অপেক্ষা অধিক কার্য করিয়াছিলেন? ইতিহাসে এমন একটি চরিত্র দেখাও, যিনি সকলের উপরে এতদূর গিয়াছেন। সমুদয়

[৩২] পত্রাবলী (১ম ভাগ), পৃ. ৩১২
[৩৩] প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, 'ভগিনী নিবেদিতা', পৃ. ৭৫

> মনুষ্যজাতি কেবল এইরূপ একটিমাত্র চরিত্র প্রসব করিয়াছে—এতদূর উন্নত দর্শন! এমন অদ্ভুত সহানুভূতি! এই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন প্রচার করিয়াছেন, আবার অতি নিম্নতম প্রাণীর উপর পর্যন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন; অথচ লোকের নিকট কোন দাবীদাওয়া নাই। বাস্তবিক তিনিই আদর্শ কর্মযোগী—তিনি সম্পূর্ণ অভিসন্ধিশূন্য হইয়া কার্য করিয়াছিলেন; আর মনুষ্যজাতির ইতিহাস দেখাইতেছে—যতলোক জগতে জন্মিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সহিত অন্য সকলের তুলনা হয় না।[৬৪]

জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে বুদ্ধদেব মানবাত্মার মুক্তি ঘোষণা করলেন। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হল জন্মে নয়, কর্মে ও সদাচরণে। সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ অস্পৃশ্য মানুষও এতদিনে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। এটিও বুদ্ধদেবের প্রতি বিবেকানন্দের অনুরাগের অন্যতম প্রধান হেতু। অস্পৃশ্য অন্ত্যজের গৃহে বুদ্ধদেব সানন্দে অন্নগ্রহণ করেন, চণ্ডালকে আলিঙ্গন করতে কোন দ্বিধা নেই, ক্ষৌরকার উপালিও বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্যের মর্যাদা পেয়েছেন—এসকল কাহিনী বিবেকানন্দ কতবার গভীর আবেগসহকারে প্রকাশ করেছেন।[৬৫] বিবেকানন্দের জীবনেও দেখা যায়, মুসলমানের গৃহে তিনি নিঃসঙ্কোচে অন্নগ্রহণ করেছেন, বৃন্দাবনের পথে মেথরের হাত থেকে কল্‌কে গ্রহণ করতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই।[৬৬] ছুঁৎমার্গ, খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার, পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকি প্রভৃতির পুঞ্জীভূত গ্লানিতে বহুযুগ ধরে জাতির প্রাণশক্তির বিরাট অপচয় হয়েছে। তাই জাতির প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বিবেকানন্দ বলেছেন—

> মহা দ'ক সামনে—সাবধান, ঐ দ'কে সকলে পড়ে মারা যায়। ঐ দ'ক হচ্ছে যে, হিঁদুর (এখনকার) ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। (এখনকার) হিঁদুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছুঁৎমার্গে; আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা, বাস্। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইয়োনা। 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' কি কেবল পুঁথিতে থাকবে না কি? যারা এক টুক্‌রো রুটি গরিবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দেবে! যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায়, তারা আবার অপরকে কি পবিত্র করবে? ছুঁৎমার্গ is a form of

[৬৪] কর্মযোগ (বিংশ সং), পৃ. ১৬৮
[৬৫] দেববাণী (১৩৫৩ সং), পৃ. ১০৭
[৬৬] সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, 'বিবেকানন্দ চরিত', পৃ. ৯৪

mental disease (একপ্রকার মানসিক ব্যাধি), সাবধান! All expansion is life, all contraction is death.[৬৭]

আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের হোটেলে গিয়ে স্বদেশের ছুঁৎমার্গের আরেকটি রূপ তিনি দেখতে পান। সেখানেও কালা আদমির সঙ্গে খেলে শ্বেতাঙ্গদের জাত্যাভিমানে আঘাত লাগে। এই অবস্থা দেখে বিবেকানন্দ এক জায়গায় শ্লেষ করে বলেছেন, 'তখন মার্কিন মুলুককে অনেকটা দেশের মতো ভাল লাগতে লাগলো'।[৬৮]

বৌদ্ধযুগে ভারতের যে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়েছিল এবং যেভাবে ভারতের বাণী পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল, বিবেকানন্দের ইতিহাস চেতনায় তা সম্যকভাবে ধরা দিয়েছে। বৌদ্ধযুগে চন্দ্রগুপ্ত, অশোক-প্রমুখ ভারতীয় সম্রাটগণের গৌরবময় ঐতিহ্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> বৌদ্ধযুগের একচ্ছত্র পৃথিবীপতি সম্রাটগণের ন্যায় ভারতের গৌরববৃদ্ধিকারী রাজগণ আর কখনও ভারত-সিংহাসনে আরূঢ় হন নাই।[৬৯]

আবার এই বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ভারতবর্ষীয় সমাজজীবন কতদূর উন্নত ও মহৎ হয়েছিল সে সম্বন্ধে তিনি প্রসিদ্ধ শিকাগো বক্তৃতায় বলেছেন—

> সেই সমাজ-সংস্কারের জন্য আগ্রহ, সকলের প্রতি সেই অপূর্ব সহানুভূতি ও দয়া, সর্বসাধারণের ভিতর পার্থক্যভাব ঘুচাইয়া দিয়া বৌদ্ধধর্ম সকলের ভিতর যে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল, যাহা ভারতবর্ষীয় সমাজকে এতদূর উন্নত ও মহান্ করিয়াছিল যে, কোন গ্রীসদেশীয় পুরাতত্ত্বলেখক তদানীন্তন ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিবার সময় বলিয়াছেন, কোনও হিন্দু (ভারতবাসী) মিথ্যা কথা কহে না এবং কোনও হিন্দুরমণী অসতী নহেন, বৌদ্ধধর্মের তিরোধানে হিন্দুগণ এইগুলি হারাইলেন।[৭০]

হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের বিচ্ছিন্নতা ভারতের অবনতির প্রধান কারণ বলে তিনি উক্ত বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মিলনের মধ্যেই ভারতের উন্নতি নিহিত। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি সম্পূর্ণ হতে পারে না। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের মিলন তিনি একান্তভাবে কামনা করতেন। আমেরিকা থেকে জনৈক মাদ্রাজনিবাসী বন্ধুকে লিখিত এক পত্রে বিবেকানন্দের এই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।—

> সমিতির একটা অসাম্প্রদায়িক নাম দিও—আমার মনে হচ্ছে 'প্রবুদ্ধ

[৬৭] পত্রাবলী (১ম ভাগ), পৃ. ৪৫৮-৫৯
[৬৮] পরিব্রাজক (৫ম সং), পৃ. ৩৩
[৬৯] বর্তমান ভারত (৬ষ্ঠ সং), পৃ. ৬
[৭০] শিকাগো বক্তৃতা (৮ম সং), পৃ. ৪২-৪৩

> ভারত' নামটা হলে মন্দ হয় না। ঐ নামটা দিলে তাতে হিন্দুদের মনে কোন আঘাত না দিয়ে বৌদ্ধদেরও আমাদের দিকে আকৃষ্ট করবে। 'প্রবুদ্ধ' শব্দটার ধ্বনিতেই (প্র=সঙ্গে+বুদ্ধ) 'বুদ্ধের' অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের সঙ্গে—'ভারত' জুড়লে হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সম্মিলন বোঝাতে পারে।[৭১]

এখানে বিবেকানন্দের ধর্মীয় উদারতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমি অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি।[৭২] এখানে আর বেশি আলোচনার অবকাশ নেই।

৯

মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮৬৮—১৯৩০) বিংশ শতকের প্রথম দিক্ থেকে প্রবাসী পত্রিকায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ এঁর বুদ্ধচর্চার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং 'বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ' নামক প্রবন্ধে মহেশচন্দ্রের সশ্রদ্ধ উল্লেখও করেছেন।[৭৩] এতদ্ব্যতীত আমাদের দেশে বৌদ্ধসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে চারুচন্দ্র বসু, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শরচ্চন্দ্র দাস, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, বিধুশেখর শাস্ত্রী ও শরৎকুমার রায়-প্রমুখ মনীষিগণের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত 'ধম্মপদ' (১৯০৪) প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে এক মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন (নবপর্যায় বঙ্গ-দর্শন, ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ)। বিধুশেখর শাস্ত্রী ও শরৎকুমার রায় বহুদিন পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

এভাবে আমরা দেখতে পাই, একদিকে বাঙালি মনীষী ও সাহিত্যিকগণের বুদ্ধচর্চার ফলে আমাদের জাতীয় চিত্তে বুদ্ধমহিমা প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং অন্যদিকে ধর্মপাল-কৃপাশরণ-প্রমুখ বৌদ্ধ সাধকগণের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্মের প্রতি নূতন আগ্রহের সঞ্চার হয়। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে এই নবজাগ্রত ঔৎসুক্য ও উদ্দীপনা রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধমানস গঠনে বিশেষ সহায়তা করেছে। রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি আলোচনাপ্রসঙ্গে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

---

[৭১] পত্রাবলী (১ম ভাগ), পৃ. ২১৬

[৭২] বিবেকানন্দ কী দৃষ্টিমে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম, ধর্মদূত, মে-জুন ১৯৬৪; বিবেকানন্দের বুদ্ধভক্তি, উদ্বোধন, বৈশাখ ১৩৭১

[৭৩] বুদ্ধদেব, পৃ. ৩৬-৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রচেতনায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি

কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ

রবীন্দ্রচেতনায় বৌদ্ধ-ধর্ম ও -সংস্কৃতির উন্মেষে সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ ও ভাবধারা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। আমাদের দেশে বৌদ্ধসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের এক সন্ধিপর্বে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। সে যুগের চিন্তাধারা স্পর্শপ্রবণ কবিচিত্তে যে সাড়া জাগাবে তা নিতান্ত স্বাভাবিক। তৎকালে আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয় তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরের যোগ ছিল নিবিড়। তা ছাড়া বৌদ্ধসংস্কৃতির অনুশীলনে রত বহু বাঙালি মনীষীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগও তিনি পেয়েছিলেন। আবার অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মবিজিত এশিয়ার প্রায় সকল দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেছেন বৌদ্ধধর্মের জীবন্ত রূপ। আর একথাও তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, সেখানকার শিল্প-সভ্যতা ও জাতীয় জীবন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণরসেই পুষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণের মূলে এসকল ঘটনা উপেক্ষণীয় নয়।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

অল্পবয়সেই রবীন্দ্রনাথ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্পর্শে আসেন। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের জীবনে রাজেন্দ্রলালের প্রভাব অপরিসীম। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি রাজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে বলেছেন—

> এ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারও নহে।

রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণের মূলে রাজেন্দ্রলালের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি। তিনি যেসকল বৌদ্ধকাহিনী নিয়ে গাথাকবিতা ও নাটকাদি রচনা করেছেন সে কাহিনীগুলি রাজেন্দ্রলালের The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। বাংলাসাহিত্যের

ইতিবৃত্তকার সুকুমার সেন মহাশয় বলেছেন—

> বৌদ্ধসাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের প্রকৃত শিষ্য বলতে যদি কেউ থাকেন তো রবীন্দ্রনাথ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো রাজেন্দ্রলাল-দীক্ষিত শিষ্য বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে ভালো গবেষণা করেছেন জানি। কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থে যে সাহিত্যরস আছে তার নিষ্কর্ষ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ করতে পারেন নি, না এদেশে, না বিদেশে। সুতরাং 'রাজা', 'অচলায়তন' ও 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'র জন্যে আমাদের কৃতজ্ঞতার কিঞ্চিৎ অংশ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রাপ্য।[১]

পারিবারিক পরিবেশ

রবীন্দ্রনাথের আপন পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যেও বৌদ্ধসংস্কৃতির চর্চা ছিল। একদিক্ থেকে রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বেই ঠাকুর পরিবার বৌদ্ধ ভাবাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয়। ১৮৫৯ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সিংহল গমন করেন। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও পুত্রপ্রতিম কেশবচন্দ্র। এই সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য ও পরস্পর আলোচনার ফলে তাঁদের মধ্যে যে ঔৎসুক্য জাগ্রত হয় তার ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। সিংহল থেকে তাঁরা বৌদ্ধধর্মের জীবন্ত আদর্শ নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বস্তুত তখন থেকে বাংলাদেশে নূতন করে বুদ্ধচেতনার সঞ্চার হয়।

ঠাকুর পরিবারে বৌদ্ধধর্ম চর্চার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আর্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত' (১৮৯৯) এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম্ম' (১৯০১) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যায়। সত্যেন্দ্রনাথের 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থটি নানা দিক্ থেকে বাংলা-সাহিত্যে একটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। এই গ্রন্থে পালিশাস্ত্রোক্ত থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্বগুলি সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হয়েছে। পিতার সঙ্গে সিংহলে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের যে আদর্শ প্রত্যক্ষ করেছিলেন এই গ্রন্থ রচনার পশ্চাতে সেই প্রভাব জাগ্রত ছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, সিংহল থেকে আসার অত্যল্পকাল পরে তিনি ইংলন্ডে গিয়ে (মার্চ ১৮৬২) প্রসিদ্ধ ভারত-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ম্যাক্‌স্‌মূলরের সংস্পর্শে আসেন।[২] কাজেই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি তথা বৌদ্ধধর্মের প্রতি যে তিনি আকৃষ্ট হবেন তা নিতান্ত স্বাভাবিক। যা হক, রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধমানস গঠনে তাঁর এই পারিবারিক-পরিবেশের প্রভাব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

---

[১] সুকুমার সেন, 'পরিজন-পরিবেশে রবীন্দ্র-বিকাশ', পৃ. ৩৪-৩৫

[২] প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ধম্মপদ-পরিচয়', পৃ. ৪৩

লাইট অব এশিয়া'

আমাদের দেশে বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ ঔৎসুক্য সঞ্চারে ইংরেজ কবি এডুইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' (১৮৭৯) কাব্যগ্রন্থের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। ইতিপূর্বে ম্যাক্স্মূলর, ওল্ডেনবার্গ, রিস্ ডেভিড্স্-প্রমুখ মনীষিগণ বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে যে গবেষণা করেছেন তা শিক্ষিত পণ্ডিতসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' গ্রন্থের কাব্যিক সুষমা ও মানবিক আবেদন ইংরেজিশিক্ষিত রসজ্ঞজনের হৃদয় জয় করে নিল। এই গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথকেও যে মুগ্ধ করবে তাতে আর বিচিত্র কি। তিনি বুদ্ধগয়ায় যাবার সময়ও এই গ্রন্থ সঙ্গে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনায়ও এই গ্রন্থের প্রভাব দেখা যায়। 'কল্পনা' কাব্যের অন্তর্গত 'বিদায়' কবিতাটি 'লাইট অব এশিয়া'য় বর্ণিত সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের চিত্র অবলম্বনে রচিত। এই সুন্দর কবিতাটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা গেল।—

এবার চলিনু তবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে। . . .
তুমি ঘুমাইছ নিমীলনয়নে,
কাঁপিয়া উঠিছ বিরহস্বপনে,
প্রভাতে জাগিয়া শূন্য শয়নে
কাঁদিয়া চাহিয়া রবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

অরুণ তোমার তরুণ অধর,
করুণ তোমার আঁখি,
অমিয়রচন সোহাগবচন
অনেক রয়েছে বাকি।
পাখি উড়ে যাবে সাগরের পার,
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার—
মহাকাশ হতে ওই বারে বার
আমারে ডাকিছে সবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

আর্নল্ডের কাব্যগ্রন্থ তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয় মনে যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেবচরিত' নাটক ও নবীনচন্দ্রের 'অমিতাভ' কাব্যের মূলে রয়েছে এই গ্রন্থের প্রেরণা।

কেশবচন্দ্র ও নববিধান আন্দোলন

বাঙালির জাতীয় চেতনায় বৌদ্ধসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তথা নববিধান আন্দোলনের ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সিংহল গমন করে তিনি সেখানকার বৌদ্ধধর্মের জীবন্ত আদর্শ প্রত্যক্ষ করেন। সিংহলবাসী বৌদ্ধদের উন্নত ধর্মীয় জীবন, সমবেত প্রার্থনা প্রভৃতি কেশবচন্দ্রের তরুণ মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তিনি মহর্ষির সঙ্গে পরামর্শ করে ব্রাহ্মসমাজে বৌদ্ধদের সুন্দর রীতিনীতিসমূহ প্রবর্তনে প্রয়াসী হন। তাঁর অন্তরঙ্গ অনুচরদের নিয়ে বুদ্ধগয়ায় ধ্যান ও প্রার্থনা এবং সেখান থেকে ফিরে আসার তিন মাস পরে 'শাক্যসমাগম' (১৮৮০) অনুষ্ঠান এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এমনি ভাবে নব-বিধানের নবপ্রেরণার ফলে আমাদের জাতীয় চেতনায় বৌদ্ধভাবধারা ও বুদ্ধ-চর্চার প্রতি অধিকতর আগ্রহ সঞ্চার হয়। কেশবচন্দ্রের নির্দেশে রচিত সাধু অঘোরনাথের 'শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' (১৮৮২) নববিধানের সমন্বয়-সাহিত্যমালার প্রথম গ্রন্থ। আবার বাংলাসাহিত্যে বুদ্ধদেবের জীবন ও ধর্মমত আলোচনার দিক্ থেকেও 'শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। সাধু অঘোরনাথ যে বুদ্ধচর্চার সূচনা করেন পরবর্তী কালে নববিধানমণ্ডলীর অনেকেই সে ধারা অনুসরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কালীশঙ্কর দাস, কৃষ্ণবিহারী সেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও বিনয়েন্দ্রনাথ সেন-প্রমুখ মনীষিবৃন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। নববিধানমণ্ডলীর এই বুদ্ধচর্চা রবীন্দ্রনাথের অগোচর থাকবার কথা নয়।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তথা ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠতার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এই সূত্রে কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারীও দীর্ঘকাল ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৬৫ সালে 'নব-নাটক' রচনার সময়েও তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ১৮৮২ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সভাপতিত্বে 'সারস্বত-সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হলে তার যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হন কৃষ্ণবিহারী ও রবীন্দ্রনাথ। আবার ১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় ও দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশিত হলেও তার অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন

কৃষ্ণবিহারী। 'সাধনা'র প্রথম বর্ষ থেকেই কৃষ্ণবিহারীর 'বুদ্ধচরিত' ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়।[৩] কাজেই কৃষ্ণবিহারীর প্রসিদ্ধ 'অশোকচরিত' (১৮৯২) গ্রন্থখানিও যে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অনাগারিক ধর্মপাল

বাঙালি মনস্বীদের আন্তরিক প্রয়াসের ফলে আমাদের দেশে যখন বুদ্ধচেতনার সঞ্চার হয় সেই সময়ে সিংহলী মনীষী অনাগারিক ধর্মপালের আবির্ভাব ঘটে। ১৮৯১ সালে ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবনের বাণী নিয়ে বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় আগমন করেন। সেই সময়ে তিনি সহজেই শিক্ষিত বাঙালিমনের আনুকূল্যলাভে সমর্থ হয়েছিলেন। এই সহায়তা নিয়ে তিনি কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটি (১৮৯১) প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর এর মুখপত্ররূপে মহাবোধি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৯৩ সালে তরুণ ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধিরূপে শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করে বিশ্বের সম্মুখে বৌদ্ধধর্মের বাণীকে আবার সগৌরবে তুলে ধরলেন। শিকাগো থাকাকালীন ধর্মপালের সঙ্গে বিবেকানন্দের পরিচয় একটি স্মরণীয় ঘটনা। এর ফলে প্রাচ্যের এই দুই তরুণ ধর্মনেতা আজীবন এক প্রগাঢ় প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হন। বিবেকানন্দ ও ধর্মপালকে একত্রে উল্লেখ করে ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> বিবেকানন্দ বিলাতে যদি বেদান্ত প্রচার করেন এবং ধর্মপাল যদি সেখানে ইংরেজ বৌদ্ধসম্প্রদায় স্থাপন করেন, তাহাতে য়ুরোপের গায়ে বাজে না।...পূর্বদেশে তাহার বিপরীত। প্রাচ্যসভ্যতার কলেবর ধর্ম।[৪]

শিকাগো থেকে কলকাতায় ফিরে এসে ধর্মপাল আবার আপন ব্রতে আত্মনিয়োগ করলেন। এই সময়ে তিনি অক্লান্ত প্রয়াসের দ্বারা বাংলার নবজাগ্রত বুদ্ধচেতনায় নূতন প্রেরণা সংযোগ করেন। তখন থেকে আমাদের দেশে বৈশাখীপূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব পালনের রীতিও সুপ্রচলিত হয়। বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি' ও 'সকল কলুষতামস হর' গান দুটি বাংলাদেশে বিশেষ পরিচিত। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে বুদ্ধদেবের মৈত্রী-করুণার বাণী পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কবির আন্তরিক আকুতি এর সুরে অনুরণিত হয়েছে। বুদ্ধবাণীর উদ্গাতা ধর্মপালের আদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম অনুরাগ এর থেকে সহজে অনুমান করা যায়।

---

[৩] ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ পৃ. ৬৯-৭০

[৪] *সমাজভেদ, 'ভারতবর্ষ'*

কলকাতার ধর্মরাজিক চৈত্যবিহার (১৯২০) ও সারনাথের মূলগন্ধকুটি বিহার (১৯৩১) ধর্মপালের অমর কীর্তির সাক্ষ্য বহন করে। ১৩৪২ সালের ৪ জ্যৈষ্ঠ ধর্মপালের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বৈশাখীপূর্ণিমা উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। এই ভাষণের শুরুতেই তিনি বুদ্ধদেবকে জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই প্রসঙ্গে সারনাথের মূলগন্ধকুটি বিহারের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসব উপলক্ষে রচিত কবিতাটিও উল্লেখযোগ্য। এই কবিতাতেও আমাদের জাতীয় জীবনে বুদ্ধের আদর্শ উদ্‌বোধনে কবির আন্তরিক অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে।—

ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি।
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ-আবরণ—
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।[৫]

ধর্মপালের আদর্শের সহায়ক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আরেকজনের নাম করা যায়। ইনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের রচিত সুশ্বেতা, ঘুম-গুম্ফায়, বুদ্ধপূর্ণিমা ও বুদ্ধবরণ কবিতা উল্লেখযোগ্য। কলকাতার ধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে অনাগারিক ধর্মপাল কর্তৃক বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ স্থাপন উপলক্ষে রচিত 'বুদ্ধবরণ' কবিতাটিতে বাংলাদেশের তৎকালীন বুদ্ধ-প্রীতির প্রতিফলন দেখা যায়।—

বঙ্গে এল বুদ্ধ-বিভা, কিন্তু সে নাই বেঁচে,
নগর পুণ্ড্রবর্ধনও নেই—স্বপ্ন হয়ে গেছে!
নেই বালিকা উপাসিকা; আমরা তারই হয়ে
বরণ করি বুদ্ধ-বিভা চিত্ত-প্রদীপ লয়ে;
চৈত্য দিয়ে যত্নে ঘিরি বুদ্ধ-বিভূতিরে,
নিরঞ্জনা-তীরের স্মৃতি ভাগীরথীর তীরে![৬]

সেদিন যথার্থই বাঙালি চিত্ত-প্রদীপ জ্বালিয়ে বুদ্ধ-বিভাকে আবার সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিল।

---

[৫] বুদ্ধদেবের প্রতি, 'পরিশেষ'
[৬] বুদ্ধবরণ, 'বেলাশেষের গান'

ওকাকুরা

১৯০০ সালের শেষের দিকে নবজাগ্রত জাপানের আদর্শবাদী তরুণ শিল্পশাস্ত্রী ওকাকুরা ভারতে আগমন করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল আমেরিকার শিকাগো ধর্মসম্মেলনের ন্যায় টোকিও নগরীতে একটি ধর্মমহাসভা আহ্বান করবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানে নিয়ে যাবার জন্য কলকাতায় আসেন এবং কিছুকাল বেলুড়ে অবস্থান করেন। বিবেকানন্দ ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ওকাকুরার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেন নি। এই সময়ে ওকাকুরা ভগিনী নিবেদিতার সহিত পরিচিত হন। ১৯০২ সালে আবার নিবেদিতার মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওকাকুরার পরিচয় হয়। জাপানের নূতন চিন্তাজাগরণের যুগে আদর্শবাদী ওকাকুরা এক অখণ্ড এশিয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর Ideals of the East গ্রন্থের প্রথম কথা হল Asia is one—অর্থাৎ আদর্শের দিক্ থেকে সমগ্র এশিয়া একসূত্রে বাঁধা। চীনের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি ওকাকুরার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। ভারতের সঙ্গে পূর্ব-এশিয়ার বিস্মৃত আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি বহু প্রয়াস করেছেন। এই প্রসঙ্গে হোরি সানকে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রেরণ স্মরণীয়। তা ছাড়া টাইক্কান ও হিসিদা নামক জাপানি শিল্পিদ্বয়কে তিনি ভারতীয় শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করার জন্য কলকাতায় প্রেরণ করেন। ওকাকুরার অখণ্ড এশিয়ার আদর্শ রবীন্দ্রনাথের চিত্তে যে সাড়া জাগাবে তা খুবই স্বাভাবিক। বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে একদিন চীন ও জাপানের সঙ্গে ভারতের যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ সেকথা কোন দিন বিস্মৃত হন নি। ১৯১১ সালে ওকাকুরা শেষবারের মত কলকাতায় আসেন। এই সময়ে অবনীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে ভারতীয় চিত্রকরদের নূতন শিল্পরীতিতে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। ১৯১২ সালে আমেরিকায় ওকাকুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শেষ সাক্ষাৎ; পর বৎসর জাপানে তাঁর মৃত্যু হয়। কবি প্রথমবার (১৯১৬) জাপানে গিয়ে ওকাকুরার বাড়িতে ছিলেন। সেই সময়ে তিনি গভীর বেদনায় উপলব্ধি করেছিলেন যে, জাপানিরা ওকাকুরাকে সম্যকভাবে চিনতে পারেন নি।[৭]

বুদ্ধগয়ায়

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনেই যেমন বুদ্ধদেবের মহত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তেমনি বুদ্ধদেবের স্মৃতিবিজড়িত বুদ্ধগয়া ও সারনাথ প্রভৃতি

[৭] রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড (৩য় সং), পৃ. ৪৫৮-৬০

তীর্থ সম্বন্ধেও তাঁর মনে এক গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মে। 'সমালোচনা' (১৮৮৮) গ্রন্থের একস্থানে তিনি বলেছেন—

> আমি একজন বুদ্ধের ভক্ত। বুদ্ধের অস্তিত্বের বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যখন সেই তীর্থে যাই, যেখানে বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত আছে, সেই শিলা দেখি যাহার উপরে বুদ্ধের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে, তখন আমি বুদ্ধকে কতখানি প্রাপ্ত হই![৮]

রবীন্দ্রনাথ জীবনে অন্তত দুবার বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন। তিনি হয়তো সারনাথেও গিয়ে থাকবেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার বুদ্ধগয়ায় গমন করেন ১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন সস্ত্রীক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, স্বামী সদানন্দ, স্বামী শঙ্করানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা ও আচার্য যদুনাথ সরকার প্রভৃতি। গিরিডি হতে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র মধুপুরে এসে মিলিত হন। এবারে তাঁরা এক সপ্তাহ বুদ্ধগয়ায় ছিলেন। এই সময়ে তাঁরা প্রতিদিন এডুইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' এবং ওয়ারেনের বৌদ্ধধর্ম-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু অংশ পাঠ করতেন। এই সময়কার একটি ঘটনা রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর রেখাপাত করে। ফুজি নামে জাপানের এক মৎস্যব্যবসায়ী তখন বোধি-দ্রুমতলে ধ্যানরত ছিল।[৯] ধ্যানের আলোকে এই অখ্যাতনামা সাধারণ মানুষটিও রবীন্দ্রদৃষ্টিতে এক অসাধারণ মহিমায় প্রকাশ পেয়েছে। শেষ জীবনেও রবীন্দ্রনাথ এর কথা ভোলেন নি। বহুকাল পরে তিনি কলকাতার ধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বৈশাখীপূর্ণিমা তিথিতে (১৯৩৫) ভাষণদান উপলক্ষে এই দরিদ্র মৎস্যজীবীর উল্লেখ করেছেন।—

> দেখলুম, দূরে জাপান থেকে সমুদ্র পার হয়ে একজন দরিদ্র মৎস্যজীবী এসেছে কোনো দুষ্কৃতির অনুশোচনা করতে। সায়াহ্ন উত্তীর্ণ হল নির্জন নিঃশব্দ মধ্যরাত্রিতে, সে একাগ্রমনে করজোড়ে আবৃত্তি করতে লাগল : আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। কত শত শতাব্দী হয়ে গেছে, একদা শাক্যরাজপুত্র গভীর রাত্রে মানুষের দুঃখ দূর করবার সাধনায় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়েছিলেন; আর সেদিনকার সেই মধ্যরাত্রে জাপান থেকে এল তীর্থযাত্রী গভীর দুঃখে তাঁরই শরণ কামনা করে। সেদিন তিনি ঐ পাপপরিতপ্তের কাছে পৃথিবীর সকল প্রত্যক্ষ বস্তুর চেয়ে প্রত্যক্ষতম, অন্তরতম।[১০]

---

[৮] অনাবশ্যক, 'সমালোচনা'
[৯] রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড (৩য় সং), পৃ. ১০৯
[১০] বুদ্ধদেব, পৃ. ২-৩

রবীন্দ্রনাথের পরম অনুরাগী শান্তিনিকেতনের প্রবীণ শিক্ষক গোঁসাইজির নিকট শুনেছি, এবার বুদ্ধগয়া থেকে আসার পর রবীন্দ্রনাথ মস্তকমুণ্ডন করেছিলেন। তখন কবির মনে নাকি এক বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়েছিল।

১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথ আরেকবার বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন। এই যাত্রায় কবির সঙ্গে ছিলেন কন্যা মীরা ও জামাতা নগেন্দ্রনাথ। এবার বুদ্ধগয়ায় থাকাকালীন কবি মাত্র তিন দিনের মধ্যে (২৩ আশ্বিন—২৫ আশ্বিন, ১৩২১) গীতালির অন্তর্গত দশটি গান রচনা করেন। এই সময়ে রচিত—

সন্ধ্যাতারা যে ফুল দিল
তোমার চরণ-তলে
তারে আমি ধুয়ে দিলেম
আমার নয়ন-জলে।[১১]

কিংবা—

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার।
আজি প্রাতে সূর্য উঠা
সফল হল কার।...
বহুযুগের উপহারে
বরণ করি নিল কারে
কার জীবনে প্রভাত আজি
ঘোচায় অন্ধকার।[১২]

এই গানের পশ্চাতে বুদ্ধদেবের স্মৃতি থাকা বিচিত্র নয়। তা ছাড়া এবার বুদ্ধগয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সে প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনির উক্তি স্মরণীয়।—

> Only once in his life, said Rabindranath, did he feel like prostrating himself before an image, and that was when he saw the Buddha at Gaya.[১৩]

—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, তাঁর জীবনে একবার মাত্রই মূর্তির সম্মুখে প্রণাম নিবেদনের প্রেরণা জেগেছিল: তাঁর এই ভাব জাগে গয়াতে বুদ্ধমূর্তি দর্শন করে।

রবীন্দ্রনাথ যে সামাজিক পরিবেশে বর্ধিত হয়েছেন সেখানে মূর্তিপ্রণাম

---

[১১] গীতালি, ৮৯ সংখ্যক কবিতা
[১২] গীতালি, ৯০ সংখ্যক কবিতা
[১৩] Visva-Bharati Quarterly, April 1943, p. 179

বিধিসম্মত নয়। কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির ফলে তিনি এখানে সমাজের চিরাচরিত রীতিকে অতিক্রম করে আপন ভক্তহৃদয়ের চরিতার্থতা সাধন করেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য কর্মের মধ্যেও বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০৪ সালে চারুচন্দ্র বসু মহাশয়ের সম্পাদনায় বাংলা অনুবাদসহ ধম্মপদ প্রকাশিত হয়। শুধু বাংলায় নয়, আধুনিক ভারতীয় ভাষার মধ্যেও এটিই ধম্মপদের প্রথম অনুবাদ। চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত ধম্মপদ গ্রন্থটি আরো একদিক্ থেকে স্মরণীয়। এই গ্রন্থ প্রকাশের কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে (১৩১২ জ্যৈষ্ঠ) এর সমালোচনা করতে গিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন। তা ছাড়া তিনি উক্ত ধম্মপদের প্রথম সংস্করণের মারজিনে পালি শ্লোকের পাশে পাশে বাংলা পদ্যানুবাদ করেন। তবে অনুবাদ সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। পরে উক্ত অসমাপ্ত অনুবাদ বিশ্বভারতী পত্রিকায় (সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন যে, ধম্মপদের মধ্যে ভারতবর্ষের চিরন্তন বাণীই প্রকাশ পেয়েছে।—

> গীতার উপদেষ্টা ভারতের চিন্তাকে যেমন একটি সংহত মূর্তি দান করিয়াছেন, ধর্মপদ গ্রন্থেও ভারতবর্ষের চিত্তের একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত হইয়াছে।[১৪]

কিন্তু একসময়ে ধম্মপদের কথা আমাদের দেশের মন থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল। শুধু ধম্মপদ কেন, সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধেও এর অন্যথা হয় নি। অথচ একদিন বৌদ্ধসংস্কৃতির মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ সমগ্র বিশ্বে আপন অন্তরের সত্যস্বরূপ বিকীর্ণ করেছে। তাই বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রতি আমাদের দেশের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> এই ইতিহাসের (ভারতীয় সংস্কৃতির) বহুতর উপকরণ যে বৌদ্ধ-শাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে বহুদিন-অনাদৃত এই বৌদ্ধশাস্ত্র য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—আমরা তাঁহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লজ্জার কারণ।...সমস্ত দেশে পাঁচজন লোকও কি বৌদ্ধ-শাস্ত্র উদ্ধার করাকে চিরজীবনের ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না?

[১৪] ধম্মপদং, 'প্রাচীন সাহিত্য'

এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে, এ কথা মনে করিয়াও কি দেশের জন-কয়েক তরুণ যুবার উৎসাহ এই পথে ধাবিত হইবে না?[১৫]

কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধার করার জন্য রবীন্দ্রনাথ শুধু আমাদের দেশের যুবমনের নিকট আবেদন জানিয়ে ক্ষান্ত হন নি. তিনি নিজেও এর সার্থক রূপায়ণে ব্রতী হয়েছিলেন। এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বিশ্বভারতী। বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিক্ থেকে বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চার শুরু হয়। কালক্রমে দেশ-বিদেশের বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের আগমনে বিশ্বভারতী আমাদের দেশে বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯০৬ সালে কাশী থেকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় শান্তিনিকেতনে আসেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তিনি পালিভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষায় ব্রতী হন। এই যুগে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে রথীন্দ্রনাথপ্রমুখ ছাত্রদের বৌদ্ধশাস্ত্র-অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। পালি শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে বিধুশেখর শাস্ত্রী 'পালি প্রকাশ' (১৯১১) নামক প্রসিদ্ধ পালি ব্যাকরণখানি রচনা করেন। এই সময়ে রথীন্দ্রনাথকে ধম্মপদ গ্রন্থখানি আগাগোড়া মুখস্থ করতে হয়। তা ছাড়া নবাগত অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে রথীন্দ্রনাথ অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' কাব্য বাংলায় অনুবাদ করেন (১৯০৬)।[১৬] এর পশ্চাতেও যে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা ছিল সেকথা অনুমান করা কঠিন নয়। বিধুশেখর শাস্ত্রীকে নিয়ে যে বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চার সূত্রপাত হয় কালক্রমে তারই পরিণতিতে শান্তিনিকেতনে চীনভবনের সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে যেমন বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চার কেন্দ্র স্থাপন করেছেন ও বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে এনেছেন তেমনি তিনি নিজে সদলে বৌদ্ধধর্মবিজিত দেশসমূহ পরিভ্রমণ করেছেন। একদিন বুদ্ধের ভারতবর্ষ ত্যাগ-মৈত্রীর বাণীতে আপন সত্যস্বরূপ প্রকাশ করেছে চীন-জাপান, সিংহল-ব্রহ্ম, জাভা-শ্যাম প্রভৃতি দেশে। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের এই পর্যটনের মূলেও রয়েছে ভারতের সেই চিরন্তন বিশ্বমৈত্রীর বাণীকে জয়যুক্ত করার সাধনা। প্রকৃতপক্ষে এদিক্ থেকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালে বুদ্ধের ভারতের সার্থকতম প্রতিনিধি। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের এই এশিয়া-পরিক্রমা ভারতের সঙ্গে এশিয়ার লুপ্ত সম্বন্ধ পুনরুদ্ধারে যে বিশেষ সহায়তা করেছে সেকথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।[১৭]

---

[১৫] ধম্মপদং, 'প্রাচীন সাহিত্য'

[১৬] রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড (৩য় সং), পৃ. ১৫১

[১৭] সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, বৌদ্ধধর্মবিজিত দেশসমূহে রবীন্দ্রনাথ, নালন্দা, কার্তিক ১৩৭৩

ব্রহ্মদেশে

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপানযাত্রার পথে ব্রহ্মদেশের প্রধান নগরী রেঙ্গুনে গমন করেন। এশিয়ার বৌদ্ধধর্ম-অধ্যুষিত স্থানসমূহের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মদেশে গমনই প্রথম। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন ও মুকুল দে। রেঙ্গুনে পৌঁছানর পরের দিন ২৫শে বৈশাখ জন্মদিনের শুভপ্রভাতে কবি সবান্ধব ব্রহ্মের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দির শোয়েডেগন প্যাগোডা দর্শন করেন। এই মন্দিরের মধ্যেই কবি ব্রহ্মের সত্যকারের নিজস্ব রূপ দেখতে পেলেন।—

> এতক্ষণে একটা-কিছু দেখতে পেলুম। এতক্ষণ যার মধ্যে ছিলুম সে একটা অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌শন, সে একটা অবিচ্ছিন্ন পদার্থ। সে একটা শহর, কিন্তু কোনো-একটা শহরই নয়। এখন যা দেখছি তার নিজেরই একটা বিশেষ চেহারা আছে। তাই সমস্ত মন খুশি হয়ে সজাগ হয়ে উঠল। আধুনিক বাঙালির ঘরে মাঝে মাঝে খুব ফ্যাসানওয়ালা মেয়ে দেখতে পাই।...দেখে মস্ত একটা অভাব মনে বাজে; মনে হয় ফ্যাশানটাকেই বড়ো করে দেখছি, বাঙালির মেয়েটিকে নয়; এমন সময় হঠাৎ ফ্যাশান-জালমুক্ত সরল সুন্দর স্নিগ্ধ বাঙালি-ঘরের কল্যাণীকে দেখলে তখনই বুঝতে পারি, এ তো মরীচিকা নয়, স্বচ্ছ গভীর সরোবরের মতো এর মধ্যে একটি তৃষাহরণ পূর্ণতা আপন পদ্মবনের পাড়টি নিয়ে টলটল করছে। মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেই আমার মনে তেমনি একটি আনন্দের চমক লাগল; মনে হল, যাই হোক-না কেন, এটা ফাঁকা নয়, যেটুকু চোখে পড়ছে এ তার চেয়ে আরো অনেক বেশি। সমস্ত রেঙ্গুন শহরটা এর কাছে ছোটো হয়ে গেল। বহুকালের বৃহৎ ব্রহ্মদেশ এই মন্দিরটুকুর মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করলে।[১৮]

একদা ভারতীয় সাধনার আলোকে ব্রহ্মের যে হৃদ্‌পদ্ম বিকশিত হয়েছিল এই মন্দিরের মধ্যে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তারই প্রকাশ দেখতে পেলেন। এতে স্পর্শপ্রবণ কবির অন্তর পুলকে ভরে ওঠে। তা ছাড়া ব্রহ্মদেশে এসে কবির মনে এই ভাবের উদয় হয়েছে,—"আর কোথাও না ঘুরে বেড়িয়ে (ব্রহ্মদেশের) পাড়াগাঁয়ে কোনো একটা বৌদ্ধমঠের কাছে গিয়ে চুপচাপ থাকতে পারলে বেশ আরাম পাবেন।"[১৯]

১৯২৪ সালের ২৪শে মার্চ রবীন্দ্রনাথ চীনের পথে দ্বিতীয়বার রেঙ্গুনে গমন করেন। সেদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় জুবিলী হলে কবিকে সংবর্ধনা জানানো

---

[১৮] জাপানযাত্রী—৪

[১৯] রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড (১ম সং), পৃ. ৪৫১

হয়। রেঙ্গুনের নাগরিকদের অভিনন্দনের উত্তরে কবি বলেন, "পৃথিবীর প্রত্যেক বড় জাতি পৃথিবীতে এমন কিছু একটা দেয় যার ফলে সে বিশ্বমানবের হৃদয়ে অমরতা লাভ করে। আর জগতের ইতিহাসে মৈত্রীর আদর্শই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দান। এই মহৎ আদর্শকে অবলম্বন করে একদিন ভারতীয় দূতেরা মরু-পর্বত পার হয়ে পৃথিবীর দূর-দূরান্তের জাতিসমূহকেও এক নিবিড় আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ করেছে।"[২০] এবারে কবি মাত্র তিন দিন রেঙ্গুনে অবস্থান করেন।

জাপানে

জাপানে যাওয়ার ইচ্ছা কবির অনেককালের। প্রাচ্যের এই সুন্দর দেশটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ১৯১৫ সালে প্রথম একবার তিনি জাপানযাত্রার আয়োজন করেন। কিন্তু নানা কারণে সেবার যাওয়া হয় নি। অবশেষে ১৯১৬ সালে তিনি জাপানযাত্রা করেন। ইতিপূর্বেই তিনি ওকাকুরা ও কাওয়াগুচি-প্রমুখ জাপানি সুধীবৃন্দের সান্নিধ্যে আসেন।

২৯শে মে (১৯১৬) কবি সদলে জাপানের কোবে বন্দরে অবতরণ করেন। তাঁর বহুদিনের অভীপ্সিত বাসনা এতদিনে সার্থক হল। ভারতের কবিমনীষী জাপানের বন্দরে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল সংবর্ধনা লাভ করলেন। কবি তাঁর চারদিকে কোথাও একটু ফাঁক দেখতে পেলেন না, 'খবরের কাগজের চর তাদের প্রশ্ন এবং তাদের ক্যামেরা নিয়ে' তাঁকে আচ্ছন্ন করে দিলে। একে একে পরিচিত জাপানি বন্ধুরা এলেন। বিখ্যাত চিত্রকর টাইক্কান ও কাট্‌সুটা, পরিব্রাজক কাওয়াগুচি এবং শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন জুজুৎসু শিক্ষক সানো বন্দরের ঘাটে কবিকে অভ্যর্থনা করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। সকলের মনে আনন্দের আর সীমা নেই। জাপানিদের নিকট রবীন্দ্রনাথ শুধু একজন বিদেশী বরণীয় অতিথি নন, তিনি প্রাচ্যের কবি, প্রাচ্য জাপানবাসীর আপন লোক। আপন লোককে ঘরে ফিরে পেলে যে আনন্দ হয় রবীন্দ্রনাথকে পেয়েও জাপানিদের তেমনি আনন্দ।

সপ্তাহখানেক কবি কোবেতে আছেন। ইউরোপের যন্ত্রশালায় দীক্ষিত আধুনিক জাপানের চেহারা দেখে কবি বলেছেন—

> আমার এই জানলায় বসে কোবে শহরের দিকে তাকিয়ে এই যা দেখছি এ তো লোহার জাপান, এ তো রক্তমাংসের নয়। একদিকে আমার জানলা, আর-একদিকে সমুদ্র, এর মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা শহর। চীনেরা যে-রকম বিকটমূর্তি ড্রাগন আঁকে—সেইরকম। আঁকাবাঁকা বিপুল দেহ নিয়ে সে যেন সবুজ পৃথিবীটিকে খেয়ে ফেলেছে। গায়ে গায়ে ঘেঁষা-

[২০] রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড (১ম সং), পৃ. ১২৬

ঘেঁষি লোহার চালগুলো ঠিক যেন তারই পিঠের আঁশের মতো রৌদ্রে ঝক্‌ঝক্‌ করছে। বড়ো কঠিন, বড়ো কুৎসিত—এই দরকার-নামক দৈত্যটা।...মানুষের দরকার আছে, এই কথাটাই ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে, হাঁ করতে করতে, পৃথিবীর অধিকাংশকে গ্রাস করে ফেলছে।[২১]

কিন্তু জাপানে এসে কবি শুধু বিকৃত ইউরোপকেই দেখেন নি, অনুকরণ ও আধুনিকতার আবরণ ভেদ করে জাপানের চিরন্তন সত্যস্বরূপটিও তাঁর দৃষ্টি-গোচর হয়েছে। জাপানে যে জিনিসটি কবিকে সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ করেছে সেটি হল জাপানি চরিত্রের সংযম।—

এই জাতের সর্বপ্রধান শক্তি যেটা দেখতে পেয়েছি, সেটা হচ্ছে সংযম। তাদের দেহচালনার মধ্যে আশ্চর্য একটি ধৈর্য আছে; মনের মধ্যেও তাই। বহু শতাব্দীর অভ্যাসক্রমে এরা কোনো কাজই যেমন-তেমন করে করে না; একান্ত নিবিষ্ট হয়ে ও শোভনভাবে করে, দেখে কেবলই মনে হয় কাজের সমস্ত প্রণালীর মধ্যে আগাগোড়া এরা সমস্ত মনকে স্থাপিত করতে শিখেছে। এটাই হচ্ছে কর্মের মধ্যে ধ্যান।[২২]

জাপানিরা দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কর্তব্য সুবিহিত যত্ন ও সংযতভাবে করে। এ হচ্ছে ওদের স্বজাতীয় সাধনার একটা অঙ্গ। কবি যখন জাপানিদেব সংযম ও সৌন্দর্যবোধের প্রশংসা করেন তখন ওদের কাছে শুনতে পেলেন যে, বৌদ্ধধর্মের প্রসাদেই ওরা এসকল গুণ পেয়েছে। এই বৌদ্ধধর্ম একদিন ভারতের মর্মস্থল থেকেই উৎসারিত হয়েছিল। তাই জাপানিদের কথা শুনে কবি লজ্জিত হলেন নিজেব দেশের কথা ভেবে।—

শুনে আমার লজ্জা বোধ হয়। বৌদ্ধধর্ম তো আমাদের দেশেও ছিল, কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রাকে তো এমন আশ্চর্য ও সুন্দর সামঞ্জস্যে বেঁধে তুলতে পারে নি। আমাদের কল্পনায় ও কাজে এমনতবো প্রভূত আতিশয্য, ঔদাসীন্য, উচ্ছৃঙ্খলতা কোথা থেকে এল।[২৩]

এই প্রসঙ্গে কবির মনে হয়েছে, জীবনযাত্রার রীতি যদি আমরা অসংকোচে জাপানের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারতাম 'তাহলে আমাদের ঘরদুয়ার এবং ব্যবহার শুচি হত, সুন্দর হত, সংযত হত'।[২৪]

কবি সদলে কোবে থেকে ওসাকায় এলেন। এখানে জাপানি প্রেস এসোসিয়েশনের উদ্‌যোগে এক সভায় কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এখান থেকে দুদিন পরে তিনি আবার কোবেতে ফিরে যান।

---

[২১] জাপানযাত্রী—১৩
[২২] যাপনী জাপান, 'জাপানযাত্রী' (সংযোজন)
[২৩] জাপানযাত্রী—১৪
[২৪] জাপানযাত্রী—১৪

কোবে থেকে জাপানের রাজধানী টোকিও। কবি এখানে চিত্রকর বন্ধু য়োকোয়ামা টাইক্কানের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। টোকিওতে এসেও কবি আদর-অভ্যর্থনার সাইক্লোনের মধ্যে পড়ে গেছেন। এখানে প্রথম অভিভাষণ দেন তিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে (১২ই জুন)। পরদিন বিখ্যাত উয়েনো পার্কে কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। জাপানের বিশিষ্ট নাগরিকগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসবের উদ্যোক্তা ছিলেন জেন-সম্প্রদায়ের সোতো শাখার মঠাচার্য। কানাইজি বৌদ্ধমন্দির এই সংবর্ধনা উৎসবের জন্য বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়। সংবর্ধনার উত্তরে কবি বাংলাতে ভাষণ দেন। একে জাপানিতে ভাষান্তরিত করে দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যাপক কিমুরা। তিনি তখন ছুটিতে জাপানে ছিলেন। কাউন্ট ওকুমা ও বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ তাকাকুসু ভারতীয় কবির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। ভোজসভায় বিহারের ছাত্রগণ নিজহস্তে ভারতীয় অতিথিকে পরিবেশন করে জাপানি-সৌজন্যের পরিচয় দান করেন। শিজুওকা পৌঁছাবার পর একজন জাপানি শ্রমণ অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে কবিকে সমাদর করেছিলেন, এতে তিনি জাপানের অন্তরের পরিচয় উপলব্ধি করলেন।[২৫]

জাপানে আসার পর রবীন্দ্রনাথ যেসকল বক্তৃতা করেন তাঁর মধ্যে The Nation ও The Spirit of Japan বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে কবি জাপানের উগ্র সাম্রাজ্যলিপ্সার পরিচয় পেয়েছেন। চীনের প্রতি অপমানকর শর্তাদির আরোপ ও কোরিয়ার উপর অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী স্পর্শকাতর কবিচিত্তে গভীর বেদনার সঞ্চার করে। কবি সেদিন জাপানের রণোন্মাদনা ও উগ্র জাতীয়তাবাদকে ধিক্‌কার দিয়ে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন। কিন্তু সেদিনের প্রমত্ত জাপান কবির হিতবাণীকে অন্তরে গ্রহণ করতে পারে নি। তাই জাপানে এসব বক্তৃতার যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। জাপানে আসার সময় রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জাতির বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন, কিন্তু বিদায়ের দিনে দেখা গেল জাপানিরা কবির প্রতি বিমুখ। কবিকে বিদায় দিতে জাহাজ ঘাটে কোন ভিড় নেই, একমাত্র হারা সান তাঁর অতিথিকে বিদায় দেবার জন্য উপস্থিত ছিলেন।[২৬]

দানবের স্পর্ধিত ক্রূরতাকে ধিক্‌কার দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বজ্রকণ্ঠ বারবার ধ্বনিত হয়েছে। তাই জাপানকে অন্তরের সহিত ভালবাসলেও সাম্রাজ্যবাদী জাপানের এই আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততাকে তিনি কোন দিন ক্ষমা করতে পারেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে নোগুচির সঙ্গে বিতর্কেও তিনি জাপানি

---

[২৫] রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড (৩য় সং), পৃ. ৪৫৫
[২৬] রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড (৩য় সং), পৃ. ৪৫৭

সাম্রাজ্যবাদের তীব্র নিন্দা করেন। একদিন সংবাদপত্রে কবি দেখলেন, জাপানি সৈনিক চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সাফল্য কামনায় গিয়েছে দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে পূজা দিতে। জাপানের বুদ্ধভক্তির এই প্রহসন দেখে রবীন্দ্রনাথ কঠোর ভর্ৎসনায় লিখেছেন—

যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাঙা,
কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে
বেরোল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।
বেজে উঠল তূরী ভেরি গরগর শব্দে,
কেঁপে উঠল পৃথিবী।[২৭]

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার জাপান গমন করেন। এবারে জাপানের ভয়ানক দুর্দিন। কিছুকাল পূর্বে নিদারুণ ভূমিকম্পে জাপান ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তা ছাড়া আমেরিকার সহিত জাপানের রাজনৈতিক সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ এবার যেসমস্ত বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করেন তার মধ্যে International relations অন্যতম। তিনি জাপানের প্রতি আমেরিকার ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে একথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, দুর্বল প্রতিবেশীর প্রতি জাপানও সুবিচার করে নি। তিনি জাপানের নিকট আবার নেশন নামক অপদেবতার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে জাপান আপন সত্যস্বরূপকে উপলব্ধি করুক, এই ছিল কবির কামনা।

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের চীন-জাপান ভ্রমণের ফল আরেক দিক্ থেকে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। তিনি দেশে ফিরে আসার মাত্র চার মাস পরেই সেই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে শাংহাইতে এশিয়াটিক এসোসিয়েশন গঠিত হয়।[২৮] এর মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে কবি যে মিলন-সূত্র আবিষ্কারের বাসনা পোষণ করতেন এই সমিতি প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিল তাই। এই প্রসঙ্গে টোকিওতে প্রতিষ্ঠিত টেগোর সোসাইটিরও উল্লেখ করা যেতে পারে। বস্তুত আধুনিক কালে পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগস্থাপনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অপরিসীম।

[২৭] 'পত্রপুট', ১৭ সংখ্যক কবিতা (১৯৩৭)
[২৮] রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড (১ম সং), পৃ. ১৩৯

রবীন্দ্রনাথ শেষবার জাপান গমন করেন ১৯২৯ সালে। এবারে তিনি জাপানে একমাস অতিবাহিত করেন এবং বিভিন্ন সংবর্ধনাসভায় বক্তৃতা দেন। এ ছাড়া দেশে ফিরে আসার পর কবি 'ধ্যানী জাপান' (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৬) নামে এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লেখেন। জাপানের অন্তরের সম্পদ কি এবং সত্যকারের মহত্ত্ব কোথায়, এই প্রবন্ধে কবি তার উপর সুন্দর আলোকপাত করেন। একদিন বৌদ্ধধর্মের যোগে জাপানে ধ্যানের প্রচার হয়েছিল। জাপানের একটি প্রধান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের নাম 'জেন' বা ধ্যান। জাপানিদের জীবনযাত্রায় এই ধ্যানের প্রভাব রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন। তাদের আহারে-বিহারে অনুষ্ঠানে সর্বত্রই একটা 'দেহমনের ধ্যানসিদ্ধ সংযমের' পরিচয় পাওয়া যায়। ওদের সৌন্দর্যচর্চাতেও রয়েছে অবিচলিত মনের ধ্যানের পরিচয়। একদিন কবি য়োকোহামার এক বিখ্যাত চিত্রকরের বাড়িতে গিয়ে দেখেন, তাঁর ঘরের পাশে বেদীতে একটি বুদ্ধমূর্তি। কবি শুনলেন যে, বুদ্ধের সামনে বসে ধ্যান করে তবে তিনি ছবি আঁকেন। এই 'ধ্যানের দ্বারা চিত্রকরের রচনাশক্তির জড়তা ঘোচে, চিত্তের উদ্যম সম্পূর্ণ জাগ্রত হয়ে ওঠে।' জাপানি চরিত্রের মধ্যে শক্তি ও সৌন্দর্যবোধের ঐকান্তিক মিল দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছেন। এই প্রবন্ধে তিনি ধ্যানী জাপানকে অন্তরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

ধর্মাধার মহাস্থবির ও গোঁসাইজি

ইতিপূর্বেই শান্তিনিকেতনে বৌদ্ধশাস্ত্র-চর্চার সূত্রপাত হয়েছে। ১৯১৯ সালে বিশ্বভারতীর কার্যারম্ভের পর আসেন সিংহলের বৌদ্ধভিক্ষু ধর্মাধার মহাস্থবির। তিনি বৌদ্ধদর্শনের দুরূহ তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করেন। একে ত বৌদ্ধদর্শনের কঠিন বিষয়, তদুপরি মহাস্থবিরের ভাষার জন্যও এই আলোচনা বেশি দিন চলতে পারে নি। এতদ্‌সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ গভীর নিষ্ঠা-সহকারে শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধদর্শনের দুরূহ তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন—

> মহাস্থবিরের বক্তৃতায় প্রথম প্রথম আমরা সকলেই যাইতাম কিন্তু দিন যতই যায়, শ্রোতার সংখ্যা ততই হ্রাস পায়। কারণ প্রথমত বিষয় কঠিন—বৌদ্ধদর্শন, দ্বিতীয়ত তিনি যে ভাষায় উপদেশ দিতেন তাহা না-হিন্দী, না-বাংলা, না-পালি, না-সিংহলী এক মিশ্রিত ভাষা। ইহার উপর মেয়েরা যেদিকে বসিতেন সেইদিকে পাখার আড়াল করিয়া কথা বলেন। মোটকথা, এই বক্তৃতা শুনিবার উৎসাহ প্রায় সকলেরই নিবিয়া আসিল। শেষ পর্যন্ত দেখিলাম শ্রোতাদের মধ্যে দুইজন টিঁকিয়া

আছেন—একজন বিধুশেখর, অপর জন রবীন্দ্রনাথ। কবি নিশ্চল হইয়া ধর্মগুরুর জটিল তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।[২১]

মহাস্থবিরের ভাষা বৌদ্ধদর্শন-শিক্ষার পক্ষে যে অন্তরায় ছিল রবীন্দ্রনাথ সেকথা উপলব্ধি করেছিলেন। মনে হয় সেজন্যই তিনি পরবর্তী কালে অধ্যাপক নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীকে বৌদ্ধদর্শনে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য সিংহলে প্রেরণ করেছিলেন। গোঁসাইজি সিংহলের প্রসিদ্ধ বিদ্যোদয় পরিবেণে দুই বৎসরকাল বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর তিনি ব্রহ্মদেশে গিয়েও কিছুকাল বৌদ্ধদর্শন শিক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যেসকল মনীষী বিশ্বভারতীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছেন গোঁসাইজি তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। ভারতীয় সংস্কৃতি দর্শন ইতিহাস ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি শান্তিনিকেতনে 'চলমান বিশ্বকোষ' নামে পরিচিত।

সিলভ্যাঁ লেভি ও লিন ও-চিয়াং

১৯২১ সালে বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ সিলভ্যাঁ লেভি (১৮৬৩-১৯৩৫) সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন। তিনি বিশ্বভারতীর প্রথম অতিথি অধ্যাপক। কবির আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য যেসকল বিদেশী মনীষী বিশ্বভারতীর কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন আচার্য লেভি তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। বস্তুত পরবর্তী কালে বিশ্বভারতীর চীনভবন-প্রতিষ্ঠা ও বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে গবেষণার পথ সুগম করে যান আচার্য লেভিই। ইনি ছিলেন ভারতীয় ভাষা ও ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ; তা ছাড়া চীনা ও তিব্বতী ভাষাতেও সুপণ্ডিত। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতের সহিত পূর্ব এশিয়ার যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল তাকে জানতে হলে চীনা ও তিব্বতী ভাষার চর্চা অপরিহার্য। বৌদ্ধধর্মের যে অমূল্য সম্পদ চীনা ও তিব্বতী ভাষাতে রক্ষিত হয়েছে তার অনেক কিছুই পালি কিংবা অন্য ভারতীয় ভাষায় নেই। বিধুশেখর-প্রমুখ ব্যক্তিগণ আচার্য লেভির নিকট চীনা ও তিব্বতী ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন। এর পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আসেন অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী। আগামীকালের বিশ্ববিশ্রুত চীনাভাষাবিদ্ ও বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ উপাচার্য প্রবোধচন্দ্রের দীক্ষা হল শান্তিনিকেতনেই।

আলোচ্য সময়ে বিশ্বভারতীর আর্থিক অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিল না। এই অনটনের মধ্যেও তিব্বতী বৌদ্ধগ্রন্থ তাঞ্জুর ও কাঞ্জুর ক্রয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ

[২১] রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড (১ম সং), পৃ. ২০

পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করেন।[৩০] বিশ্বভারতীতে চীনা ও তিব্বতী ভাষার চর্চা অব্যাহতগতিতে চলতে থাকে।

১৯২২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আচার্য লেভি স্বদেশে ফিরে যান। বৎসর-খানেক পরে এলেন অধ্যাপক লিন ও-চিয়াং। তিনি বিশ্বভারতীর প্রথম চীনদেশীয় অধ্যাপক। তাঁর সময়ে (১৯২৪—২৫) বিশ্বভারতীতে নিয়মিতভাবে চীনাভাষার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলতে থাকে। এই সময়ে আরো কয়েকজন তরুণ ছাত্র ও অধ্যাপক এই দুরূহ ভাষা শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন।

সিংহলে

ভারতের প্রতিবেশী বৌদ্ধপ্রধান দেশ সিংহল। রবীন্দ্রনাথ সদলবলে তিন বার সিংহল গমন করেন। তিনি প্রথমবার সিংহলে যান ১৯২২ সালের শেষের দিকে। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন দীনবন্ধু এন্ড্রুজ। সিংহলে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন। এবারে তিনি বিভিন্ন স্থানে যেসকল ভাষণ দেন তার মধ্যে Forest University of India এবং The Growth of My Life's Work সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৩১] এই ভাষণ-দুটিতে তিনি ভারতীয় শিক্ষাদর্শ এবং শান্তিনিকেতনের রূপ ও বিকাশের ধারা সিংহলবাসীদের সম্মুখে তুলে ধরলেন।

বহু শতাব্দী ধরে পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ শাসনাধীনে থাকার ফলে সিংহলবাসীরা উৎকট পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন। সিংহলের প্রাচীন শিল্প সভ্যতা ও ধর্ম তখন অবহেলিত। এই তামসিকতার দিনে রবীন্দ্রনাথ সিংহলবাসীকে আত্ম-সচেতন করার প্রয়াস করেন। তিনি আরো বলেন, ভারত ও সিংহলের রাষ্ট্রীয় সত্তা পৃথক হলেও ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই দুই দেশ সুপ্রাচীন কাল থেকে এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে আবদ্ধ। প্রধানত বৌদ্ধধর্মের যোগেই ভারতের সঙ্গে সিংহলের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে এবং এই বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করেই সিংহলের শিল্প ও সভ্যতার চরম বিকাশ সাধিত হয়। ভারতের সঙ্গে সিংহলের পুনরায় যোগস্থাপনের মানসে রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের মহত্ত্ব ও উপনিষদের আদর্শ ব্যাখ্যা করেন এবং সিংহলবাসীদের শান্তিনিকেতনে আসার জন্য আহ্বান জানান। এই যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ মাসেক কাল সিংহলে ছিলেন। তাঁর এই ভ্রমণের ফলে ভারত ও সিংহলের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক যোগ স্থাপিত হয় তার গুরুত্ব অনেকখানি।

১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথ বিলাতযাত্রার প্রাক্‌কালে দ্বিতীয় বার সিংহল গমন

---

[৩০] সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী—চীনভবন, গীতবিতান পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ২৫৬

[৩১] রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড (১ম সং), পৃ. ১০১

করেন। কিন্তু দৈহিক অসুস্থতার জন্য শেষ পর্যন্ত বিলাত যাওয়া হয় নি, সিংহল থেকেই তিনি দেশে ফিরে আসেন। এবারে তিনি দিন দশেক সিংহলে ছিলেন। এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সিংহলের প্রাচীন রাজধানী ও মহাতীর্থ অনুরাধাপুরে বুদ্ধপূর্ণিমা উৎসবে যোগদান। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে অনুরাধাপুরের পবিত্র বোধিদ্রুমতলে সিংহলের জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ চিকিৎসকদের বাধা অগ্রাহ্য করে এই অসুস্থ শরীরেও সেই উৎসবে যোগদান করেন। সেদিন লক্ষ লক্ষ সিংহলবাসীর সঙ্গে এক হয়ে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তার স্মৃতি বহুকাল পর্যন্ত সিংহলবাসীদের মনে জাগ্রত ছিল।[৩২]

১৯৩৪ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ তৃতীয় বার সিংহলে যান। এবার কবির সঙ্গে আছেন শান্তিনিকেতনের বহু শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ দু বার সিংহলে গিয়েছেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার ও ভারতের বাণীকে সিংহলবাসীদের সম্মুখে তুলে ধরা। কিন্তু এবারের সিংহল ভ্রমণের একটু বিশেষত্ব আছে। এবার শুধু মুখে আদর্শ প্রচার নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি যাতে সিংহলবাসীদের মন শ্রদ্ধাশীল হয় সেই উদ্দেশে সিংহলে 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যের অভিনয় ও ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। ভারতীয় সংগীত, নৃত্যকলা ও চিত্রশিল্প সেদিন পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন সিংহলবাসীদের সম্মুখে এক নূতন জগতের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে দেয়। রবীন্দ্রনাথের এই সিংহল ভ্রমণের ফলে একদিকে যেমন সিংহলবাসীদের মনে নবচেতনার সঞ্চার হয় অন্য দিকে আবার ভারতের সঙ্গে সিংহলের বহু প্রাচীন সাংস্কৃতিক যোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে প্রবাসী পত্রিকা লিখেছেন—

> ধর্মে সভ্যতায় সংস্কৃতিতে ভারতবর্ষের সহিত সিংহলের যোগ বহু প্রাচীন। রবীন্দ্রনাথের সিংহল ভ্রমণ সেই যোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিল। এই কাজটি তাঁহার দ্বারা যে প্রকারে হওয়া সম্ভব অন্য কোন এক ব্যক্তির দ্বারা তাহা হইতে পারে না।...নানাগুণের সমাবেশ একই ব্যক্তিতে থাকায় রবীন্দ্রনাথ সিংহলবাসীদিগকে যেমন আনন্দ দিতে পারিয়াছেন ও তাঁহাদের মধ্যে যে নবজাগরণ আনিয়াছেন তাহা পূর্বে তথায় সংসাধিত হয় নাই।[৩৩]

বর্তমানেও বিশ্বভারতীর সঙ্গে সিংহলের যোগ অক্ষুণ্ণ আছে। বিশ্বভারতীতে বিদেশী ছাত্রগণের একটি প্রধান অংশ সিংহলবাসী।

[৩২] প্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীমন্তকুমার জানা, সিংহল ও রবীন্দ্রনাথ, সাপ্তাহিক বসুমতী, ২৩ বৈশাখ ১৩৭২, পৃ. ৩১২২

[৩৩] প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪১, পৃ. ৪৪৭; রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ডে (১ম সং) উদ্‌ধৃত, পৃ. ৩৭৬।

চীনদেশে

রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের ইচ্ছা অনেক কালের। চীন ও ভারত প্রাচ্যের দুই মহান সুসভ্য প্রতিবেশী। অতি প্রাচীনকাল থেকে এই দুই দেশ ধর্ম ও সংস্কৃতির এক নিবিড় আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। এদিক্ থেকে চীনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ অতি স্বাভাবিক। জাপানের হাতে চীনের লাঞ্ছনায় রবীন্দ্রনাথ যে মর্মান্তিক বেদনা প্রকাশ করেছিলেন সেকথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এর পর দেখা যায় সিলভ্যাঁ লেভির আগমনে বিশ্বভারতীতে চীনাভাষা চর্চার সূত্রপাত। ভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্রের বহু মূল্যবান রত্নসম্ভার চীনদেশে রক্ষিত আছে জেনে কবির মনে চীন ভ্রমণের অধিকতর আগ্রহ জন্মে। অবশেষে ১৯২৩ সালে পিকিঙের বক্তৃতা সমিতি থেকে চীনে যাবার আমন্ত্রণ আসে। রবীন্দ্রনাথ এই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করলেন না।

১৯২৪ সালের ২১শে মার্চ কবি চীন যাত্রা করেন। সঙ্গে আছেন ভারতীয় সংস্কৃতির সুযোগ্য প্রতিনিধি আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, আচার্য নন্দলাল বসু ও ডক্টর কালিদাস নাগ। আর আছেন কবির অনুরাগী এল্‌ম্‌হার্স্ট। ১০ই এপ্রিল তাঁরা হংকং বন্দরে উপনীত হন। এই সময়ে চীনের বিপ্লবী নেতা ডক্টর সুন-ইয়াৎ-সান কবিকে ক্যান্টনে আমন্ত্রণ জানিয়ে দূত পাঠান। কিন্তু সময়াভাবে কবি সে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেন নি। ১২ই এপ্রিল হংকং থেকে এলেন সাংহাই—স্বাধীন চীনের প্রথম বন্দর। ভারতীয় কবি চীনবাসীর নিকট বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করলেন। এখানে এক ভাষণে তিনি বলেন, মহাচীনের সহিত মহাভারতের মৈত্রী ও প্রেমের ধারাকে পুনরুজ্জীবনের ব্রত নিয়ে তিনি এদেশে এসেছেন, কোন রাজনৈতিক স্বার্থে নহে।[৩৪]

সাংহাইতে থাকাকালীন হাংচৌ থেকে নিমন্ত্রণ আসে। হাংচৌতে কবি তিন দিন ছিলেন। এখানে বহু প্রাচীন বৌদ্ধগুহা ও মন্দির আছে। এখানকার অন্যতম গুহামন্দিরে ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষু বোধিজ্ঞান দীর্ঘকাল সাধনা করেছিলেন। হাংচৌ-এর শিক্ষাসমিতির উদ্‌যোগে অনুষ্ঠিত সভায় কবি এই ভারতীয় সাধকের উল্লেখ করে বলেন, বোধিজ্ঞান চীনের সংস্কৃতির সহিত আপনার সাধনাযোগে চীনকে যে অমূল্য সম্পদ দান করেছেন তার স্মৃতি এখনো চীনদেশে উজ্জ্বলভাবে জাগ্রত রয়েছে। কবি আশা করেন, অতীতের সাধনা যেমন ভারত ও চীনকে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছিল, তেমনি অদূর ভবিষ্যতেও উভয় দেশকে আবার প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করতে সহায়ক হবে।[৩৫]

---

[৩৪] রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড (১ম সং), পৃ. ১২৯
[৩৫] রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড (১ম সং), পৃ. ১৩০

হাংচৌ থেকে কবি আবার সাংহাইতে ফিরে এলেন। এখানে এসে তিনি দু-তিনটি অভ্যর্থনা সভায় ভাষণ দান করেন। পিকিঙ যাত্রার পূর্বে পাঁচিশটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে কবিকে সংবর্ধনা জানান। পিকিঙের পথে রবীন্দ্রনাথ নানকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাট ছাত্রসমাবেশে বক্তৃতা দেন। ২৩শে এপ্রিল কবি সদলে বিশেষ ট্রেনযোগে পিকিঙ পৌঁছলে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ বিরাট জনতা কবিকে স্বাগত জানালেন। ইতিপূর্বে আর কোন বিদেশী ব্যক্তির আগমনে সেখানে এরকম উদ্দীপনা দেখা যায় নি।

পিকিঙে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সংবর্ধনা-সভায় ভাষণ দেন। এসকল ভাষণের মধ্যে তিনি চীন ও ভারতের প্রাচীন যোগসূত্র পুনরুদ্ধারের অভিপ্রায় নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। ভারতের চিত্ত-সরোবর থেকে উৎসারিত বৌদ্ধধর্মের অমৃতধারা একদিন চীনের অন্তরকে অভিষিক্ত করেছিল। সেই চিরন্তন প্রাণধারা চীনদেশে আজও প্রবহমান। আর নানা সময়ে চৈনিক পরিব্রাজকগণ এসেছেন বুদ্ধের ভারতে শিক্ষার্থী হয়ে। রবীন্দ্রনাথ একথা উল্লেখ করে চীনদেশবাসীকে আবার বিশ্বভারতীতে আহ্বান জানালেন।

পিকিঙে বাসকালীন একদিন চীনের নির্বাসিত মাঞ্চু সম্রাট কবিকে সদলে প্রাসাদে আমন্ত্রণ করেন। ইতিপূর্বে একমাত্র ডক্টর হু-সি ব্যতীত আর কেউ এই সম্মান লাভ করেন নি। সম্রাট স্বয়ং কবিকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং একটি মহামূল্যবান বুদ্ধমূর্তি উপহার দেন।[৩৬]

২৫শে বৈশাখ কবির জন্মদিনে ক্রেসেন্ট মুন সোসাইটির উদ্যোগে চৈনিক রীতিতে এক উৎসবের আয়োজন হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডক্টর হু-সি। সেদিন এই সভায় বিশেষ সমারোহের সহিত কবিকে চু-চেন্-তান্ উপাধি প্রদত্ত হয়। চু-চেন্-তান্ অর্থ 'ভারতের বজ্রঘোষিত প্রভাত'। অন্য অর্থে এই নাম ভারত ও চীনের ঐক্য এবং মিলনের প্রতীক।[৩৭] জন্মদিনে চীনদেশ-বাসীর এই শ্রদ্ধা ও প্রীতির কথা স্মরণ করে জীবনসায়াহ্নে কবি লিখেছেন—

> একদা গিয়েছি চিনদেশে,
> অচেনা যাহারা
> ললাটে দিয়েছে চিহ্ন 'তুমি আমাদের চেনা' বলে।
> খসে পড়ে গিয়েছিল কখন পরের ছদ্মবেশ;
> দেখা দিয়েছিল তাই অন্তরের নিত্য যে মানুষ;
> অভাবিত পরিচয়ে

[৩৬] জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, 'বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ' (২য় সং), পৃ. ১২৪-২৬

[৩৭] Tan Yun-Shan—*Rabindranath, the Gurudeva*; V. G. Nair Ed. 'Tan Yun-Shan Commemoration Volume', p. 15-16

আনন্দের বাঁধ দিল খুলে।
ধরিনু চিনের নাম, পরিনু চিনের বেশবাস।
এ কথা বুঝিনু মনে,
যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে।[৩৮]

রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের ফলে ভারত ও চীনের দুই হাজার বৎসরের অধিক কালের আত্মীয়তার সম্পর্ক আবার নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠে।

জোসেপ তুচ্চি

১৯২৫ সালে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত জোসেপ তুচ্চি বিশ্বভারতীতে যোগদান করেন। বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনাকালীন তদানীন্তন ইতালি সরকার তাঁর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকির কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। ইতালির তৎকালীন সর্বময় কর্তা মুসোলিনী ভারতের সহিত সৌহার্দ স্থাপনের উদ্দেশে অধ্যাপক ফর্মিকিকে বিশ্বভারতীতে প্রেরণ করেছিলেন। ভারতের সহিত ইতালির সাংস্কৃতিক যোগ দৃঢ় করার অভিপ্রায়ে মুসোলিনী অধ্যাপক ফর্মিকির দ্বারা বিশ্বভারতীতে এক বিরাট পুস্তক সম্ভারও দিয়েছিলেন।[৩৯] যা হক, অধ্যাপক তুচ্চির তত্ত্বাবধানে বিশ্বভারতীতে চীনাভাষার মাধ্যমে গবেষণা চলতে থাকে।

দ্বীপময় ভারতে

১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথ দ্বীপময় ভারত ভ্রমণ করেন। মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বালি প্রভৃতি অনেকগুলি দ্বীপ নিয়ে এই দ্বীপময় ভারত। এই দ্বীপাবলীর প্রাচীন ইতিহাস ভারতবর্ষের সহিত জড়িত। একদিন ভারতীয় সংস্কৃতির আলোকে এই দ্বীপাবলী আলোকিত হয়েছিল। কবির মনে আজ আকাঙ্ক্ষা জেগেছে 'ভারতের বাইরেও ভারতকে বড়ো করে সন্ধান করতে'। বৃহত্তর-ভারত-পরিষদ্ কর্তৃক অনুষ্ঠিত বিদায় সংবর্ধনার উত্তরে কবি বলেন--

> ভারতবর্ষ যে কোন্‌খানে সত্য, নিজের লোহার সিন্দুকের মধ্যে তার দলিল সে রেখে যায় নি। ভারতবর্ষ যা দিতে পেরেছে তার দ্বারাই তার প্রকাশ।...এইজন্যেই ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্যকে জানতে হলে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়।[৪০]

---

[৩৮] জন্মদিনে, ৩ সংখ্যক কবিতা
[৩৯] রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড (১ম সং), পৃ. ১৭
[৪০] বৃহত্তর ভারত, 'কালান্তর'

১৯২৭ সালের ১৪ই জুলাই কবি সদলে মাদ্রাজ থেকে জাহাজে করে দ্বীপময়-ভারত যাত্রা শুরু করেন। এই যাত্রায় কবির সঙ্গে আছেন ভারতীয় সংস্কৃতির সুযোগ্য প্রতিনিধি আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। আর আছেন শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর ও ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ। ইতিপূর্বে কবির পথিকৃৎ রূপে শ্রীআরিয়াম উইলিয়মস্ মালয় যাত্রা করেছেন। কবি মালয় থেকে জাভাদি দ্বীপে যাবেন, সেজন্য সেখানে গেলেন শ্রীযুত বাকে ও তাঁর পত্নী।

২০শে জুলাই কবি সদলে সিঙাপুরে পৌঁছান। এখানে আসার পরের দিন শিক্ষিত চীনা ও ধনী ব্যবসায়ীদের গার্ডেন ক্লাবে কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। কবি এই সভাতে বলেন, চীনের প্রাচীন সংস্কৃতি ও চীনের প্রাণের মধ্যে যে সার্বভৌম মানবিকতার বিকাশ হয়েছিল তাকে তিনি অন্তরের সহিত ভালবাসেন। আর ভারত ও চীন এই দুই প্রাচীন মিত্রজাতির মধ্যে পুনরায় যোগসূত্র স্থাপন করাই তাঁর হৃদয়গত আকাঙ্ক্ষা।[৪১]

২২শে জুলাই কবি সিঙাপুরের ভিক্টোরিয়া থিয়েটারে বক্তৃতা করেন। "সমস্ত সিঙাপুর যেন ভেঙে পড়েছিল, কবির বক্তৃতা শোনার জন্য। ইউরোপীয় প্রচুর ছিল, আর ছিল চীনে, আর ভারতবাসী। স্যর হিউ ক্লিফর্ড কবিকে জনসমক্ষে স্বাগত করে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কবি তখন তাঁর বিশ্বভারতীর সহানুভূতিপূর্ণ জ্ঞানের আদর্শ, আর স্বার্থের প্ররোচনায় পরস্পরের প্রতি হিংসাশীল জগতের নানা জাতির মধ্যে শান্তি আনবার জন্য ঐ আদর্শের উপযোগিতা নিয়ে বক্তৃতা দিলেন। রাষ্ট্রনৈতিক আর অর্থনৈতিক জীবনে আপাততঃ ঐক্য আর শান্তির আশা দেখা যাচ্ছে না; নানা জাতির মানুষের মধ্যে মনের মিলের একটি-মাত্র পথ এখন খোলা আছে, সেটি হচ্ছে—সমগ্র মানবসভ্যতা একটি অখণ্ড বস্তু, এই বোধ নিয়ে, পরস্পরের সভ্যতা আর কৃতিত্ব জানবার আর বোঝবার চেষ্টা করা; এইরূপ জানা থেকেই শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়; আর এই শ্রদ্ধাই হচ্ছে আকর্ষণের আর পরস্পরের প্রতি ন্যায়াচরণের মূল। কবির এই বক্তৃতাটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক আর চিন্তোত্তেজক হয়েছিল।"[৪২]

একদিন সিগ্লাপে নামাজীদের বাড়িতে বসে কবি এবং অন্যান্য সবাই আলাপ করছেন। এমন সময় খবর এল পাশের বাড়ির চীনা মহিলারা 'ভারতবর্ষ থেকে আগত ধর্মগুরুকে' দর্শন করতে চান। কবির সম্মতি পেয়ে বাড়ির বৃদ্ধা গিন্নিমা এলেন তাঁর দুই কন্যা কিংবা পুত্রবধূকে নিয়ে। তিনি এসে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে নতমস্তকে দুই হাত জোড় করে কবিকে প্রণাম করলেন। অন্য মেয়ে

---

[৪১] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ', পৃ. ৮১-৮২

[৪২] রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ, পৃ. ৮৬-৮৭

দুটিও করলেন। বুধা শুনেছেন যে, এই লোকমান্য মহাগুরু ভগবান বুদ্ধের দেশ ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন। বুধা নিজে বুদ্ধদেবের উপাসিকা, তাই বুদ্ধের ভারতবর্ষের কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য উপস্থিত হয়েছেন।[৪৩]

২৪শে জুলাই কবি সিঙাপুরের 'প্যালেস গে থিয়েটারে' চীনা শিক্ষক ও ছাত্রসমাবেশে ভাষণ দেন। চীনদেশের কন্সাল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কবি সেদিন যে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন আচার্য সুনীতিকুমার তার চুম্বক দিয়েছেন।—

> চীনে মানবিকতার যে বিকাশ হয়েছিল, ভারতবর্ষ প্রাচীন কালে তার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আর ধর্মপ্রচারকদের হাত দিয়ে, নিজের আধ্যাত্মিক জগতের, নিজের দর্শন আর চিন্তার, নিজের বিজ্ঞানের আর কলার অবিনশ্বর সমৃদ্ধির ভাগ, চীনের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে, তার সেই মানবিকতারই সংবর্ধনা করেছিল। কবির ভারতীয় পূর্বজগণ চীনে যে এই আধ্যাত্মিক অভিযান করেছিলেন, বহু দূরের অনাগত কালের কবিও তখন তাঁদের মধ্যে এই অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন। গতবার যখন কবি চীনে যান, তখন এই বোধটি তাঁর কাছে যেন একটি উপলব্ধ সত্য হয়ে উঠেছিল।[৪৪]

কবি সিঙাপুরে আরো কয়েকটি বক্তৃতা করেন। এখানে সপ্তাহকাল অবস্থানের পর ২৬শে জুলাই তিনি সদলে মালাক্কা রওনা হন। মালাক্কা থেকে কুআলা-লুম্পুর, ইপোঃ, পিনাঙ্ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে তিনি ১৭ই আগস্ট ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সুমাত্রা বা সুবর্ণদ্বীপে উপনীত হন।

সুবর্ণদ্বীপের শ্রীবিজয় বা শ্রীবিষয় রাজ্য অতীতে এক বিরাট ঐতিহ্যের অধিকারী ছিল। এখানকার বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণ যবদ্বীপ, মালয় ও দক্ষিণ শ্যাম পর্যন্ত নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন। এই সময়ে সুবর্ণদ্বীপ বৌদ্ধশাস্ত্র-চর্চার এক প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ই-ৎসিঙের মত বিদ্যার্থী বা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যেমন এখানে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আসতেন তেমনি খাস ভারতবর্ষ থেকে পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা আসতেন। বাঙালি-কুলতিলক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই সুবর্ণদ্বীপে এসে আচার্য চন্দ্রকীর্তির নিকট মহাযান বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করেন। শৈলেন্দ্ররাজ বলপুত্রদেব নালন্দা বিহারে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি পার্শ্ববর্তী পাঁচটি গ্রাম ক্রয় করেন এবং মঠের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পালরাজ দেবপালকে অনুরোধ জানান। তখনকার দিনে ভারতের সঙ্গে সুবর্ণদ্বীপের যে গভীর যোগাযোগ ছিল তা এসকল ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়।

---

[৪৩] রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ, পৃ. ১১১-১২
[৪৪] রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ, পৃ. ১৩১

কবির সুমাত্রাবাসের মেয়াদ একদিন মাত্র। এর পরে গন্তব্যস্থল যবদ্বীপ। যবদ্বীপের পথে কবির মনে পড়ছে এক বিস্মৃত যুগের মিলনের কাহিনী, যেদিন এই দ্বীপের সঙ্গে ভারতের প্রাণের মিল হয়েছিল। অনেক কালের বিরহরাত উত্তীর্ণ হয়ে কবি আবার এসেছেন এই দূর সাগরের উপকূলে। যবদ্বীপের উদ্দেশে রচিত 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী' কবিতার মধ্যে পূর্ব দ্বীপাবলীর সহিত ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক যোগসাধনের কথা এক অপূর্ব কাব্যিক ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেয়েছে।—

> এবার আবার ডাক শুনেছি, হৃদয় আমার নাচে,
> হাজার বছর পার হয়ে আজ আসি তোমার কাছে।
> মুখের পানে চেয়ে তোমার আবার পড়ে মনে
> আরেক দিনের প্রথম দেখা তোমার শ্যামল বনে।
> হয়েছিল রাখিবাঁধন সেদিন শুভ প্রাতে,
> সেই রাখি যে আজো দেখি তোমার দখিন হাতে।
> এই যে-পথে হয়েছিল মোদের যাওয়া-আসা
> আজো সেথায় ছড়িয়ে আছে আমার ছিন্ন ভাষা।
> সে চিহ্ন আজ বেয়ে বেয়ে এলেম শুভক্ষণে
> সেই সেদিনের প্রদীপজ্বালা প্রাণের নিকেতনে।
> আমি তোমায় চিনেছি আজ, তুমি আমায় চেনো,
> নূতনপাওয়া পুরানোকে আপন বলে জেনো।[৬৭]

২১শে আগস্ট কবি সদলে যবদ্বীপের তাজোঙ প্রিয়োক বন্দরে উপনীত হন। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকে এসে কবিকে জাহাজঘাটে অভ্যর্থনা করেন। পরদিন সন্ধ্যায় কবির সম্মানার্থ ইংরেজ কন্সাল মিস্টার ক্রসবির বাড়িতে এক ভোজসভার আয়োজন হয়। এখানে মিস্টার ক্রসবির আগ্রহে কবি তাঁর 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী' কবিতার ইংরেজি অনুবাদ The Indian Pilgrim to Java পাঠ করেন।

যবদ্বীপে তিন দিন অবস্থানের পর কবি বালিদ্বীপের বাংলি নামক স্থানে গমন করেন। সেখানে রাজবংশের কারো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে এক বিপুল সমারোহের আয়োজন হয়। কবি বাংলির রাজপুরীতে গিয়ে দেখেন তাঁর আগমন উপলক্ষে সেখানে এক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে।—

> রাজপুরীতে প্রবেশ করেই দেখি, প্রাঙ্গণে একটি বেদীর উপর বিচিত্র উপকরণ সাজানো; এখানকার চারজন ব্রাহ্মণ—একজন বুদ্ধের, একজন শিবের, একজন ব্রহ্মার, একজন বিষ্ণুর পূজারী।...এরা চারজন পাশা-

[৬৭] শ্রীবিজয়লক্ষ্মী, 'পরিশেষ'
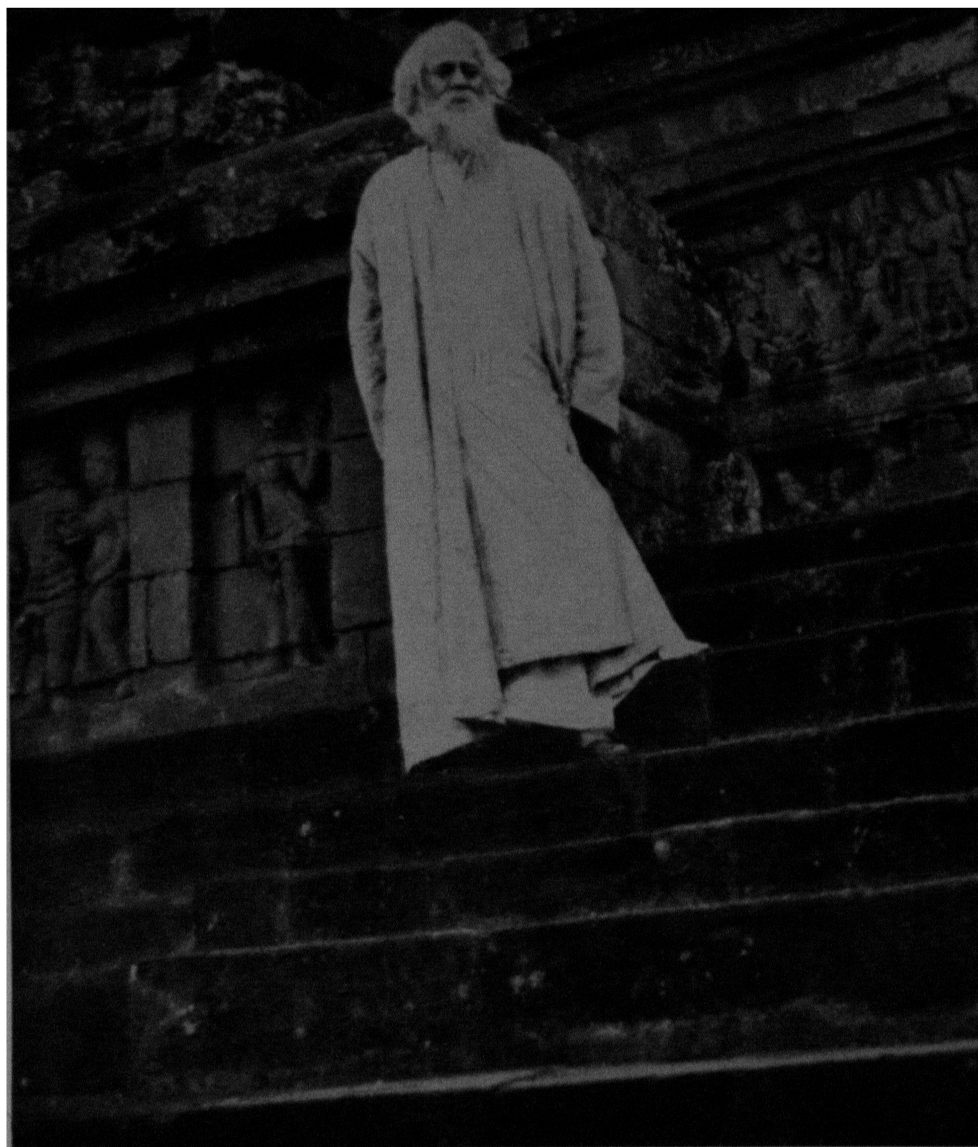
বোরোবুদুরে রবীন্দ্রনাথ

> পাশি বসে আপন-আপন দেবতার স্তবমন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন।...পরে শোনা গেল, এই মাঙ্গল্যমন্ত্রপাঠ চলছিল রাজবাড়িতে আমারই আগমন উপলক্ষে।[৪৩]

এর পর কবি বালিদ্বীপে গিয়াঞ্জা, বাদুঙ, মুণ্ডুক প্রভৃতি আরো কয়েকটি স্থান ভ্রমণ করেন। বালিদ্বীপের সৌন্দর্য কবিকে মুগ্ধ করেছে। যবদ্বীপের মত তিনি বালিদ্বীপের উদ্দেশেও একটি সুন্দর কবিতা রচনা করেন। এই কবিতা 'সাগরিকা' নামে মহুয়া কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূত হয়।

বালিদ্বীপ থেকে কবি আবার ফিরে এলেন যবদ্বীপের সুরাবায়াতে। এখানে স্থানীয় ভারতীয়গণের উদ্‌যোগে কবিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এর পর কবি শুরকর্ত এবং যোগ্যকর্ত নগরীতেও যথারীতি অভিনন্দন লাভ করেন। যোগ্যকর্ত থেকে কবি সদলে বিশ্ববিখ্যাত বোরোবুদুর বৌদ্ধমন্দির দর্শন করতে গেলেন। অষ্টম শতকে সুমাত্রার শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের দ্বারা এই মন্দির নির্মিত হয়। শৈলেন্দ্র রাজগণ যবদ্বীপে ছোটবড় আরো কতকগুলি মন্দির নির্মাণ করেন। কিন্তু শিল্পসৌন্দর্যে বোরোবুদুরের তুলনা নেই। বোরোবুদুর মন্দিরকে দ্বীপময় ভারতের শিল্পসৌন্দর্যের মহত্তম প্রকাশ বলে অভিহিত করা যায়। রবীন্দ্রনাথের বোরোবুদুর দর্শন উপলক্ষে আচার্য সুনীতি-কুমার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য।—

> বোরোবুদুরের মতন বিরাট শিল্প-নিকেতনের সৌন্দর্য-সম্ভারের মধ্যে, প্রাচীন ভারতের জীবন্ত প্রাণের স্পন্দনে সৃষ্ট এই অবিনশ্বর কীর্তির আবেষ্টনের মধ্যে দণ্ডায়মান, ভারতের শ্রেষ্ঠ রসস্রষ্টাদের মধ্যে অন্যতম শ্রীরবীন্দ্রনাথ;—যে ভারতের ঋষিদের, যে ভারতের বুদ্ধের সাধনার অনুপ্রাণনার ফলে এই বোরোবুদুর, এই প্রাম্বানান্, সেই ঋষিদের সেই বুদ্ধের বাণী নবীন-ভাবে যিনি জগতে প্রচার করছেন, প্রাচীন ঋষিদের সেই অদ্ভুত-কর্মা বংশধর শ্রীরবীন্দ্রনাথ, তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। ভারতের প্রাচীন প্রতিভার লীলাক্ষেত্রে এসেছেন ভারতের আধুনিক যুগের এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ, প্রাণরসের উৎসের সন্ধানে,—এ দৃশ্য অপূর্ব; রবীন্দ্রনাথের এই তীর্থে আগমনে, যেন তাঁর দ্বারাই ভারতের প্রাচীন পিতৃপুরুষগণের আত্মার উদ্দেশে, তাঁদের এক বিশেষ কৃতিত্ব বা কীর্তি স্মরণ করে, শ্রদ্ধা-নিবেদন করা হল। বোরোবুদুর,—রবীন্দ্রনাথ;— ভারতের শাশ্বত চিন্তা আর কল্পনাশক্তির দুইটি বিরাট প্রকাশ—এক দিকে ভাস্কর্যমণ্ডিত সৌধে, অন্য দিকে অলৌকিক কবি-প্রতিভায়।[৪৪]

---

[৪৩] জাভা-যাত্রীর পত্র—১০
[৪৪] রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ, পৃ. ৫৫৯

বোরোবুদুর মন্দির দর্শন করে কবির মনে যে ভাবোদয় হয় তা এক অপরূপ ছন্দোবন্ধ লেখনীতে তিনি প্রকাশ করেছেন। একদিন এই মন্দিরের পাষাণের সংগীতের তানে রচিত হয়েছিল ভগবান বুদ্ধের অক্ষয় বন্দনামন্ত্র। আজ মানুষের সেই বোধ সেই দৃষ্টি কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। মানুষ আজ শুধু বাসনার তাড়নায় লক্ষ্যহীনভাবে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে।—

ক্ষিপ্রগতি বাসনার তাড়নায় তৃপ্তিহীন ত্বরা,
কম্পমান ধরা;
বেগ শুধু বেড়ে চলে উর্ধ্বশ্বাসে মৃগয়া-উদ্দেশে,
লক্ষ্য ছোটে পথে পথে, কোথাও পৌঁছে না পরিশেষে;
অন্তহারা সঞ্চয়ের আহুতি মাগিয়া
সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া;
তাই আসিয়াছে দিন,
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌনতটে যে-বাণী রয়েছে চিরস্থির—
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র,—'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।[৮৮]

শ্যামদেশে

যবদ্বীপে থাকাকালীন কবি জানতে পারলেন যে, শ্যামদেশের লোকেরা তাঁর জন্যে উৎসুক হয়ে আছে। তিনি যবদ্বীপের পালা শেষ করে রওনা হলেন শ্যামের পথে। ৮ই অক্টোবর কবি সদলে শ্যামের রাজধানী ব্যাংকক নগরীতে উপনীত হন। সেখানে শ্যাম-সরকার ও ভারতীয়গণের ব্যবস্থা অনুসারে কবি ও তাঁর সঙ্গিগণ নগরীর প্রসিদ্ধ 'ফ্যা থাই প্যালেস হোটেলে' আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ব্যাংককে আসার পরের দিন থেকে কবিকে নানা অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হয়। এখানে আসার পরের দিন তিনি প্রথমে শ্যামের শিক্ষামন্ত্রী রাজকুমার ধনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শান্তিনিকেতনের আদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়। আবার সেদিন সন্ধ্যায় কবি সদলে ব্যাংককের প্রসিদ্ধ Wat Rat-bophit বা রাজপবিত্র মন্দিরে সেখানকার প্রধান ধর্মগুরুর

[৮৮] বোরোবুদুর, 'পরিশেষ'

তাই আসিয়াছে দিন
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে,
শুনিবারে
পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র "বুদ্ধের শরণ লইলাম।"

বোরোবুদুর
২৩ সেপ্টে ১৯২৭

সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। শ্যামের রাজগুরু ভিক্ষু ভারতীয় কবিকে পরম সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন। ভিক্ষুপ্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কবিও আনন্দলাভ করেন।[৩২]

১২ই অক্টোবর কবি বজ্রায়ুধ স্কুলে ভাষণ দান করেন। সেদিন কবিকে সেখানকার শ্রেষ্ঠ 'ধর্মাসন' দান করা হয়। পরদিন কবি চুড়ালংকরণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এক বিরাট ছাত্রছাত্রী সমাবেশে বক্তৃতা করেন। সভায় আরো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সেদিন শ্যামবাসীরা ভারতীয় কবির কণ্ঠে আবার শুনতে পেলেন বুদ্ধদেবের মৈত্রী ও করুণার বাণী।[৩৩]

একদিন বৌদ্ধধর্মের কল্যাণদীপ্তিতে শ্যামের চিত্তলোক উদ্ভাসিত হয়েছিল। বহুশত বৎসরের ব্যবধান পার হয়েও কবি আজ বৌদ্ধসংস্কৃতির সজীব মূর্তিখানি দেখতে পেলেন শ্যামদেশের শ্যামল সরস বক্ষে। সেই সঙ্গে বুদ্ধের ভারতবর্ষে বিস্মৃতপ্রায় বৌদ্ধধর্মের কথাও কবির মনে পড়েছে। তাই শ্যামদেশকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন—

আমি সেথা হতে এনু যেথা ভগ্নস্তূপে
বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ণকীর্ণ মূক শিলারূপে,—
ছিল যেথা সমাচ্ছন্ন করি
বহু যুগ ধরি
বিস্মৃতিকুয়াশা
ভক্তির বিজয়স্তম্ভে সমুৎকীর্ণ অর্চনার ভাষা।
সে-অর্চনা সেই বাণী
আপন সজীব মূর্তিখানি
রাখিয়াছে ধ্রুব করি শ্যামল সরস বক্ষে তব,—
আজি আমি তারে দেখি লব,—
ভারতের যে-মহিমা
ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন অঙ্গনসীমা
অর্ঘ্য দিব তারে
ভারত-বাহিরে তব দ্বারে।
স্নিগ্ধ করি প্রাণ
তীর্থজলে করি যাব স্নান
তোমার জীবনধারাস্রোতে,
যে-নদী এসেছে বহি ভারতের পুণ্যযুগ হতে—

[৩২] রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ, পৃ. ৬০৭
[৩৩] রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ, পৃ. ৬০২

যে-যুগের গিরিশৃঙ্গ-'পর
একদা উদিয়াছিল প্রেমের মঙ্গলদিনকর।[১১]

এর পর একদিন শ্যামের রাজা ও রানীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে কবি শ্যামদেশের উদ্দেশে রচিত এই কবিতা কিংখাপে লিখে উপহার দেন।

সপ্তাহকাল শ্যামদেশে অবস্থানের পর কবি ভারতবর্ষের অভিমুখে ফিরে চললেন। বিদায়ের কালেও কবি বহু পুরাতন প্রেম ও মৈত্রীর কথা স্মরণ করে শ্যামদেশের উদ্দেশে বলেছেন --

চিরন্তন আত্মীয়জনারে
দেখিয়াছি বারে বারে
তোমার ভাষায়,
তোমার ভক্তিতে, তব মুক্তির আশায়,
সুন্দরের তপস্যাতে
যে-অর্ঘ্য রচিলে তব সুনিপুণ হাতে
তাহারি শোভন রূপে--
পূজার প্রদীপে তব, প্রজ্বলিত ধূপে।
আজি বিদায়ের ক্ষণে
চাহিলাম স্নিগ্ধ তব উদার নয়নে,
দাঁড়ানু ক্ষণিক তব অঙ্গনের তলে,
পরাইনু গলে
বরমালা পূর্ণ অনুরাগে--
অম্লান কুসুম যার ফুটেছিল বহুযুগ আগে।[১২]

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক এশিয়ার বৌদ্ধধর্ম-অধ্যুষিত দেশসমূহ পরিভ্রমণ আধুনিক ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। একদা বুদ্ধদেব মৈত্রীর বাণীতে সমগ্র এশিয়াখণ্ডকে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এশিয়া পরিক্রমার মূলেও ছিল এই মৈত্রী ও প্রেমের আদর্শকে জয়যুক্ত করার সাধনা। আর এদিক্ থেকে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের সার্থক উত্তরসাধক।

তান য়ুন-শান ও চীনভবন

বিশ্বভারতীতে চীনাভাষার মাধ্যমে বৌদ্ধশাস্ত্র-চর্চার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ১৯২৮ সালে অধ্যাপক তান য়ুন-শান (জন্ম ১৯০০) কয়েকজন চীনদেশীয় ছাত্রসহ শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁর আগমন বিশ্বভারতীর

[১১] সিয়াম (প্রথম দর্শনে), 'পরিশেষ'
[১২] সিয়াম (বিদায়কালে), 'পরিশেষ'

ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। ১৯২৭ সালে সিঙাপুরে প্রথম এই আদর্শ-বাদী তরুণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। অবশ্য ইতিপূর্বেই তান য়ুন-শান কবির আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের ফলে তিনি কবির প্রতি আরো গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। তান য়ুন-শান বুদ্ধদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত, বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতবর্ষ তাঁর একান্ত প্রিয়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন বুদ্ধের ভারতের জীবন্ত প্রতীক। তখন থেকে তাঁর মনে কবির আদর্শে আত্মোৎসর্গের সংকল্প জাগে।[৪০]

তান য়ুন-শানের আগমনের পর থেকে চীনদেশ হতে ভিক্ষু ও গৃহী ছাত্রেরা ক্রমে বিশ্বভারতীতে আসতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তিব্বত এবং মঙ্গোলিয়া থেকেও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আসেন। বিশ্বভারতীতে চীনা ও তিব্বতী ভাষার চর্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৩১ সালে তান য়ুন-শান রবীন্দ্রনাথের মহৎ প্রেরণা নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৩৩ সালে তাঁর উদ্‌যোগে এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে নান্‌কিঙে Sino-Indian Cultural Society বা চীন-ভারত সংস্কৃতি পরিষদ্‌ স্থাপিত হয়। চীনের বহু চিন্তাশীল মনীষী এর সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ সালে অধ্যাপক তান ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। এই সময়ে ভারতেও চীন-ভারত সংস্কৃতি পরিষদ্‌ স্থাপিত হয়। আর শান্তিনিকেতন হল এর প্রধান কর্মকেন্দ্র। আদর্শবাদী তানের ত্যাগ ও কর্মনিষ্ঠার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর এক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় নূতন অধ্যায়ের ইংগিত খুঁজে পেলেন। অতঃপর কবির আগ্রহ ও নির্দেশে অধ্যাপক তান ভবিষ্যৎ চীনভবনের এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা রচনা করেন।[৪১]

১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে অধ্যাপক তান আবার স্বদেশে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন চীনদেশবাসীর প্রতি কবির মৈত্রীপূর্ণ আমন্ত্রণলিপি। চীন-ভারত মৈত্রীর পুনরুজ্জীবনের ব্রত নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চীনদেশবাসীকে সম্বোধন করে যে পত্র লেখেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য।—

> My friends in China,
>
> The truth that we received when your pilgrims came to us in India, and ours to you—that is not lost even now. What a great pilgrimage was that! What

[৪০] Tan Yun-Shan, *My devotion to Rabindranath Tagore*; V. G. Nair Ed. Tan Yun-Shan Commemoration Volume, p. 11

[৪১] সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী-চীনভবন; গীতবিতান পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৬৮

a great time in history! It is our duty to-day to revive the heroic spirit of that pilgrimage, following the ancient path which is not merely a geographical one but the great historical that was built across the difficult barriers of race difference and difference of language and tradition, reaching the spiritual home where man is in bonds of love and co-operation.[৫৪]

অর্থাৎ, ভারত ও চীনের তীর্থযাত্রীদের গমনাগমনের মধ্য দিয়ে আমরা যে সত্য উপলব্ধি করেছিলাম তা আজও নিঃশেষ হয়ে যায় নি। ইতিহাসের পরম লগ্নে সে এক মহান তীর্থযাত্রা! সেদিন জাতি, ভাষা ও ঐতিহ্যের সুকঠিন ব্যবধান অতিক্রম করে যে পথ মানুষে মানুষে সহযোগিতা ও প্রেমের ভিত্তিতে রচিত এক অপূর্ব ভাবলোকে এসে পৌঁছেছিল, সে পথ শুধু ভৌগোলিক পথ নয়, ইতিহাসের এক মহাপথ। সেই প্রাচীন পথ অনুসরণ করে আজ আমাদের অতীত তীর্থযাত্রার মহান আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের বাণী নিয়ে অধ্যাপক তানের চীনযাত্রা সাফল্যমণ্ডিত হয়। কবির আহ্বানে সাড়া দিলেন চীনের সুধীবৃন্দ। অধ্যাপক তান চীনদেশ থেকে বিশ্বভারতীর জন্য প্রচুর অর্থ ও অমূল্য গ্রন্থরাজি সংগ্রহ করে ১৯৩৬ সালে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। অবশেষে ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে বাংলা নববর্ষের (১৩৪৪) দিন বিশ্বভারতীতে 'চীনভবন' প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৫] সেদিন থেকে বিশ্বভারতীর এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা। ক্রমে বিশ্বভারতী চীন-ভবনে তিব্বত, চীন, জাপান, সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যাম প্রভৃতি দেশ থেকে শিক্ষাব্রতীরা এলেন। অতীতের নালন্দা যেন বিশ্বভারতীতে নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।[৫৬]

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধসংস্কৃতি অনুধাবনের পক্ষে বিভিন্ন ঘটনা-সমন্বিত এই ধারাবাহিক ইতিহাস বিশেষ সহায়তা করবে। এসকল ঘটনা তাঁর চিন্তা ও কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে নব নব সৃষ্টির প্রেরণা দান করেছে। এভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যের বৌদ্ধবিভাগটি এমন সমৃদ্ধ হয়েছে।

---

[৫৪] Tan Yun-Shan, *Twenty Years of the Visva-Bharati Cheena-Bhavan* (1937-57), Appendix One, p. 2

[৫৫] রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৬

[৫৬] সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধশাস্ত্র-চর্চা, চিত্রাঙ্গদা, চৈত্র ১০৭৩

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বুদ্ধদেব ও অশোক

ক। মুখবন্ধ

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বুদ্ধদেব ও অশোক সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে তাঁর পূর্বগামীরা যেভাবে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মকে দেখেছেন সে আলোচনার সার্থকতা আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শে আসার ফলে আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের মন বুদ্ধদেব ও তৎপ্রচারিত ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা ও মননের ক্ষেত্রে যাঁরা বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সাধু অঘোরনাথ, রমেশচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিবেকানন্দ-প্রমুখ মনস্বীদের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এতদ্‌ব্যতীত গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও নবীনচন্দ্র সেন-প্রমুখ সাহিত্যিকগণ বুদ্ধমহিমাকে তাঁদের কাব্য ও নাটকের উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী ও সমকালীন কবি-মনীষিগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধমহিমাকে অবলোকন করেছেন। সেজন্য অনেকক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের চরিত্রচিত্রণে ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার চেয়ে তাঁদের নিজস্ব ধ্যানধারণা ও সংস্কার প্রাধান্য লাভ করেছে।

আমাদের দেশের ধর্মবোধের মূলে রয়েছে বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মবিশ্বাস। সেজন্য দেখা যায় ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের অনুশীলিত মন নিয়েও যাঁরা বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের আলোচনা করেছেন তাঁরা এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। এর ফলে বুদ্ধদেব যেমন অবতাররূপে পরিগণিত হয়েছেন তেমনি বৌদ্ধমতের উপর ব্রাহ্মণ্যমত আরোপ করে একটা সমন্বয় সাধনেরও চেষ্টা দেখা যায়।

বৌদ্ধধর্মে কোথাও অবতারবাদের কথা নেই এবং বুদ্ধদেবও নিজেকে অবতার বলে ঘোষণা করেন নি। বরং অবতারবাদের সঙ্গে বুদ্ধবাদের একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। গীতার উক্তি অনুসারে ভগবান যুগে যুগে আবির্ভূত হন।[১] আর বুদ্ধদেব বলেন, এই তাঁর অন্তিম জন্ম, তাঁর পুনরাবির্ভাব নেই।[২] বুদ্ধত্বলাভের অব্যবহিত পরেও বুদ্ধদেব সর্বপ্রথম এই বাণী উচ্চারণ করেন—

---

[১] গীতা ৪।৮

[২] ধম্মচক্কপবত্তন সুত্ত ১৪, 'সংযুত্ত নিকায়'

অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিসসং অনিব্বিসং,
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং।

গৃহকারকের সন্ধান করতে গিয়ে তাকে না পেয়ে সংসারে অনেক জন্ম পরিভ্রমণ করেছি। বারবার জন্মগ্রহণ দুঃখজনক।

গহকারক! দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসঙ্খিতং;
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্ঝগা।[৩]

গৃহকারক! এক্ষণে আমি তোমার সন্ধান পেয়েছি। তুমি পুনরায় গৃহনির্মাণ করতে সমর্থ হবে না। তোমার সমুদয় পার্শ্বক (বরগা) ভগ্ন এবং গৃহকূট (শীর্ষ) বিচ্ছিন্ন হয়েছে। (আমার) সংস্কারবিগত চিত্ত সমুদয় তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন করেছে।

অথচ ভারতীয় হিন্দুমনে অবতার হিসাবে বুদ্ধদেবের একটি পরিচয় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। অবতার হয়ে বুদ্ধদেবের একটুও গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে কিনা সন্দেহ, তবে অবতারত্বের মধ্যে ঐতিহাসিক বুদ্ধদেবের পরিচয় যে অনেকখানি আবৃত হয়ে আছে সেকথা অস্বীকার করা যায় না। প্রাচীন সংস্কারের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে বাংলাসাহিত্যেও বুদ্ধদেবকে অবতাররূপে কল্পনা করার রীতি দেখা যায়। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধদেব-চরিত' নাটক ও নবীনচন্দ্র সেনের 'অমিতাভ' কাব্য। গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকের আরম্ভেই যথারীতি মীন, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি অবতারের পর বুদ্ধ-অবতারের আবির্ভাবের কথা বলেছেন। নবীনচন্দ্রের 'অমিতাভ' কাব্যেও দেখা যায়, বুদ্ধদেব পৃথিবীতে অবতাররূপে লীলা করতে এসেছেন।—

যাও দেব। লীলা শেষ। এসেছিলে তুমি
একবার যমুনার তীরে পুণ্যবতী,—
দেখিয়াছি সেই লীলা কোমল কঠোর!
আসিলে আবার তুমি কপিলনগরে
শৈলপতি হিমাদ্রির পুণ্য পাদমূলে,
দেখিলাম এই লীলা আত্মবিসর্জন,
রাজপুত্র মহাযোগী।[৪]

বুদ্ধদেবকে যেমন অবতাররূপে গণ্য করা হয়েছে তেমনি বৌদ্ধধর্মকেও হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বলার একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়: যে-কোন রকমে একথা প্রমাণ করতে হবে যে, বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হতে পৃথক কিছু নয়

[৩] ধম্মপদ, ১৫৩—৫৪
[৪] অমিতাভ, পৃ. ১৬৬—৬৭ (২৫০০তম বুদ্ধজয়ন্তী সংস্করণ)

বরং এর একটি অঙ্গবিশেষ। যেখানে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে মিল হয় নি সেখানে বলা হয়েছে এ হিন্দুধর্মেরই একটা রকমফের। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে আমাদের দেশে যাঁরা বৌদ্ধধর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের প্রায় সকলেই এই মনোভাব পোষণ করতেন। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বৌদ্ধধর্ম যে হিন্দুধর্ম হতে পৃথক কিছু নয় একথা বলার চেষ্টা করেন নি এবং বৌদ্ধমতের উপরও ব্রাহ্মণ্যমত আরোপ করেন নি। বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি এর যথাযথ পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। এখানেই বৌদ্ধধর্ম আলোচনার ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা।

রমেশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ-প্রমুখ মনীষিগণের দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম আসলে হিন্দুধর্মেরই অন্তর্গত। রমেশচন্দ্র স্পষ্টই বলেন—

> The main doctrines of Buddhism are old Hindu doctrines adapted to a new system—old wine put in new bottles.[৫]

অর্থাৎ, নূতন পাত্রে পুরাতন পানীয় পরিবেশনের ন্যায় বৌদ্ধধর্মের মূল-তত্ত্বগুলি সনাতন হিন্দুধর্ম থেকে নূতন আকারে গৃহীত।

বিবেকানন্দও বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে নানা ভাবে একথাই বলতে চেয়েছেন। আমেরিকার ডিট্রয়েট নামক স্থানে একটি ভাষণে তিনি বলেন যে, পাশ্চাত্ত্য দেশের অধিবাসিগণ বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মকে দুইটি পৃথক ধর্ম বলে ভুল করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটি সম্প্রদায়বিশেষ।[৬] প্রসিদ্ধ শিকাগো বক্তৃতায়ও তিনি বলেছেন যে, বুদ্ধদেব কোন নূতন মত প্রচার করতে আসেন নি, যিশুর ন্যায় তিনি পূর্ণ করতে এসেছিলেন। হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতিই হল বৌদ্ধধর্ম।[৭] বস্তুত এঁদের দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়।

অনেকে আবার বৌদ্ধধর্মের উপর ব্রাহ্মণ্যমত আরোপ করেছেন এবং একথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, পরমতত্ত্বে আসলে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ প্রসঙ্গে সাধু অঘোরনাথ রচিত 'শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' গ্রন্থখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলাসাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম আলোচনার ক্ষেত্রে সাধু অঘোরনাথ অন্যতম পথিকৃৎ। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রেরণায় তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। নির্বাণতত্ত্ব আলোচনাপ্রসঙ্গে সাধু অঘোরনাথ 'ললিতবিস্তর'

---

[৫] R. C. Dutt, *Civilization of India* (1900), p. 41

[৬] ভগবান বুদ্ধ, 'মহাপুরুষপ্রসঙ্গ' (১৪শ সং), পৃ. ১৪৭

[৭] শিকাগো বক্তৃতা (৮ম সং), পৃ. ৪০

হতে দীর্ঘ বর্ণনা উদ্‌ধৃত করে মন্তব্য করেছেন—

> বুদ্ধদেবের এই উক্তিই নির্ব্বাণের পরমতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিতেছে। তিনি যে সগুণ নির্গুণের অতীত এবং নির্ব্বিকার পুরুষে একাকার হইয়া পরম সমাধি ও সম্বোধি লাভ করিয়া শান্ত ও নিষ্কলঙ্ক হইয়াছিলেন, তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল।[8]

এ ছাড়া সাধু অঘোরনাথ পাশ্চাত্ত্যের বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের উল্লেখ করে বলেন যে, এঁরা সকলেই বলেছেন—

> তিনি (বুদ্ধদেব) আত্মা, পরলোক বা অপর কোন ঈশ্বরপদবাচ্য সত্তা মানিতেন না। ললিতবিস্তরেই শাক্যমুনির জীবন, সাধনপ্রণালী ও মত পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং তদনুসারে বিচার করিতে হইলে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, তিনি প্রচলিত বিশ্বাসের অতীত হইয়া নূতন ভাবে এই তিনটিই বিশ্বাস করিতেন।[9]

এ প্রসঙ্গে আরেকজনের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইনি মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮৬৮—১৯৩০)। পালিশাস্ত্রোক্ত বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে মহেশচন্দ্রের বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি বিংশ শতকের প্রথম দিক্ থেকে প্রবাসী পত্রিকায় বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন দিক্ নিয়ে আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ মহেশচন্দ্রের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর সশ্রদ্ধ উল্লেখও করেছেন।[10] মহেশচন্দ্র বৌদ্ধধর্ম আলোচনাপ্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন সেখানে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। 'সম্যক সমাধি ও ব্রহ্মবিহার' প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> গোতমের আত্মবাদ ও অনাত্মবাদ আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন তাহা (আমাদের ভাষায়) আত্মবাদই।[11]

এরপর নির্বাণতত্ত্ব সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করে তিনি উপসংহারে বলেছেন—

> এই-সমুদায় আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, নির্বাণ ও ব্রহ্ম এতদুভয়ের মধ্যে অতি আশ্চর্য সাদৃশ্য। এ সাদৃশ্য যে কেবল অপর বিষয়ে তাহা নহে; মৌলিক তত্ত্বেও সাদৃশ্য এবং একত্ব। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই—নির্বাণ ও ব্রহ্ম একই।[12]

উল্লিখিত আলোচনা হতে সহজে বুঝতে পারা যায়, আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে বৌদ্ধমতের উপর ব্রাহ্মণ্যমত আরোপ করে উভয়ের মধ্যে

---

[8] শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব (৪র্থ সং), পৃ. ১৫২
[9] শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব (৪র্থ সং), পৃ. ১৪৭
[10] বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ, 'বুদ্ধদেব', পৃ. ৩৬
[11] বুদ্ধ প্রসঙ্গ (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ), পৃ. ৩৭
[12] বুদ্ধ প্রসঙ্গ (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ), পৃ. ৫৭

একটা সমন্বয় সাধনের প্রয়াস বরাবর ছিল। কিন্তু আদর্শবাদী সমন্বয়প্রচেষ্টা ও সত্যনির্ণয় এক কথা নয়। ঔপনিষদিক ধ্যানধারণার সঙ্গে বুদ্ধদেবের ধর্মীয় দৃষ্টির যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে সেকথা সর্বাগ্রে মনে রাখা প্রয়োজন। যে আত্মা- ও পরমাত্মা-বিষয়ক প্রশ্ন ঔপনিষদিক চিন্তাধারায় প্রাধান্য লাভ করেছে, বুদ্ধদেব তার উপর কোন গুরুত্ব দেন নি। এ বিষয়ে মালুঙ্ক্যপুত্রের প্রতি বুদ্ধদেবের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।[১৩] বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রিয় শিষ্য মালুঙ্ক্যপুত্র পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলে বুদ্ধদেব তাঁকে বলেন—

"হে মালুঙ্ক্যপুত্র, আমি কি তোমাকে কখনো বলেছি, এসো আমার শিষ্য হও—আমি তোমাকে বলে দেব জগৎ সৃষ্ট কি অনাদি, দেহ ও আত্মা পরস্পর ভিন্ন কি অভিন্ন, বুদ্ধ মৃত্যুর পর নবজীবন ধারণ করেন কিনা?—এসকল সন্দেহ নিরসনের জন্য উপদেশ দান করব বলে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি?"

—না, ভন্তে, দেন নি।

—এ সকল তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশে তুমি আমাকে গুরু বলে গ্রহণ করেছ?

—না, তা নহে।

তখন বুদ্ধদেব বললেন, "এক ব্যক্তি বিষাক্ত বাণে আহত হলে তার আত্মীয়-গণ একজন নিপুণ চিকিৎসক নিয়ে আসে। যদি সেই আহত ব্যক্তি বলে, আগে আমাকে বল কার বাণে আমি আহত হয়েছি, সে লোকটা কে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র? তার নাম কি? নিবাস কোথায়? সে বাণই বা কি রকম? এসকল প্রশ্নের উত্তরে কি লাভ আছে? এর ফল হত যে, কথা শেষ হতে না হতেই সেই আহত ব্যক্তির মৃত্যু হত।

হে মালুঙ্ক্যপুত্র, তুমি আহত হয়ে আমার নিকট এসেছ চিকিৎসার জন্য। আমি তোমার আরোগ্যের জন্য যথোপযুক্ত ঔষধ বলে দিয়েছি। আমি যা প্রকাশ করি নি তা অপ্রকাশিত থাকুক, যা ব্যক্ত করেছি তা প্রকাশিত হোক।"

বুদ্ধদেবের ধর্মমতকে জানতে হলে প্রথমে এই উপদেশটি মনে রাখা প্রয়োজন। তা না করে বৌদ্ধধর্মের উপর আত্মা, ঈশ্বর ইত্যাদি আরোপ তাঁর ধর্মমতকে জানবার প্রকৃষ্ট পন্থা নয়। এবিষয়ে বুদ্ধদেব পরিব্রাজক পোট্‌ঠপাদের সঙ্গে যে আলোচনা করেছেন তা'ও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।[১৪] বুদ্ধদেব শ্রাবস্তীতে

[১৩] চূল-মালুঙ্ক্যপুত্ত সুত্ত, 'মজ্ঝিমনিকায়'
[১৪] পোট্‌ঠপাদ সুত্ত, সীলক্‌খন্দ বগ্‌গ, 'দীঘ-নিকায়'

অবস্থানকালীন একদিন পোষ্টপাদ প্রশ্ন করলেন, 'এই জগৎ কি শাশ্বত?' বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন, 'আমি এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করি না।' এর পরও পোষ্টপাদ একটির পর একটি প্রশ্ন করতে লাগলেন, 'তবে এই জগৎ কি অশাশ্বত? এই জগৎ কি সসীম? এই জগৎ কি অসীম? জীব ও দেহ কি ভিন্ন? তথাগত মৃত্যুর পর আবার জন্মগ্রহণ করেন?' বুদ্ধদেব সকল প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'এই বিষয়ে আমি কোন মত প্রকাশ করি না।' পোষ্টপাদ আবার প্রশ্ন করলেন, 'আপনি এসকল বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করেন না কেন?' বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন, 'হে পোষ্টপাদ, এসকল মত অর্থ-সংহিত নহে, ধর্ম-সংহিত নহে, নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণের অনুকূল নহে। সেজন্য আমি এসকল বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করি না।' পোষ্টপাদ বললেন, 'ভগবন্, আপনি তাহলে কি ব্যক্ত করেন?' এর উত্তরে বুদ্ধদেব বললেন, 'আমি দুঃখ কি, দুঃখের কারণ কি, দুঃখের নিরোধ কি, দুঃখ-নিরোধের উপায় কি তাই ব্যক্ত করি। যেহেতু এ অর্থ-সংহিত, ধর্ম-সংহিত, ব্রহ্মচর্যের অনুকূল; বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণের অনুকূল। সেজন্য আমি এসকল ব্যক্ত করেছি।'

বুদ্ধদেবের ধর্মীয় দৃষ্টির বিশেষত্ব এখানেই। কিন্তু আমাদের দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা যায়, বুদ্ধদেব যা অবান্তর বলে অব্যাকৃত রাখতে চেয়েছেন তার প্রতি দৃষ্টি বেশি, তিনি যা স্পষ্ট বারণ করেছেন তা করার জন্য অত্যধিক আগ্রহ। বুদ্ধদেবের কথা অগ্রাহ্য করে তাঁর ধর্মমতের মধ্যে আত্মা, ঈশ্বর ইত্যাদি আরোপ করে ঔপনিষদিক ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্মের যে কোন রকমে একটা মিল সাধন তাঁদের উদ্দেশ্য। অনেকে আবার এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বৌদ্ধধর্ম আসলে হিন্দুধর্মেরই অন্তর্গত।

একদিক্ থেকে দেখতে গেলে বৈদিক, ঔপনিষদিক ও জৈনধর্মের মত বৌদ্ধধর্মও ভারতবর্ষের চিত্তভূমি হতে জাগ্রত হয়েছে। এদিক্ থেকে বৌদ্ধ-ধর্মকে ভারতীয় ধর্ম বলে অভিহিত করা অসমীচীন নয়। কিন্তু এখানে আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। ভারতের বনভূমি শাল সেগুন চন্দন প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষের সমবায়ে সমৃদ্ধ; কিন্তু এসকল বৃক্ষরাজিকে একাকার করে দেখলে বনভূমির বৈচিত্র্য ও গৌরব কোনটাই রক্ষা হয় না। তেমনি ভারতের চিত্তভূমিতে জাত বৌদ্ধধর্মকেও তার বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিচার করতে হবে। বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় খুঁজতে হলেও প্রথমে তার মৌলিকত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। নতুবা শুধু হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বললে বৌদ্ধধর্মের যথার্থ মূল্যায়ন হবে না।

খ। বুদ্ধদেব : প্রবন্ধ, কাব্য ও নাটকে

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম আলোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামীদের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। এর মূলে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক সত্যানুসন্ধিৎসা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টি। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামীদের দৃষ্টিতে বুদ্ধদেব অবতার-রূপেই পরিগণিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে কোথাও অবতাররূপে উল্লেখ করেন নি, স্বচ্ছ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেই দেখেছেন। ইতিহাসের গতিপথে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের নিকট মহামানবরূপেই প্রতিভাত হয়েছেন এবং এই মানবীয় মহিমার প্রতিই তিনি অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন। ব্রাহ্মণ্য-সমাজের চিরাচরিত ধারণাকে অতিক্রম করে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখেছেন বলেই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা গৌতম বুদ্ধের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হয়েছে। তা ছাড়া বৌদ্ধধর্ম যে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথ এমন কথাও বলেন নি। প্রধানত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি বৌদ্ধধর্মের আলোচনা করেছেন। তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেললেও বৌদ্ধধর্ম যে হিন্দুধর্ম হতে পৃথক কিছু নয়, জোর করে একথা প্রমাণের চেষ্টা করেন নি। এখানেই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বুদ্ধদেব ও অশোক রবীন্দ্রনাথের যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন তেমন করে আর কেউ পারেন নি। বুদ্ধদেব ও অশোক প্রাচীন ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ মহামানব। এঁরা ভারতবর্ষের চিরন্তন সাধনাকে সমগ্র বিশ্বে জয়যুক্ত করেছেন। যুগে যুগে পৃথিবীতে কত লোকশিক্ষকের আবির্ভাব হয়েছে, দিগ্‌বিজয়ী বীরের অস্ত্রঝনৎকারের মধ্য দিয়ে কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এঁদের পরিচয় খণ্ডকালের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে মানবহৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারে নি। আর বুদ্ধদেব ও অশোকের পরিচয় দেশ ও কালের সীমারেখা ডিঙিয়ে নিখিলমানবের হৃদয়াসনে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। মানুষ কিসে সম্পূর্ণ প্রকাশ লাভ করে একথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> কেবল পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ তাঁরই, সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষকে যিনি আপনার মধ্যে অধিকার করেছেন, যাঁর চেতনা খণ্ডিত হয় নি রাষ্ট্রগত জাতিগত দেশকালের কোনো অভ্যস্ত সীমানায়।[১০]

মনুষ্যত্বের এই পূর্ণ প্রকাশের আলোকে বুদ্ধদেব ও অশোকের চরিত্রমহিমা

[১০] বুদ্ধদেব, পৃ. ৪

স্বতই প্রকাশবান্। কাজেই মহতের পূজারী রবীন্দ্রনাথ এই দুই মহামানবকে যে অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করবেন তা আর বিচিত্র কি।

বুদ্ধদেব ও অশোকের বাণী ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূলমন্ত্র। ভারত-ইতিহাসের এই দুই মহামানবের বাণীকেই তিনি বিশ্বের দরবারে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছেন। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় যথার্থই বলেছেন—

> ভারতবর্ষের যথার্থ সাধনাকে বিশ্বজগতের কাছে জয়ী করে তুলেছেন প্রাচীনকালের বুদ্ধ এবং অশোক, আর আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ। তা ছাড়া আর তো কাউকে দেখিনে যিনি বিশ্বজগতের কলকোলাহলের ঊর্ধ্বে ভারতীয় সাধনার মৈত্রী ও প্রেমের বাণীকে সগৌরবে তুলে ধরতে পেরেছেন। দিগ্‌বিজয়ী গ্রীকবীর আলেকজান্ডারের অস্ত্র-ঝনৎকারের যথাযোগ্য ভারতীয় প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন রাজর্ষি অশোক, দিগ্‌বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের দ্বারা, রাজ্যাধিকারের বদলে মর্মাধিকারের দ্বারা। তৎকালীন জগতের যে-যে স্থলে আলেক-জান্ডারের সেনাবাহিনী পশুবলের বিজয়বার্তা ঘোষণা করেছিল, প্রিয়দর্শী অশোকের শান্তিবাহিনী ঠিক সে-সব স্থলেই গৌতমবুদ্ধ-প্রবর্তিত ধর্মচক্র চালিত করে নিনাদিত করে তুলেছিল বিশ্বমৈত্রীর জয়ঘোষণা। আর, আধুনিক কালে একাজ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি একাই বুদ্ধের বাণী ও অশোকের প্রচার, এই উভয় দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। তফাত এই যে, বুদ্ধ বা অশোক স্বয়ং বিশ্বজগতে বহির্গত হন নি মৈত্রীর পতাকা বহন করে; রবীন্দ্রনাথকে কিন্তু তাই করতে হয়েছে।[১৩]

মানবমহিমার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ হয়েছে বুদ্ধদেবের মধ্যে। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে অভিহিত করেছেন। বুদ্ধদেবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধার নিদর্শন তাঁর জীবন ও সাহিত্যে সমভাবে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের অনুপম শ্রদ্ধা ও ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার আলোকে বুদ্ধমহিমা যে অপরূপ দীপ্তিতে প্রকাশ পেয়েছে, বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে তার তুলনা বিরল। ১৩৪২ সালের ৪ জ্যৈষ্ঠ কলকাতার শ্রীধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে ভাষণদানের শুরুতেই তিনি বলেন—

> আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলংকার নয়,

[১৩] যুগনায়ক রবীন্দ্রনাথ—৬, 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ১৪৬

একান্তে নিভৃতে যা তাঁকে বার-বার সমর্পণ করেছি সেই অর্ঘই আজ এখানে উৎসর্গ করি।[১৭]

বুদ্ধদেবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই শ্রদ্ধা আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে অন্তরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন—

কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে
এ শৈল-আতিথ্যবাসে
বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে।
ভূতলে আসন পাতি
বুদ্ধের বন্দনামন্ত্র শুনাইল আমার কল্যাণে—
গ্রহণ করিনু সেই বাণী।
এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,
মানুষের জন্মক্ষণ হতে
নারায়ণী এ ধরণী
যাঁর আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহু যুগ,
যাঁহাতে প্রত্যক্ষ হল ধরায় সৃষ্টির অভিপ্রায়,
শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে
তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে—
প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।[১৮]

বুদ্ধদেবের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত বুদ্ধগয়া, সারনাথ প্রভৃতি তীর্থ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তাঁর প্রথম জীবনেই এই শ্রদ্ধার সূচনা হয়। 'সমালোচনা' (১৮৮৮) গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—

আমি একজন বুদ্ধের ভক্ত। বুদ্ধের অস্তিত্বের বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমি সেই তীর্থে যাই, যেখানে বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত আছে, সেই শিলা দেখি যাহার উপর বুদ্ধের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে, তখন আমি বুদ্ধকে কতখানি প্রাপ্ত হই! যখন দেখি, ফুটন্ত, ছুটন্ত বর্তমান স্রোতের উপর পুরাতন কালের একটি প্রাচীন জীর্ণ অবশেষ নিশ্চলভাবে বসিয়া...অতীতের দিকে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া আছে, অতীতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ

[১৭] বুদ্ধদেব, পৃ. ১
[১৮] জন্মদিনে—৬ সংখ্যক কবিতা (মংপু, বৈশাখ ১৩৪৭)

করিতেছে, তখন এমন হৃদয়হীন পাষাণ কে আছে যে মুহূর্তের জন্য থামিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া সেই মহা অতীতের দিকে চাহিয়া না দেখে![১৯]

বুদ্ধদেবের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগবশত রবীন্দ্রনাথ জীবনে একাধিকবার বুদ্ধগয়ায় গমন করেন। সেখানে গিয়ে তিনি শান্তি পেয়েছেন, অনন্তকারুণিক বুদ্ধের পুণ্যস্পর্শ উপলব্ধি করেছেন। বুদ্ধগয়ার মন্দির-দর্শনে কবির মনে এই ভাব জেগেছে—

> যাঁর চরণস্পর্শে বসুন্ধরা একদিন পবিত্র হয়েছিল তিনি যেদিন সশরীরে এই গয়াতে ভ্রমণ করেছিলেন, সেদিন কেন আমি জন্মাই নি, সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর পুণ্যপ্রভাব অনুভব করি নি?[২০]

বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে গিয়ে কবির অন্তরে যে প্রণাম জ্ঞাপনের আকুলতা জেগেছিল সেকথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। আর শুধু বুদ্ধগয়াতে কেন, শ্যামে রক্ষে জাভায় গিয়েও বুদ্ধদেবের স্মারকচিহ্নসমূহ দেখে রবীন্দ্রনাথ গভীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করেছেন। বোরোবুদুরের পাষাণস্তূপের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কবির মনে বারবার এই ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে—'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।[২১] কবির আপন ভক্তহৃদয়ের প্রণতি জ্ঞাপনের আকুলতা এই একটিমাত্র চরণকে অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়েছে। 'নটীর পূজা'য় দাসী শ্রীমতীর সংগীতনৃত্যময় জীবনারতির মধ্য দিয়েও বুদ্ধদেবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সীমাহীন শ্রদ্ধা এক অপূর্ব ব্যঞ্জনায় প্রকাশ লাভ করেছে—

আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমঃ
তোমায় স্মরি, হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম
উছল হয়ে বাজে।
আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।

[১৯] অনাবশ্যক, 'সমালোচনা'
[২০] বুদ্ধদেব, পৃ. ১—২
[২১] বোরোবুদুর, 'পরিশেষ'

এ কী পরম ব্যথায় পরান কাঁপায়
কাঁপন বক্ষে লাগে
শান্তিসাগরে ঢেউ খেলে যায়
সুন্দর তায় জাগে।
আমার সব চেতনা সব বেদনা
রচিল এ যে কী আরাধনা,
তোমার পায়ে মোর সাধনা
মরে না যেন লাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।[২২]

প্রাণের চরম আবেগঢালা এই সংগীতনৃত্যের মধ্য দিয়ে কবির সমগ্র হৃদয়-তনুর আকুলতা যেন ভগবান বুদ্ধের চরণে প্রণাম হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। কবি যথার্থই তাঁর 'সব চেতনা সব বেদনা' দিয়ে এই 'আরাধনা' সংগীত রচনা করেছেন; শ্রীমতীর সঙ্গে সংগীতের ভঙ্গিতে কবি নিজেকেও বন্দনায় নিয়োজিত করেছেন। এখানে কবির চিত্ত যেন বুদ্ধদেবকে মানুষের স্বাভাবিক সীমা ছাড়িয়ে ভগবানরূপে গ্রহণ করতে উন্মুখ, যদিও তিনি বুদ্ধদেবকে নরোত্তম বলেই অভিহিত করেছেন।

বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবনের মধ্যে অন্যভাবেও প্রকাশ পেয়েছে। বুদ্ধদেবের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত দুই প্রধান তিথি বৈশাখী পূর্ণিমা ও আষাঢ়ী পূর্ণিমা। বৈশাখী পূর্ণিমা বুদ্ধদেবের আবির্ভাব, বুদ্ধত্বলাভ ও মহাপরিনির্বাণের তিথি। আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে ভগবান বুদ্ধ সারনাথের ইসিপতন মৃগদাবে জগতের হিতার্থে সর্বপ্রথম ধর্মচক্রপ্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন। আমাদের জাতীয় জীবনে এই তিথি দুটির গুরুত্ব রবীন্দ্রনাথ বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে আজ পর্যন্ত ধর্মচক্রপ্রবর্তন তিথি যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।[২৩] এই প্রসঙ্গে বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে রচিত 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি...' গানটি স্মরণীয়। রবীন্দ্র-সংগীতের মধ্যে এই সর্বজনপ্রিয় গানটির একটি বিশেষ স্থান আছে। বিষয়গৌরবে, প্রকাশভঙ্গিতে ও আন্তরিক আবেগের মহিমায় এই গানটি সহজেই মর্মস্পর্শ করে। আজকের পৃথিবীর হিংসা, লোভ ও রক্তক্ষয়ী সংঘাতের দিনে শান্তিকামী নিখিল মানবের ক্রন্দনধ্বনি যেন এর সুরে অনুরণিত হয়েছে—

[২২] নটীর পূজা, রচনাবলী (প-ব সরকার) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯১৭—১৮
[২৩] প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ৫৫

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোরকুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।

ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয় তাপদহনদীপ্ত,
বিষয়বিষবিকারজীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন' তব দক্ষিণ পাণি—
তব শুভসংগীতরাগ, তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।[২৫]

বুদ্ধদেব এখানে শুধু করুণাঘন নন, জগতের হিংসা দ্বন্দ্ব থেকে তিনি মানুষের ত্রাণকারী। কবি বিশ্বাস করেন, ভগবান বুদ্ধের দক্ষিণ হস্তের কল্যাণস্পর্শে ধরণীর সকল গ্লানি দূরীভূত হবে, পৃথিবী আবার শুচিশুভ্র হবে।

বৈশাখী পূর্ণিমাতে বুদ্ধদেবকে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ আরো একটি গান রচনা করেন। এখানেও কবি মহাসংকটের দিনে সকল দুর্গতিভয় বিনাশকারী বুদ্ধদেবের শরণ নিয়েছেন।—

সকল কলুষতামস হর',
জয় হোক তব জয়।
অমৃতবারি সিঞ্চন কর'
নিখিলভুবনময়।
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম!
জ্ঞানসূর্য-উদয়-ভাতি
ধ্বংস করুক তিমিররাতি,
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি
অপগত কর' ভয়।...

[২৫] বুদ্ধজন্মোৎসব (২১ ফাল্গুন ১৩৩৩), 'পরিশেষ'; 'নটীর পূজা'

মোহমলিন অতিদুর্দিন—
শঙ্কিত-চিত পান্থ
জটিল-গহন-পথসংকট-
সংশয়-উদ্‌ভ্রান্ত।
করুণাময়, মাগি শরণ—
দুর্গতিভয় করহ হরণ,
দাও দুঃখবন্ধতরণ
মুক্তির পরিচয়।[২৩]

'সকল কলুষতামস হর' কথাটি বুদ্ধদেবের প্রতি রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। বুদ্ধদেব একদিকে যেমন সমগ্রবিশ্বের ঘনীভূত করুণার ভাবমূর্তি আবার অন্যদিকে তিনি সকল কলুষ ও তামসের অপনোদন করে নিখিলভুবনকে অমৃতবারিতে অভিসিঞ্চিত করেন। এখানেও সকল দুর্গতিভয় হরণ করবার জন্য কবি যে ব্যাকুলকণ্ঠে করুণাময় বুদ্ধের শরণ কামনা করেছেন, এর থেকে বুদ্ধদেবের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও নির্ভরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভগবান বুদ্ধের শান্তসমাহিত করুণামূর্তিটি রবীন্দ্রসাহিত্যে কত বিচিত্র-রূপেই না প্রকাশ পেয়েছে! অজন্তা-ইলোরার সাধক-শিল্পীরা একদিন নিরস পাথরের গায়ে যে বুদ্ধদেবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে চিত্রও যেন এর কাছে ম্লান হয়ে যায়।—

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে,
নিরঞ্জন আনন্দমুরতি।
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে স্ফুরিছে অধর 'পরে
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।
সুদাস রহিল চাহি— নয়নে নিমেষ নাহি,
মুখে তার বাক্য নাহি সরে।[২৬]

এই পংক্তিগুলি পড়লে পাঠকের মনও নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দেখে শুধু সেই 'আনন্দমুরতি'। কিংবা—

নির্বাক্ সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী-'পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি।[২৭]

[২৩] সকলকলুষতামসহর (বৈশাখী পূর্ণিমা ১৩৩৪), 'নটীর পূজা'
[২৬] মূল্যপ্রাপ্তি (২৬ আশ্বিন ১৩০৬), 'কথা'
[২৭] নগরলক্ষ্মী (২৭ আশ্বিন ১৩০৬), 'কথা'

বহুকাল পরে শ্যামদেশে গিয়েও কবির মানসপটে ভগবান বুদ্ধের এই অনুপম করুণসুন্দর রূপটি ভেসে ওঠে।—

পদ্মাসন আছে স্থির,
ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন
চিরদিন—
মৌন যাঁর শান্তি অন্তহারা,
বাণী যাঁর সকরুণ সান্ত্বনার ধারা।[২৮]

এসকল বর্ণনায় বুদ্ধদেবের যে অপরূপ চিত্র ফুটে উঠেছে, সৌন্দর্য ও কমনীয়তায় সমগ্র বাংলাসাহিত্যে বুদ্ধপ্রশস্তি রচনায় এর তুলনা বিরল।

বুদ্ধদেবের অন্তহীন করুণার আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে কত গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে তার পরিচয় রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতিটি বিভাগেই সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। আরো লক্ষ্য করবার বিষয় হল, বুদ্ধদেবকে 'করুণাঘন' 'করুণাময়' বলে সম্বোধন করতেই রবীন্দ্রনাথের বেশি আগ্রহ। বুদ্ধদেবের সর্বব্যাপী করুণার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

> বুদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে—বৎস যেমন গাভীমাতার পূর্ণস্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো শ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে।[২৯]

আর এই করুণার স্বরূপ বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বহুবার এই বুদ্ধবাণী উল্লেখ করেছেন।—

মাতা যথা নিযং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সব্বভূতেসু
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ
অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।[৩০]

[২৮] সিয়াম—প্রথম দর্শনে (১১ অক্টোবর ১৯২৭), 'পরিশেষ'
[২৯] উৎসবের দিন, 'ধর্ম'
[৩০] মেত্তা সুত্ত, 'সুত্তনিপাত'

—মা যেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেইপ্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে। ঊর্ধ্বে অধোতে চার-দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।

বুদ্ধদেবের করুণার জয়গানে রবীন্দ্রনাথ স্বতই উল্লসিত হয়ে উঠেছেন। তার থেকে এই আদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম অনুরাগ সহজেই অনুমান করা যায়।

রবীন্দ্রসাহিত্য অহিংসা ও করুণার বাণীতে পরিপূর্ণ। বুদ্ধদেবের অন্তহীন করুণার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে উক্তি করেছেন, রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধেও তা প্রয়োগ করা যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যের এই অহিংসা ও করুণার বাণীও 'জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে' আমাদের হৃদয়মন অভিষিক্ত করে দেয়। আর শুধু সাহিত্যে নয়, রবীন্দ্রনাথের জীবনেও এর পরিচয় আছে। একদিন এগার বৎসরের বালক রবীন্দ্রনাথ হরিশ মালীর সঙ্গে চীপ সাহেবের কুঠিতে গিয়ে রক্তাপ্লুত নিরীহ খরগোশ ছানা দেখে যে গভীর বেদনা পেয়েছিলেন তা শেষজীবনেও তিনি ভুলতে পারেন নি।[৩১] এই ক্ষুদ্র প্রাণীর ব্যথাই যেন কালক্রমে কবির নিকট সর্বব্যাপী হয়ে দেখা দিয়েছে। তীরবিদ্ধ ক্ষুদ্র বিহঙ্গের দুঃখে কাতর হয়ে রাজকুমার সিদ্ধার্থের প্রাণে 'বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য প্রস্রবণ' উৎসারিত হয়েছিল; ক্ষুদ্র খরগোশ শাবকের রক্তাক্ত দেহ দেখে হয়তো এমনি ভাবেই রবীন্দ্রনাথের করুণার উৎস খুলে গিয়েছিল। আর এই করুণাধারায় অভিসিঞ্চিত হয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতিটি বিভাগ; তাঁর কাব্য, উপন্যাস, নাটক ও সংগীতধারায় এর অজস্র পরিচয় পাওয়া যায়।

বাল্মীকিপ্রতিভা (১৮৮১) ও কালমৃগয়া (১৮৮২) কাব্যনাটিকা দুটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনা। বাল্মীকিপ্রতিভা নাটিকায় ব্যাধের শরে ক্রৌঞ্চপাখির মৃত্যু কিংবা মৃত্যুভয়ে ভীতা বন্দিনী বালিকার কাতর ক্রন্দন বাল্মীকির হৃদয়ে যে গভীর করুণার সঞ্চার করেছিল তা কবির আন্তরিক প্রকাশের আবেগে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে।—

> এ কেমন হল মন আমার!
> কী ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে পারি নে।
> পাষাণহৃদয় গলিল কেন রে!
> কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে!

---

[৩১] প্রভাত গুপ্ত, 'মা নিষাদ'। বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থে সংকলিত, পৃ. ৯৭—৯৮

কী মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাঁধ এ যে টুটিল,
সব ভেসে গেল গো, সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে॥[৩২]

কালমৃগয়া নাটিকাতেও করীশিশুভ্রমে অন্ধ ঋষির পুত্রকে হত্যা করে দশরথের মনে যে বেদনার সঞ্চার হয়েছিল তা আমাদের মনকে আকুল করে তোলে। রাজর্ষি (১৮৮৬) উপন্যাস এবং বিসর্জন (১৮৯০) নাটকেও অহিংসা ও করুণার বাণী কবির অকৃত্রিম আবেগে প্রকাশিত। বস্তুত বিসর্জন নাটকে অবোলা দুর্বল জীবের প্রতি মানুষের নৃশংস নিষ্ঠুরতায় কাতর গোবিন্দমাণিক্যের মর্মস্পর্শী বাণীর মধ্য দিয়ে কবির অন্তর্বেদনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে।—

বুঝিতে পার না জীবজননীর পূজা
জীবরক্ত দিয়ে নহে, ভালোবাসা দিয়ে!
বুঝিতে পার না—ভয় যেথা মা সেখানে
নয়, হিংসা যেথা মা সেখানে নাই, রক্ত
যেথা মা'র সেথা অশ্রুজল! ওরে বৎস,
কী করিয়া দেখাব তোদের, কী বেদনা
দেখেছি মায়ের মুখে, কী কাতর দয়া,
কী ভর্ৎসনা অভিমান-ভরা ছলছল
নেত্রে তাঁর। দেখাইতে পারিতাম যদি,
সেই দণ্ডে চিনিতিস আপনার মাকে।
দয়া এল দীনবেশে মন্দিরের দ্বারে,
অশ্রুজলে মুছে দিতে কলঙ্কের দাগ
মা'র সিংহাসন হতে—সেই অপরাধে
মাতা চলে গেল রোষভরে, এই তোরা
করিলি বিচার?[৩৩]

জীবঘাতী বীভৎসাকে রবীন্দ্রনাথ আজীবন ধিক্‌কার হেনেছেন। তাই শেষ-জীবনে তিনি নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পশুবলি বিরোধী আন্দোলনকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৫ সালে জয়পুর-নিবাসী ব্রাহ্মণ যুবক রামচন্দ্র শর্মা কালীঘাটের কালীমন্দিরে পশুবলি বন্ধ করার জন্য অনশন ধর্মঘট করলে রবীন্দ্রনাথ এই সাহসী যুবকের মহান সংকল্পকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর উদ্দেশে এক কবিতা রচনা করেন। এর

[৩২] 'বাল্মীকিপ্রতিভা', রচনাবলী (প-ব সরকার) ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯৯—৫০০
[৩৩] বিসর্জন, রচনাবলী (প-ব সরকার) ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪১০—১১

জন্য রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ কবির উপর মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।[৩৪] কিন্তু অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কারো ভ্রূকুটি দেখে কোনদিন নিরস্ত হন নি। তা ছাড়া প্রাণীহত্যাবিরোধী মনোভাবের জন্য রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার নিরামিষ আহারেও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। শিলাইদহে বোটে থাকাকালীন কবি একদিন দেখলেন যে, বাবুর্চিখানার লোক একটি পলায়মান মুরগি ধরে আনছে। এই দৃশ্য দেখে কবির মনে যে গভীর বেদনার সঞ্চার হয় একটি পত্রে তা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।—

> আমি ফটিককে ডেকে বললুম আমার জন্যে আজ মাংস হবে না। এমন সময় ডাকে বলুর 'পশুপ্রীতি' লেখাটা এসে পৌঁছল, আমি পেয়ে কিছু আশ্চর্য হলুম। আমার তো আর মাংস খেতে রুচি হয় না। আমরা যে কী অন্যায় এবং কী নিষ্ঠুর কাজ করি তা ভেবে দেখি নে বলে মাংস গলাধঃকরণ করতে পারি।...আমার বোধ হয় সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম জীবে দয়া। প্রেম হচ্ছে সমস্ত ধর্মের মূল ভিত্তি। জগতে আমা হতে যেন দুঃখের সৃজন না হয়ে সুখের বিস্তার হতে থাকে।...আমি তো মনে করেছি আরও একবার নিরামিষ খাওয়া ধরে দেখব।[৩৫]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, রবীন্দ্রনাথ একসময়ে শিলাইদহের চরে পাখি মারা নিষেধ করে দিয়েছিলেন।[৩৬] আর শান্তিনিকেতন আশ্রম অঞ্চলে অদ্যাপি প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ।

নিখিলমানবের দুঃখমোচনের সংকল্প নিয়ে বুদ্ধদেব রাজ্য-সংসার সব ত্যাগ করেছিলেন। এই ত্যাগের দ্বারা তিনি মানবহৃদয়ে যে স্থায়ী আসন লাভ করলেন কপিলবাস্তুর সিংহাসন তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় যথার্থই বলেছেন, "বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেকজান্ডার করেন নি।"[৩৭] বুদ্ধদেব ত্যাগের দ্বারা প্রেমের দ্বারা যে পৃথিবী জয় করেছিলেন, তা-ই সত্যকারের জয়। আর আলেকজান্ডার লোভের বশবর্তী হয়ে অস্ত্রের দ্বারা যে ভূখণ্ড অধিকার করেছিলেন তা সত্যকারের জয় নয়। সেজন্য দেখা যায় আলেকজান্ডারের অস্ত্রবলে অর্জিত ভূখণ্ড কালক্রমে স্থায়ী হয় নি; কিন্তু বিনা অস্ত্রে অর্জিত বুদ্ধদেবের প্রেমের সাম্রাজ্য মানবহৃদয়ে চিরদিন দেদীপ্যমান হয়ে বিরাজ করছে। আবার এই মহাগুরুর বাণীকে গ্রহণ করে

---

[৩৪] রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ খণ্ড (১ম সং), পৃ. ৩৩

[৩৫] ছিন্নপত্রাবলী—১১৭ (২২ মার্চ ১৮৯৪)

[৩৬] প্রভাত গুপ্ত, 'মা নিষাদ'। বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থে সংকলিত, পৃ. ৯৯

[৩৭] ঘরে বাইরে, রচনাবলী ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫০১ (মাস্টারমশায়ের প্রতি নিখিলেশের উক্তি)

রাজচক্রবর্তী অশোক রাজবেশ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই ত্যাগের আদর্শ উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে। বস্তুত 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' —উপনিষদের এই অমৃতবাণীকে রবীন্দ্রনাথ জীবনের অন্যতম মূল-মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাই কবির কণ্ঠে সেই অমোঘ বাণী দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে।—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই;
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'।[৫৮]

আজ লোভের দ্বারা জগতের মধ্যে যে হিংস্র বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে তা দেখে কবির মনে ধিক্কার জাগে। এই লোভের দ্বারা মানুষের শ্রেয়োবোধ আচ্ছন্ন। মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে যে স্বার্থের সংঘাত, সিদ্ধির স্পর্ধায় মানুষ যেভাবে ন্যায়বোধ ধর্মবোধকে অনায়াসে পদদলিত করতে পারে, তার ভয়াবহ দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ আপন জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন। মানবাত্মার এই চরম গ্লানির দিনে কবির মানসপটে ভেসে ওঠে সেই সর্বত্যাগী রাজপুত্রের দিব্যমূর্তি, গভীর নৈরাশ্যের মধ্যেও কবির অন্তরে ভরসার সঞ্চার হয়।—

হেনকালে জ্বলি উঠে বজ্রাগ্নি-সমান
চিত্তে তাঁর দিব্যমূর্তি, সেই বীর রাজার কুমার
বাসনারে বলি দিয়া বিসর্জিয়া সর্ব আপনার
বর্তমানকাল হতে নিষ্ক্রমিলা নিত্যকাল-মাঝে
অনন্ত তপস্যা বহি মানুষের উদ্ধারের কাজে
অহমিকা-বন্দীশালা হতে।—ভগবান বুদ্ধ তুমি,
নির্দয় এ লোকালয়, এ ক্ষেত্রই তব জন্মভূমি।
ভরসা হারাল যারা, যাহাদের ভেঙেছে বিশ্বাস,
তোমারি করুণাবিত্তে ভরুক তাদের সর্বনাশ,—
আপনারে ভুলে তারা ভুলুক দুর্গতি।—আর যারা
ক্ষীণের নির্ভর ধ্বংস করে, রচে দুর্ভাগ্যের কারা
দুর্বলের মুক্তি রুধি, বোসো তাহাদেরি দুর্গদ্বারে
তপের আসন পাতি; প্রমাদবিহ্বল অহংকারে
পড়ুক সত্যের দৃষ্টি; তাদের নিঃসীম অসম্মান
তব পুণ্য আলোকেতে লভুক নিঃশেষ অবসান।[৫৯]

[৫৮] সুপ্রভাত, শেষলেখা (পরিশিষ্ট)
[৫৯] প্রার্থনা (২১ জুলাই ১৯৩৩), 'পরিশেষ' (সংযোজন)

ত্যাগের পরাকাষ্ঠা হিসাবে বুদ্ধদেবকে সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্রও বলেছেন—

এস দানবীর, দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা—
মহাভিক্ষু, লও সবার অহংকারভিক্ষা।[৬০]

এর থেকেও অনুমান করা যায়, বুদ্ধদেবের ত্যাগের আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে কত গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত শ্রেষ্ঠভিক্ষা, মস্তকবিক্রয়, পূজারিণী, মূল্যপ্রাপ্তি, নগরলক্ষ্মী প্রভৃতি কবিতায়ও বুদ্ধদেবের দ্বারা অনুপ্রাণিত ত্যাগের মহিমা যে অপরূপ দীপ্তিতে প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনা বিরল। এ প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন—

> যে ত্যাগের আবেগে নারী আপনার লজ্জা ভুলিয়া একমাত্র পরিধেয় বসন প্রভু বুদ্ধের নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে, আপনার ভোগের উৎসৃষ্ট অংশ হইতে কিছু দেওয়াকে ত্যাগ মনে করে নাই, যে ত্যাগ নৃপতিকে ভিখারীর বেশ পরিধান করাইয়া দীনতম সন্ন্যাসী সাজাইয়াছে, পূজারিণী রাজদণ্ডের ভয়কে তুচ্ছ করিয়া পূজার জন্য প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে,...সেই সকল ত্যাগের কাহিনীই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের ভিতর হইতে রবীন্দ্রনাথ জাগাইয়া তুলিলেন।[৬১]

রবীন্দ্রসাহিত্যে এই ত্যাগের চিত্র অন্যত্রও আছে। এমন কি রবীন্দ্রদৃষ্টিতে আদর্শ রাজাও হবেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। যে ভারতীয় মহিমা নৃপতিকে মুকুট দণ্ড ও সিংহাসন ত্যাগের অনুপ্রেরণা দান করেছে, রবীন্দ্রসাহিত্য সেই আদর্শের জয়গানে মুখর। সেজন্য ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে অশোক ও শিবাজী রবীন্দ্রনাথের এত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। সম্রাট অশোক মহাভিক্ষু বুদ্ধের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর রাজত্বকালেই যে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর শিলালিপিতে এর প্রমাণ আছে। শিবাজীও আরেক সন্ন্যাসীর শিষ্য। রবীন্দ্রনাথ 'প্রতিনিধি' কবিতায় রামদাস স্বামীর উক্তির মধ্য দিয়ে রাজসন্ন্যাসীর আদর্শ সুন্দররূপে ব্যক্ত করেছেন।—

তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন।
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।

---

[৬০] বুদ্ধজন্মোৎসব, 'পরিশেষ'

[৬১] অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ৮১—৮২

বৎস, তবে এই লহো মোর আশীর্বাদ সহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস—
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো
কহিলেন গুরু রামদাস।[৫২]

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট অন্য দুজন আদর্শ নৃপতি গোবিন্দমাণিক্য (রাজর্ষি, বিসর্জন) এবং 'শারদোৎসব'-এর বিজয়াদিত্য। এ প্রসঙ্গে 'মস্তকবিক্রয়' কবিতার কোশলরাজও উল্লেখযোগ্য। সর্বস্ব ত্যাগের মধ্য দিয়ে এ'রা সবাইকে জয় করেছেন। ত্যাগের মধ্য দিয়ে যে পূর্ণতার প্রকাশ, এ ভাবটি সন্ন্যাসীরূপী বিজয়াদিত্যের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক অপূর্ব ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন।—

> আমি অনেক দিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন। কিছুই ভেবে পাই নি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে করছে। সেইজন্যেই ধানের খেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যেই এত সৌন্দর্য।[৫৩]

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম মহৎসৃষ্টি 'চতুরঙ্গের' নাস্তিক জ্যাঠামশাই। বীর্যবত্তা ও মহৎ আত্মত্যাগের দীপ্তিতে জ্যাঠামশাই বাংলাসাহিত্যে একটি অপূর্ব সৃষ্টি।

নিখিলমানবের প্রতি মৈত্রী ও প্রেমের বিস্তারেই ত্যাগের চরম সার্থকতা। ত্যাগের দ্বারা মানুষের হৃদয়ের প্রসার ঘটে, তখন ব্যক্তিস্বার্থ অকিঞ্চিৎকর হয়ে মানুষের ভাবনা সর্বলোকে পরিব্যাপ্ত হয়। ভগবান বুদ্ধের বাণী মূলত এই বিশ্বমৈত্রীর সুরেই বাঁধা; তাই বুদ্ধদেবের সাধনালব্ধ সামগ্রী একদিন সকল মানুষের হয়েছিল। বস্তুত বুদ্ধদেবের এই অখণ্ড মৈত্রীর আদর্শ জগতে যেভাবে কল্যাণপ্রসূ হয়েছে মানব-ইতিহাসে তার তুলনা কোথায়! রবীন্দ্রনাথের জীবন এবং বাণীতেও এই বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। এদিক্ থেকে রবীন্দ্রনাথ ভগবান বুদ্ধের সার্থক উত্তরসাধক। রবীন্দ্রনাথ একদিন বিশ্বমানবের কল্যাণবার্তা নিয়ে সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন; কবিগুরুর এই বিশ্ব-পরিক্রমা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ভগবান বুদ্ধের সেই দিগন্তপ্রসারী মৈত্রী-মন্ত্র—'চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'—হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বহুজনের হিতের জন্য বহুজনের সুখের জন্য দিকে দিকে দেশে দেশান্তরে বিচরণ কর। বুদ্ধদেবের এই আদর্শ রবীন্দ্রনাথের জীবনে সার্থকভাবে

---

[৫২] প্রতিনিধি, 'কথা'

[৫৩] শারদোৎসব, রচনাবলী (প-ব সরকার) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০৪

রূপায়িত হয়েছে। এই বিশ্বমৈত্রীর বিজয়বৈজয়ন্তী বহন করে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দূরকে নিকট বন্ধু ও পরকে ভাই করেছেন, আধুনিককালে তেমন আর কে করতে পেরেছে! নব মহাভারত রচনাতেও স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমের বীণার মধুরগম্ভীর সুরে আহ্বান জানিয়েছেন পৃথিবীর সকল মানুষকে।—

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।[৬৪]

কবির বিশ্বভারতীতেও এই আদর্শের সার্থক রূপায়ণ দেখতে পাই। সমগ্র বিশ্বমানব যেখানে একই নীড়ে ঠাঁই পেয়েছে সেই হল বিশ্বভারতী। বুদ্ধদেবের যে সত্যসাধনার ফলে ভারতবর্ষ একদিন নিখিল মানবচিত্তকে অধিকার করেছিল, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মূলে রবীন্দ্রনাথের মনে সেই আদর্শ জাগ্রত ছিল।

সর্বমানবের ঐক্যসাধনই বিশ্বমৈত্রীর মূল লক্ষ্য। বুদ্ধদেবের বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ মানুষের সঙ্গে মানুষের কৃত্রিম ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে সর্বজনগণে এক মহান ঐক্যবন্ধনে বেঁধে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই উপলব্ধি করেছেন—

> বুদ্ধদেব জাতিবর্ণ ও শাস্ত্রের সমস্ত ভাগাবিভাগ অতিক্রম করে বিশ্বমৈত্রী প্রচার করেছিলেন। এই বিশ্বমৈত্রী যে মুক্তি বহন করে সে হচ্ছে অনৈক্য-বোধ থেকে মুক্তি।[৬৫]

এই ঐক্যতত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ কিরূপ প্রাধান্য দিয়েছেন তা রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতিটি বিভাগেই দৃষ্টিগোচর হবে। এক অখণ্ড জীবনসত্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথ। জীবন ও জগতের কোনরকমের খণ্ডতা বা বিচ্ছিন্নতা কবির পক্ষে মর্মান্তিক পীড়াদায়ক। তাই যেখানে ঐক্যের সাধনা প্রকাশ পেয়েছে সেখানেই কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ। ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন এক মহান ঐক্যের সাধনা। ভারতবর্ষ চিরদিন ধরে বিচিত্র উপকরণে এই ঐক্যমূলক সভ্যতার ভিত্তি নির্মাণ করে আসছে। কবি-মনীষীর অন্তর্দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের এই সত্যস্বরূপটি স্পষ্টরূপে ধরা দিয়েছে।—

> ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই

---

[৬৪] ভারততীর্থ, 'গীতাঞ্জলি'
[৬৫] ভারতপথিক রামমোহন, রচনাবলী (প-ব সরকার) ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪০৩

সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।[৬০]

কবি ভারততীর্থ সম্পর্কে দেখেছেন চারিদিক হতে দুর্বার স্রোতে এখানে কত অমর জীবনের ধারা মিলিত হয়েছে।—

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।[৬১]

আর ভারতীয় ঐক্যতত্ত্বের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হয়েছে বুদ্ধদেব তথা বৌদ্ধধর্মের মধ্য দিয়ে। 'আত্মার অমৃত-অন্ন' দান করে বুদ্ধদেব দূরবাসী অনাত্মীয়জনকেও এক নিবিড় ঐক্যবন্ধনে বেঁধে দিয়েছিলেন। এই ঐক্যসূত্রে ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রায় সমগ্র এশিয়া বাঁধা পড়ল।[৬২] পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় ঐক্যবন্ধন এর পূর্বে বা পরে আর দেখা যায় নি। এই ঐক্যবন্ধনের মূলে রাজ্যজয় বা বাণিজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ছিল না, শুধু ছিল এক মহান কল্যাণ প্রেরণা। আর এই প্রেরণার উৎস ছিলেন ভগবান বুদ্ধ। সংহতি শক্তির উপাসক রবীন্দ্রনাথ শ্যামদেশে গিয়েও একথা গভীর অনুরাগের সহিত স্মরণ করেছেন।—

সে মন্ত্র ভারতী
দিল অস্খলিত গতি
কত শত শতাব্দীর সংসারযাত্রারে—
শুভ আকর্ষণে বাঁধি তারে
এক ধ্রুবকেন্দ্র-সাথে
চরম মুক্তির সাধনাতে,
সর্বজনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে—
এক ধর্ম, এক সংঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে।[৬৩]

এই মহাগুরুর শক্তিতে অনুপ্রাণিত ঐক্যের সাধনা জগতে কিভাবে

---

[৬০] ভারতবর্ষের ইতিহাস, 'ভারতবর্ষ'
[৬১] ভারততীর্থ, 'গীতাঞ্জলি'
[৬২] স্মরণীয়—সেই দেবতা গর্তে পুঁতিয়া
এশিয়া মিলাল শাক্যমুনি।—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জাতির পাঁতি
[৬৩] সিয়াম (প্রথম দর্শনে), 'পরিশেষ'

কল্যাণপ্রসূ হয়েছে বৌদ্ধধর্মবির্জিত দেশসমূহে সে দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এই সাধনা শুধু শাস্ত্র কিংবা দার্শনিক মতবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এ জীবনসত্যে প্রতিভাত। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক প্রজ্ঞার আলোকে এ সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে।—

> আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে সে থাকে লুপ্ত; আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত। মনুষ্যত্বের এই প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নতার একটা মস্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। বুদ্ধদেব মৈত্রীবুদ্ধিতে সকল মানুষকে এক দেখেছিলেন, তাঁর সেই ঐক্যতত্ত্ব চীনকে অমৃত দান করেছিল। আর, যে বণিক লোভের প্রেরণায় চীনে এল এই ঐক্যতত্ত্বকে সে মানলে না; সে অকুণ্ঠিতচিত্তে চীনকে মৃত্যুদান করেছে, কামান দিয়ে ঠেসে ঠেসে তাকে আফিম গিলিয়েছে। মানুষ কিসে প্রকাশ পেয়েছে আর কিসে প্রচ্ছন্ন হয়েছে, এর চেয়ে স্পষ্ট করে ইতিহাসে আর-কখনো দেখা যায় নি।[১০]

ভারতবর্ষ একদিন নিখিলমানবকে ঐক্যতত্ত্ব দান করেছিল; কিন্তু সেই ভাবধারা আজ ভারতবর্ষের আপন সীমার মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদের মরুদৈন্যে বিলীনপ্রায়। এই অনৈক্যের মূলে রয়েছে প্রধানত আমাদের দেশের দুই সামাজিক ব্যাধি—জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা। এ আমাদের দেশের এক অক্ষয় কলঙ্কের কারণ, এর অভিশাপে সমস্ত দেশ পঙ্গু হয়ে আছে। আমাদের দেশে মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে যে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ও ঘৃণা, পদে পদে মনুষ্যত্বের যে বীভৎস অপমান তা রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে লক্ষ্য করেছেন। এর ফলে স্পর্শকাতর কবিচিত্ত বারবার পীড়িত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনেও কবি অনেক বার এরকম ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। অল্পবয়সে কবি জমিদারি সেরেস্তায় গিয়ে দেখেছেন, ব্রাহ্মণ ম্যানেজার যে তক্তাপোশে গদিতে বসে দরবার করেন সেখানে জাজিম তোলা স্থানটি মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট, আর জাজিমের উপর হিন্দুদের স্থান।[১১] দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের সঙ্গে মালাবারে ভ্রমণকালীন দেখেছেন, টিয়া-সমাজ-ভুক্ত একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক ব্রাহ্মণপল্লীতে পা বাড়াতেও সাহস করেন না।[১২] এ ছাড়া আরেকজন বিদেশী রুগ্‌ণ পথিকের কথা রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার উল্লেখ করেছেন।[১৩] শীতের মধ্যে এই পীড়িত বিদেশী মানুষ তিন দিন ধরে নদীর ধারে পড়ে ছিল। এর পাশ দিয়ে শত শত পুণ্যকামী লোক

[১০] শিক্ষার মিলন (১৯২১), 'শিক্ষা'
[১১] হিন্দুমুসলমান (১৯৩১), 'কালান্তর'
[১২] হিন্দুমুসলমান (১৯৩১), 'কালান্তর'
[১৩] ধর্মের অধিকার (১৯১১), 'সঞ্চয়'। নবযুগ (১৯৩২), 'কালান্তর'

বিশেষ দিনে বিশেষ স্থানে জলে ডুব দিয়ে শুচি হতে চলেছে, কিন্তু এই অসহায় পীড়িত মানুষকে কেউ স্পর্শ করে নি। রবীন্দ্রনাথ এসম্বন্ধে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, 'সেই অজ্ঞাতকুলশীল পীড়িত মানুষের সামান্য-মাত্র সেবা করলে তারা অশুচি হত, শুচি হবে জলে ডুব দিয়ে।'[১৪] এরকম আরো দৃষ্টান্ত বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করা গেল না। এমনি ভাবে যারা 'মানুষের পরশেরে' ঘৃণায় দূরে সরিয়ে রেখেছে, বিধাতার রুদ্ররোষ থেকে তাদের মুক্তি নেই। তাই সাবধানবাণী উচ্চারণ করে কবি বারবার একথাই বলতে চেয়েছেন—

> মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতেই হইবে।[১৫]

তুলনীয়—

> যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
> পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।[১৬]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেছিলেন।[১৭]

বুদ্ধদেব জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মানুষের মুক্তি ঘোষণা করেছেন। সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য মানুষ এতদিন বর্ণা-শ্রমের জাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হয়েছিল। বুদ্ধদেবের উদার ধর্মমত মানবীয় অধিকার হতে বঞ্চিত এসকল মানুষকেও আভিজাত্য দান করেছে। বুদ্ধদেব মানুষের জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, সাধারণ বংশে জন্মগ্রহণ করলেও মানুষ স্বীয় কর্মফলে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে। বুদ্ধ-দেবের এই সীমাহীন মহত্ত্ব মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথকে কম মুগ্ধ করে নি।

বুদ্ধদেব একদিন আমাদের দেশে মানুষকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশে আজ মানুষের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার অন্ত নেই। এ শুধু আমাদের জাতীয় সংহতির অন্তরায় নয়, এ মনুষ্যত্বের চরম অসম্মান। তাই জাতীয় জীবনের এই গ্লানির দিনে রবীন্দ্রনাথ এদেশে আবার ভগবান বুদ্ধের বাণীকেই একান্তভাবে কামনা করেন। কবির বিশ্বাস, বুদ্ধদেবের এত

[১৪] নবযুগ (১৯৩২), 'কালান্তর'
[১৫] ব্যাধি ও প্রতিকার (১৯০৭), 'সমূহ'
[১৬] অপমানিত, 'গীতাঞ্জলি'
[১৭] ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ৬৫

বড় তপস্যার ফল এদেশে এমন সীমাহীন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে না।—

বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, অপবিত্র ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তা ধর্মের নামে আজ রক্তে পঙ্কিল করে তুলেছে এই ধরাতল; পরস্পর হিংসার চেয়ে সাংঘাতিক পরস্পর ঘৃণায় মানুষ এখানে পদে পদে অপমানিত। সর্বজীবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ বলে ঘোষণা করেছিলেন সেই তাঁরই বাণীকে আজ উৎকণ্ঠিত হয়ে কামনা করি এই ভ্রাতৃবিদ্বেষকলুষিত হতভাগ্য দেশে। পূজার বেদীতে আবির্ভূত হোন মানবশ্রেষ্ঠ, মানবের শ্রেষ্ঠতাকে উদ্ধার করবার জন্যে।...ভগবান বুদ্ধ একদিন রাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন। সে তপস্যা সকল মানুষের দুঃখমোচনের সংকল্প নিয়ে। এই তপস্যার মধ্যে কি অধিকারভেদ ছিল? কেউ ছিল কি ম্লেচ্ছ? কেউ ছিল কি অনার্য? তিনি তাঁর সব-কিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মূর্খতম মানুষেরও জন্যে। তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁর সেই এত বড়ো তপস্যা আজ কি ভারতবর্ষ থেকে বিলীন হবে?[৬৮]

সর্বমানবের সমতার ভিত্তিতেই রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ রচিত। তাই যে ব্রাহ্মণ জন্মগত পার্থক্যকে প্রাধান্য দিয়ে আমাদের দেশে বিভেদমূলক কৃত্রিম সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, রবীন্দ্রনাথ তার মনকে অশুচি বলতেও দ্বিধা করেন নি।—

এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার—
এসো হে পতিত, করো অপনীত সব অপমানভার।[৬৯]

কবি দেশমাতৃকার অভিষেকে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান করেছেন। 'সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে'ই দেশজননীর অভিষেক সার্থক হবে।

বুদ্ধদেবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এক অসীম নির্ভরতা। যখনই কোন দুঃখ অশান্তি বা অমঙ্গল আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তখন বারে বারে তিনি ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করেছেন। স্বদেশের দুঃখদৈন্যের দিনেও বুদ্ধদেবের কল্যাণ-সুন্দর রূপটি কবির মানসপটে ভেসে ওঠে, তিনি অন্তরে ভরসা লাভ করেন। বুদ্ধদেবের আদর্শকেই তিনি বারবার জাতির সম্মুখে তুলে ধরেছেন। বুদ্ধের বাণীতে একদিন ভারতবর্ষ নিজের মধ্যে সার্থকতা অনুভব করেছে; আবার ভারতের মহিমা বিস্তার লাভ করেছে সমগ্র পৃথিবীতে। বর্তমানের চরম

---

[৬৮] বুদ্ধদেব, পৃ. ৮—৯
[৬৯] ভারততীর্থ, 'গীতাঞ্জলি'

দুর্গতির দিনেও কবি বিশ্বাস করেন, অমিতায়ু অমিতাভের বোধনমন্ত্র আত্মবিস্মৃত জাতির মৃতপ্রায় চিত্তে আবার নূতন প্রাণসঞ্চার করবে। তাই নবভারত রচনার স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে সম্বোধন করে বলেছেন—

চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান্।
খুলে যাক রুদ্ধদ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত-অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শত কণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি—
এনে দিক অজেয় আহ্বান।[৩০]

স্বদেশের দুঃখদৈন্যের দিনে যেমন রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে স্মরণ করেছেন তেমনি জগতের হিংসা লোভ ও সংঘাতের দিনে তাঁরই বাণীকে আকুলভাবে কামনা করেছেন। পরস্পরের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষে মানবসভ্যতা আজ এক মহাসংকটের সম্মুখীন। দুই দুটি মহাযুদ্ধের ক্রূর বীভৎস অমানুষিকতা কবি আপন জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন। দেখেছেন রণোন্মাদ জাতিসমূহ ললাটে রক্ততিলক ধারণ করে নরমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত। সবচেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস এরাই আবার সিদ্ধির আশায় দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে পূজা দেয়!—

ধূপ জ্বলল, ঘণ্টা বাজল, প্রার্থনার রব উঠল আকাশে
'করুণাময়, সফল হয় যেন কামনা'—
কেননা, ওরা যে জাগাবে মর্মভেদী আর্তনাদ
অভ্রভেদ করে,
ছিঁড়ে ফেলবে ঘরে ঘরে ভালোবাসার বাঁধনসূত্র,
ধ্বজা তুলবে লুপ্ত পল্লীর ভস্মস্তূপে,
দেবে ধুলোয় লুটিয়ে বিদ্যানিকেতন,
দেবে চুরমার করে সুন্দরের আসনপীঠ।
তাই তো চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের নিতে আশীর্বাদ।[৩১]

রবীন্দ্রনাথ আরেক জায়গায় গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, 'অনন্ত-

---

[৩০] বুদ্ধদেবের প্রতি (২৪ অক্টোবর ১৯৩১, সারনাথে মূলগন্ধকুটীবিহার প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে রচিত)

[৩১] 'পত্রপুট'—১৭ সংখ্যক কবিতা (১৯৩৭)। এ কবিতার ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ 'নবজাতক'-এর 'বুদ্ধভক্তি' কবিতা। এ কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধমন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে; ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।"

কারুণিক বুদ্ধ তো এই পৃথিবীতেই পা দিয়েছেন তবু এখানে নরকের শিখা নিবল না'।[৬২] কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কবি বিশ্বাস করেন, আজকের হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে বুদ্ধের বাণীই মানুষের মুক্তিপথের সন্ধান দিতে পারে। তাই এই ভয়াবহ যুদ্ধনিনাদের মধ্যে কবি আকুলভাবে বুদ্ধের পুনরাবির্ভাব কামনা করেছেন।—

নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।[৬৩]

রবীন্দ্রনাথ চিরদিন মহত্তের পূজারী। জগতে যত মহৎ আছে সবার কাছে তিনি আপনাকে নত করেছেন। কিন্তু মানব-ইতিহাসের মধ্যে বুদ্ধদেবের মহত্ত্ব তাঁকে যেমন আকৃষ্ট করেছে তেমন আর কারো নয়। তাই কবির অন্তরের বেদীতে ভগবান বুদ্ধ চিরদিন অম্লানদীপ্তিতে বিরাজমান। আর রবীন্দ্র-সাহিত্যে বুদ্ধমহিমা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে তার তুলনা বিরল। আধুনিক বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে অনেকেই বুদ্ধদেব সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং বুদ্ধচরিতকে কাব্য-নাটকের উপজীব্য করেছেন। কিন্তু কাব্য নাটক ও মননের সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধমহিমাকে যে বিশিষ্টতা দান করেছেন তার তুলনা নেই। আমাদের জাতীয় চিত্তে ভগবান বুদ্ধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিসীম।

গ। অশোক : প্রবন্ধে

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে মৌর্যসম্রাট অশোকের নাম অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। বুদ্ধদেব তথা বৌদ্ধধর্মের আদর্শ যেমন তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করেছে তেমনি বৌদ্ধধর্মের মাহাত্ম্যকেও তিনি দেশে দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত করেছেন। বস্তুত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে একমাত্র বুদ্ধদেবকে বাদ দিলে দেবপ্রিয় অশোকের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি।[৬৪] রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আর ভগবান বুদ্ধের বাণীকে জীবনে গ্রহণ করে যিনি তাঁর রাজশক্তিকে মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করেছেন, ভারত-ইতিহাসের

[৬২] নটীর পূজা (মালতীর উক্তি), রচনাবলী (প-ব সরকার) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯১১
[৬৩] বুদ্ধজন্মোৎসব (১৯২৭), 'পরিশেষ'
[৬৪] D. R. Bhandarkar, *Asoka* (Third Edition), p. 217

সেই মহান নায়ক অশোককে তিনি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই রবীন্দ্রসাহিত্যে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের আলোচনাপ্রসঙ্গে বৌদ্ধসম্রাট অশোকের আলোচনা অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটক প্রবন্ধ ও সংগীতধারায় বুদ্ধদেবের চরিত্রমহিমা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, একমাত্র প্রবন্ধসাহিত্য ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটক ও গানে কোথাও অশোকের উল্লেখ পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'কথা' (১৯০০) কাব্যখানি ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। এখানে উপনিষদের যুগ থেকে আরম্ভ করে শিখ-মারাঠার যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন কালের হৃদ্‌স্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে। ভারতবর্ষের শৌর্য-বীর্য, ত্যাগ ও মহত্ত্বের আদর্শ এর অন্তর্গত গাথা-কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে এক অপরূপ সৌন্দর্যে প্রকাশিত। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম। 'কথা' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সুনিপুণ মালাকারের পুষ্পচয়নের ন্যায় বৌদ্ধযুগের উপাখ্যান থেকেও কয়েকটি গাথাকবিতার উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এর অন্তর্গত শ্রেষ্ঠভিক্ষা, নগরলক্ষ্মী, পূজারিণী, অভিসার প্রভৃতি কবিতায় বৌদ্ধযুগের ত্যাগ, মৈত্রী ও মানবতার বাণী অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। দুয়েকটি কবিতায় স্বয়ং বুদ্ধদেবের চরিত্রমহিমা উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। আর যে রাজভিক্ষু অশোক ভগবান বুদ্ধের 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায়' বাণীকে জীবনের মূল ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন, যিনি বুদ্ধদেবের বিশ্বপ্রেমের বাণীকে পৃথিবীর দূর-দূরান্তে প্রেরণ করেছেন, বুদ্ধদেবের সেই শ্রেষ্ঠতম উত্তরসাধক সম্বন্ধে 'কথা' কাব্যগ্রন্থে উল্লেখমাত্র পাওয়া যায় না। 'কথা' কাব্যের পরেও রবীন্দ্রনাথ যে সকল কাব্য নাটকাদি রচনা করেছেন সেখানেও অশোকের উল্লেখ নেই। একদিক্ থেকে দেখতে গেলে আমাদের দেশে বৌদ্ধকাহিনী ও বৌদ্ধ ভাবাদর্শের পরিচয়-সাধনে রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটকাদির প্রভাব অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে মালিনী, নটীর পূজা, চণ্ডালিকা ও শ্যামা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অশোকের জীবনের কাহিনী নিয়েও রবীন্দ্রনাথ নাটকাদি রচনা করতে পারতেন। অশোকের জীবনে অন্তত নাটকীয় উপাদানের অভাব নেই। ইতিপূর্বে ক্ষীরোদপ্রসাদ ও গিরিশ-চন্দ্র-প্রমুখ নাট্যকারগণ অশোকচরিত অবলম্বন করে নাটক রচনা করেছেন। 'বিসর্জন' নাটকে দেখা যায়, ক্ষুদ্র ছাগশিশুর কাতরক্রন্দন রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে উদ্রিক্ত করে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত করেছে। আর কলিঙ্গযুদ্ধে নৃশংস চণ্ডাশোক রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে একদিন যে মর্মান্তিক অনুশোচনায় এই অস্ত্রবিজয়ের পথ পরিহার করে ধর্মবিজয়ের আদর্শ অবলম্বন করেছিলেন, এই ভাবধারাও রবীন্দ্রনাথকে নাটক রচনার প্রেরণা দান করে নি। হয়তো এমনও

হতে পারে যে, অশোকচরিত অবলম্বন করে ইতিপূর্বে নাটক রচিত হয়েছে বলে তিনি আর নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন নি। সে যাই হক না কেন, আসল কথা হল রবীন্দ্রনাথ অশোকের জীবন নিয়ে কোন নাটক কিংবা কবিতা রচনা করেন নি। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় যথার্থই লক্ষ্য করেছেন—

> রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই ঐতিহাসিক উপকথা অবলম্বনেই গাথানাটকাদি রচনা করেছেন, ইতিহাসের প্রধান চরিত্র বা মূল আখ্যানকে কখনও অবলম্বন করেন নি।...ইতিহাসের মূলধারা বা প্রধান চরিত্র তাঁর চিন্তাকে উদ্রিক্ত করেছে এবং সময়বিশেষে প্রবন্ধ-রচনার উপাদান জুগিয়েছে, কিন্তু কাব্য নাট্যাদি রচনায় প্রবৃত্ত করে নি।[৩৩]

অশোক সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ এই নীতি অনুসরণ করেছেন। তিনি ঐতিহাসিক প্রজ্ঞার আলোকেই অশোকচরিত্রের মূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছেন। এখানে কবি-কল্পনার চেয়ে ঐতিহাসিক চেতনা অধিক সক্রিয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে অশোকচরিতের প্রতি ঐতিহাসিকদের আগ্রহ সর্বাপেক্ষা বেশি। কিন্তু অনেক কাল ধরে অশোকের ঐতিহাসিক পরিচয় গল্প ও কিংবদন্তীর কুহেলিকায় আচ্ছন্ন ছিল। প্রাচীন ভারতীয় ও সিংহলী সাহিত্যে অশোকের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত। বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধনৃপতি অশোককে গৌরবদান করার অভিপ্রায়ে বৌদ্ধসমাজ অশোকের সম্বন্ধে কতকগুলি অবান্তর কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে একটি বহুল-প্রচলিত কাহিনী হল, প্রথম জীবনে অশোক অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন এবং নিরানব্বই জন ভাইকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। তারপর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর এই 'চণ্ডাশোক' হলেন 'ধর্মাশোক'। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এসকল কাহিনীর সত্যতা স্বীকার করেন না।[৩৪] তবে আমাদের দেশে মহাপুরুষদের সম্বন্ধে এরকম অলীক কাহিনীর অভাব নেই। এসকল অপ্রাকৃত কাহিনী আদিকবি বাল্মীকিকে দস্যুতে পরিণত করেছে, মহাকবি কালিদাসকে মহামূর্খ সাজিয়েছে। শুধু আমাদের দেশে কেন, সকল দেশেই মহাপুরুষদের সম্বন্ধে এরকম কাহিনী অল্পবিস্তর প্রচলিত আছে। এর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত মনে হয় খ্রীষ্টের জীবনকাহিনী। খ্রীষ্টকে অত্যধিক মাহাত্ম্য দান করতে গিয়ে খ্রীষ্টসমাজ তাঁর উপর অনেক অলৌকিক কাহিনী আরোপ করেছেন।

---

[৩৩] রবীন্দ্রদৃষ্টিতে অশোক, 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ৭০-৭১

[৩৪] V. A. Smith, *Asoka, the Buddhist Emperor of India* (2nd Edition), p. 23

একদিক্ থেকে বাল্মীকি, কালিদাস ও খ্রীষ্টের চেয়ে অশোক বেশি ভাগ্যবান। কেননা তিনি নিজের পরিচয়কে অক্ষয় পাথরের গায়ে লিখে রেখে গেছেন। অশোকের উৎকীর্ণ এই শিলালিপিগুলি ঐতিহাসিকদের পক্ষে অশোকচরিত্রের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান দলিল। কিন্তু অশোকলিপির ভাষা বহু-কাল ধরে মানুষের আয়ত্তের বাইরে ছিল। সেজন্য অশোকের বাণী শত শত বৎসর ধরে মানবহৃদয়কে কেবল বোবার মত ইশারায় আহ্বান করেছে। অশোক-লিপি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ অশোক আপনার যে কথাগুলিকে চিরকালের শ্রুতিগোচর করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদিগকে তিনি পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া দিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, পাহাড় কোনো-কালে মরিবে না, সরিবে না, অনন্তকালের পথের ধারে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া নব নব যুগের পথিকদের কাছে এক কথা চিরদিন ধরিয়া আবৃত্তি করিতে থাকিবে। পাহাড়কে তিনি কথা কহিবার ভার দিয়া-ছিলেন।
>
> পাহাড় কালাকালের কোনো বিচার না করিয়া তাঁহার ভাষা বহন করিয়া আসিয়াছে। কোথায় অশোক, কোথায় পাটলিপুত্র, কোথায় ধর্মজাগ্রত ভারতবর্ষের সেই গৌরবের দিন! কিন্তু পাহাড় সেদিনকার সেই কথা-কয়টি বিস্মৃত অক্ষরে অপ্রচলিত ভাষায় আজও উচ্চারণ করিতেছে। কতদিন অরণ্যে রোদন করিয়াছে! অশোকের সেই মহা-বাণীও কত শত বৎসর মানবহৃদয়কে বোবার মতো কেবল ইশারায় আহ্বান করিয়াছে! পথ দিয়া রাজপুত গেল, পাঠান গেল, মোগল গেল, বর্গির তরবারি বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্রবেগে দিগ্‌দিগন্তে প্রলয়ের কশাঘাত করিয়া গেল—কেহ তাহার ইশারায় সাড়া দিল না। সমুদ্র-পারের যে ক্ষুদ্র দ্বীপের কথা অশোক কখনো কল্পনাও করেন নাই, তাঁহার শিল্পীরা পাষাণফলকে যখন তাঁহার অনুশাসন উৎকীর্ণ করিতেছিল তখন যে দ্বীপের অরণ্যচারী 'দ্রুয়িদ'গণ আপনাদের পূজার আবেগ ভাষাহীন প্রস্তরস্তূপে স্তম্ভিত করিয়া তুলিতেছিল, বহু সহস্র বৎসর পরে সেই দ্বীপ হইতে একটি বিদেশী আসিয়া কালান্তরের সেই মূক ইঙ্গিতপাশ হইতে তাহার ভাষাকে উদ্ধার করিয়া লইলেন। রাজচক্রবর্তী অশোকের ইচ্ছা এত শতাব্দী-পরে একটি বিদেশীর সাহায্যে সার্থকতা লাভ করিল। সে ইচ্ছা আর কিছুই নহে, তিনি যত বড়ো সম্রাট্ই হউন, তিনি কী চান কী না চান, তাঁহার কাছে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ, তাহা পথের

পথিককেও জানাইতে হইবে। তাঁহার মনের ভাব এত যুগ ধরিয়া সকল মানুষের মনের আশ্রয় চাহিয়া পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। রাজ-চক্রবর্তীর সেই একাগ্র আকাঙ্ক্ষার দিকে পথের লোক কেহ বা চাহিতেছে, কেহ বা না চাহিয়া চলিয়া যাইতেছে।[৬৭]

অশোকলিপি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে কাব্যের ব্যঞ্জনা ও ইতিহাসের সত্য একসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। এই অংশটুকু পড়বার পর রবীন্দ্রনাথ অশোকের উপর কবিতা রচনা করেন নি বলে আর আক্ষেপ থাকে না। আর রবীন্দ্রনাথ অশোক-ইতিহাসের মূল উপাদান অশোকের শিলালিপির পাঠোদ্ধারের বিবরণ সম্বন্ধেও যে আগ্রহ পোষণ করতেন তা এখানে সুস্পষ্ট।

সমুদ্রপারের ক্ষুদ্র দ্বীপের যে একজন বিদেশী এসে কালান্তরের মূক ইঙ্গিতপাশ হতে অশোকলিপির ভাষাকে উদ্ধার করেছেন, তিনি হলেন ইংরেজ মনীষী জেমস্ প্রিন্সেপ (১৭৯৯—১৮৪০)। অশোকলিপি প্রসঙ্গে এই মনীষীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি ১৮৩৪ সাল থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত বিশেষ পরিশ্রম করে এই প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধারে সফলকাম হয়েছেন।[৬৮] এর পর থেকে অশোকলিপিকে অবলম্বন করে বহু মনীষী অশোকের জীবনের উপর নানা দিক্ থেকে আলোকপাত করেছেন। বস্তুত ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে অশোক সম্বন্ধে দেশবিদেশের সুধীবৃন্দ কর্তৃক দীর্ঘকাল ধরে যে আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে এমন আর-কিছু সম্বন্ধে হয় নি। বাংলাভাষাতেও অশোক সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে তা পরিমাণে কম হলেও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। কৃষ্ণবিহারী সেনের 'অশোকচরিত' (১৮৯২) বাংলাভাষায় রচিত অশোক সম্বন্ধে প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এ ছাড়া চারুচন্দ্র বসুর 'অশোক বা প্রিয়দর্শী' (১৯১১), সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোক' (১৯৪০) এবং প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ধর্মবিজয়ী অশোক' (১৯৪৭) গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থের শেষভাগেও অশোক সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ঐতিহাসিক আলোচনা দেখা যায়।

২

রবীন্দ্রসাহিত্যে অশোকের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 'ব্যঙ্গকৌতুক' গ্রন্থের 'সারবান সাহিত্য' (১৮৯১) নামক প্রবন্ধে। বাংলাসাহিত্যে সারবান

---

[৬৭] সাহিত্যের সামগ্রী (১৯০৩), 'সাহিত্য'

[৬৮] ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ৭৪

পদার্থের অভাব প্রসঙ্গে কবি এখানে পরিহাস করে বলেছেন—

> কফ পিত্ত ও বায়ু-বৃদ্ধির পক্ষে দিশি কুমড়া ও বিলাতি কুমড়ার মধ্যে কোনো প্রভেদ আছে কিনা, অশোক এবং হর্ষবর্ধনের মধ্যে কে আগে কে পরে—আমাদের অগণ্য কাব্য-নাটকের মধ্যে এ-সকল সারগর্ভ বিশ্বহিতকর প্রসঙ্গের কোনো মীমাংসা পাওয়া যায় না।

বলা বাহুল্য, এই উক্তি থেকে অশোক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কিছুই বুঝতে পারা যায় না। অশোক সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট মনোভাব প্রকাশ পায় আরো অনেককাল পরে বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিক্ থেকে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই সময়ে ভিনসেন্ট স্মিথ এবং রিস্ ডেভিড্‌সের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-দুখানিও প্রকাশিত হয়। এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে অশোকের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধদেব ব্যতীত আর কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিই অশোকের মত রবীন্দ্রনাথের এমন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রশস্তি লাভ করতে পারেন নি।

কোন সময়ে দেশে এমন দিন আসে যখন একজন মহাপুরুষের মধ্য দিয়ে সমগ্র দেশ প্রকাশলাভ করে। রাজচক্রবর্তী অশোকের মধ্য দিয়ে তেমনি একবার ভারতবর্ষের ধর্ম ও সমাজজীবনের সংহত প্রকাশ হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> দেশে এক-একটা বড়ো দিন আসে, সেই দিন বড়ো লোকের তলবে দেশের সমস্ত সালতামামি নিকাশ বড়ো খাতায় প্রস্তুত হইয়া দেখা দেয়। রাজচক্রবর্তী অশোকের সময়ে একবার বৌদ্ধসমাজের হিসাব তৈরি হইয়াছিল।[৬৯]

রাজচক্রবর্তী অশোকের সময়ে ভারতবর্ষে সত্যই একটা 'বড়ো দিন' এসেছিল। আর 'বড়ো খাতায়' তার হিসাবও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সে হিসাব শুধু বৌদ্ধসমাজের নয়, সমগ্র ভারতীয় সমাজের। কেননা রাজ্যের মধ্যে তিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রতিভূপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্প্রদায়নির্বিশেষে রাজ্যের সকল মানুষের মঙ্গলসাধনই ছিল তাঁর ব্রত। অশোকের দ্বাদশ শিলানুশাসনে উক্ত হয়েছে—

> দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা প্রব্রজিত ও গৃহস্থ সর্বসম্প্রদায়কেই পূজা করেন, দানের দ্বারা ও অন্য বিবিধ উপায়েই পূজা করেন। কিন্তু দান বা পূজাকে দেবগণের প্রিয় সেরূপ মনে করেন না, যেরূপ মনে করেন সর্বসম্প্রদায়ের সারবৃদ্ধিসাধনকে।[৭০]

---

[৬৯] স্বদেশী সমাজ (১৯০৪), 'আত্মশক্তি'
[৭০] অমূল্যচন্দ্র সেন, 'অশোকলিপি', পৃ. ৮১

অশোকের অনুসৃত সক্রিয় উদার ধর্মনীতিতে এই শিলানুশাসন মানুষের ধর্মীয় ইতিহাসে এক মহামূল্যবান দলিল।[৭১] আর অশোকের এই ধর্মীয় নীতির মধ্যেই বর্তমান ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার বীজ নিহিত।

মহাসম্রাট অশোক তাঁর রাজশক্তিকে পররাজ্যগ্রাসে কিংবা আপন স্বার্থবিস্তারে নিয়োজিত করেন নি, সকল মানুষের কল্যাণসাধনেই নিযুক্ত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, পশুদের কল্যাণের জন্যও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। রাজচক্রবর্তীর মধ্যে এই মঙ্গলশক্তির প্রকাশ দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অন্তরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন—

> এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাট্ অশোক তাঁহার রাজশক্তিকে ধর্মবিস্তারকার্যে মঙ্গলসাধনকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা যে কী সুতীব্র তাহা আমরা সকলেই জানি; সেই শক্তি ক্ষুধিত অগ্নির মতো গৃহ হইতে গৃহান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে আপনার জ্বালাময়ী লোলুপ রসনাকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যগ্র। সেই বিশ্বলুব্ধ রাজশক্তিকে মহারাজ অশোক মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জন দিয়া তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজত্বের পক্ষে ইহা প্রয়োজন ছিল না—ইহা যুদ্ধসজ্জা নহে, দেশজয় নহে, বাণিজ্যবিস্তার নহে; ইহা মঙ্গলশক্তির অপর্যাপ্ত প্রাচুর্য, ইহা সহসা চক্রবর্তী রাজাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজাড়ম্বরকে এক মুহূর্তে হীনপ্রভ করিয়া দিয়া সমস্ত মনুষ্যত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কত বড়ো বড়ো রাজার বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত বিস্মৃত ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অশোকের মধ্যে এই মঙ্গলশক্তির মহান আবির্ভাব, ইহা আমাদের গৌরবের ধন হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাহা কিছু সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাহার গৌরব হইতে, তাহার সহায়তা হইতে, মানুষ আর কোনোদিন বঞ্চিত হইবে না। আজ মানুষের মধ্যে সমস্ত-স্বার্থজয়ী এই অদ্ভুত মঙ্গলশক্তির মহিমা স্মরণ করিয়া আমরা পরিচিত অপরিচিত সকলে মিলিয়া উৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।[৭২]

যে রাজশক্তির জ্বালাময়ী লোলুপ রসনা সম্রাট অশোককে রাজ্যজয়ে প্রবর্তনা দান করেছিল তা কলিঙ্গবিজয়ের পর সহসা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়।

[৭১] B. M. Barua, *Asoka and His Inscriptions*, Parts I & II (2nd Edition), p. 223

[৭২] উৎসবের দিন (১৯০৫), 'ধর্ম'

নয়তো তিনি পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের মত দিগ্বিজয়ী বীররূপেই পরিচিত হতে পারতেন। কিন্তু কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোক পরম বেদনায় বুঝতে পারলেন যে, এই অস্ত্রবিজয় শ্রেয়ের পথ নয়। তখন থেকে মহারাজ অশোক তাঁর রাজ-শক্তিকে সেবার ব্রতে মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করলেন। সম্রাটের মধ্যে এই মঙ্গল-শক্তির আবির্ভাবে তাঁকে আর ক্ষুদ্র সিংহাসনটুকুর মধ্যে ধরে রাখতে পারল না, মনুষ্যত্বের অম্লান মহিমায় তিনি সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। সমস্ত রাজাড়ম্বরের ঊর্ধ্বে মনুষ্যত্বের এই সমুজ্জ্বল প্রকাশকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের গৌরবের ধন বলে অভিহিত করেছেন।

রাজচক্রবর্তী অশোকের মধ্যে যে মহান শক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, তা একদিকে যেমন তাঁর রাজশক্তিকে মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করে শ্রান্তিহীন সেবার ব্রতকে বরণ করে নিয়েছে, আবার অন্য দিকে এই মঙ্গলশক্তি তাঁকে সৌন্দর্যসৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছে। বুদ্ধগয়ার শিল্পসৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ যে উক্তি করেছেন তার মধ্যে প্রিয়দর্শী অশোকের জীবনের একটি বিশিষ্ট দিক্ উজ্জ্বল মহিমায় প্রকাশ পেয়েছে।

> সৌন্দর্য যেখানেই পরিণতিলাভ করিয়াছে সেখানেই সে আপনার প্রগল্ভতা দূর করিয়া দিয়াছে। সেখানেই ফুল আপনার বর্ণ-গন্ধের বাহুল্যকে ফলের গূঢ়তর মাধুর্যে পরিণত করিয়াছে; সেই পরিণতিতেই সৌন্দর্যের সহিত মঙ্গল একাত্ত হইয়া উঠিয়াছে।
>
> সৌন্দর্য ও মঙ্গলের এই সম্মিলন যে দেখিয়াছে সে ভোগ-বিলাসের সঙ্গে সৌন্দর্যকে কখনোই জড়াইয়া রাখিতে পারে না। তাহার জীবনযাত্রার উপকরণ সাদাসিধা হইয়া থাকে; সেটা সৌন্দর্য-বোধের অভাব হইতে হয় না, প্রকর্ষ হইতেই হয়। অশোকের প্রমোদ-উদ্যান কোথায় ছিল? তাঁহার রাজবাটির ভিতের কোনো চিহ্নও তো দেখিতে পাই না। কিন্তু অশোকের রচিত স্তূপ ও স্তম্ভ বুদ্ধগয়ায় বোধিবটমূলের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার শিল্পকলাও সামান্য নহে। যে পুণ্যস্থানে ভগবান্ বুদ্ধ মানবের দুঃখনিবৃত্তির পথ আবিষ্কার করিয়াছেন রাজচক্রবর্তী অশোক সেইখানেই, সেই পরমমঙ্গলের স্মরণক্ষেত্রেই, কলাসৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিজের ভোগকে এই পূজার অর্ঘ্য তিনি এমন করিয়া দেন নাই।[৭০]

বলা বাহুল্য, অশোক শুধু বুদ্ধগয়ায় নয়, বুদ্ধদেবের স্মৃতিপূত প্রতিটি

[৭০] সৌন্দর্যবোধ (১৯০৬), 'সাহিত্য'

স্থানেই কলাসৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এভাবেই তিনি পরমমঙ্গলের স্মরণক্ষেত্রে আপনার প্রণামকে রেখে গিয়েছেন। আর ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যে ভোগবিলাসকে বর্জন করে অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাকে বরণ করে নিয়েছিলেন, সেকথা বলবার অপেক্ষা রাখে না। এদিক্ থেকে তিনি প্রকৃত রাজর্ষি। রবীন্দ্রসাহিত্যে যে ভারতীয় আদর্শ নৃপতির মহিমা বর্ণিত হয়েছে তাতেও দেখা যায় মানবকল্যাণে নিয়োজিত সর্বত্যাগী রাজসন্ন্যাসীর চিত্র।—

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ; . . .

. . . . .

ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল।[৭৭]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের আদর্শ নৃপতি হিসাবে গোবিন্দমাণিক্য, বিক্রমাদিত্য, কোশলরাজ ও শিবাজীর উল্লেখ করা যেতে পারে। বস্তুত 'রাজর্ষি' উপন্যাসে গোবিন্দমাণিক্যের উক্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম সত্যই ব্যক্ত হয়েছে।—

> রাজা পাইতে চাও তো সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করো, সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ করো, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন করো —এ যে করে সেই রাজা, সে পর্ণকুটিরেই থাক্ আর প্রাসাদেই থাক্। যে ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে, সকল লোক তো তাহারই। পৃথিবীর দুঃখহরণ যে করে সেই পৃথিবীর রাজা। পৃথিবীর রক্ত ও অর্থ শোষণ যে করে সে তো দস্যু।

এদিক্ থেকে বিচার করতে গেলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অশোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ রাজর্ষি আর কে আছে! তিনি যথার্থই সহস্র সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার করে নিয়েছেন, মানুষের কল্যাণসাধনের দুঃসাধ্য ব্রতকেই জীবন দিয়ে গ্রহণ করেছেন। 'রাজর্ষি' উপন্যাস রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের মনে অশোকের আদর্শ জাগ্রত থাকা অসম্ভব নয়।

---

[৭৭] 'নৈবেদ্য', ৯৪ সংখ্যক কবিতা

৩

১৯১২ সালে ইউরোপযাত্রার প্রাক্‌কালে রবীন্দ্রনাথ 'যাত্রার পূর্বপত্র' প্রবন্ধে ইউরোপের দুঃখপ্রদীপ্ত সেবাপরায়ণ প্রেমের কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে ভারতবর্ষের বৌদ্ধযুগের উল্লেখ করে বলেছেন—

> বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ যখন প্রেমের সেই ত্যাগধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছিল তখনি সমাজে তাহার এমন একটি বিকাশ ঘটিয়াছিল যাহা য়ুরোপে সম্প্রতি দেখিতেছি। রোগীদের জন্য ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা, এমন-কি পশুদের জন্যও চিকিৎসালয় এখানে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং জীবের দুঃখনিবারণের চেষ্টা নানা আকার ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছিল; তখন নিজের প্রাণ ও আরাম তুচ্ছ করিয়া ধর্মাচার্যগণ দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইয়া পরদেশীয় ও বর্বরজাতীয়দের সদ্‌গতির জন্য দলে দলে এবং অকাতরে দুঃখ বহন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সেদিন প্রেম আপনার দুঃখরূপকে বিকাশ করিয়াই ভক্তগণকে বীর্যবান মহৎ মনুষ্যত্বের দীক্ষা দান করিয়াছিল। সেইজন্যই ভারতবর্ষ সেদিন ধর্মের দ্বারা কেবল আপনার আত্মা নহে, পৃথিবীকে জয় করিতে পারিয়াছিল এবং আধ্যাত্মিকতার তেজে ঐহিক পারত্রিক উন্নতিকে একত্র সম্মিলিত করিয়াছিল। তখন য়ুরোপের খৃস্টান সভ্যতা স্বপ্নের অতীত ছিল। ভারতবর্ষের সেই দুঃখব্রত আত্মত্যাগপরায়ণ প্রেমের উজ্জ্বল দীপ্তি কৃত্রিমতা ও ভাবরসাবেশের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহা কি নির্বাপিত হইয়াছে?[১১]

এখানে অশোকের নাম উল্লেখ করা না হলেও ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগ বলতে যে অশোকের রাজত্বকালকেই বলা হয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই। উদ্‌ধৃত অংশটুকু পড়লে মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে অশোকলিপির বাণীই নবরূপে প্রকাশলাভ করেছে। অশোকের দ্বিতীয় শিলানুশাসনে বলা হয়েছে—

> দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার রাজ্যে সর্বত্র এবং প্রত্যন্ত দেশে যেখানে চোলগণ পান্ড্যগণ সত্যপুত্রগণ কেরলপুত্রগণ, তাম্রপর্ণী পর্যন্ত, অন্তিয়ক যোন রাজা এবং অন্তিয়কের সমীপস্থ যে রাজারা আছেন—সর্বত্র মানুষ ও পশুর জন্য দ্বিবিধ চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানুষ ও পশুর উপযোগী ওষধি যেখানে যেখানে নেই, সেখানে তা আহরণ ও রোপণ করা হয়েছে। ফলমূলও যেখানে যা

[১১] যাত্রার পূর্বপত্র, 'পথের সঞ্চয়'

> নেই সেখানে তা আহরণ ও রোপণ করা হয়েছে। পশু ও মানুষের পরিভোগের জন্য পথিমধ্যে কূপখনন ও বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।[৭৬]

সর্বমানবের ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতিসাধনকে যে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন সেকথাও তাঁর একাধিক শিলালিপিতে স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পৃথক কলিঙ্গ শিলানুশাসনে তিনি বলেছেন—

> সর্ব মনুষ্যগণ আমার সন্তান। যেমন সন্তান সম্বন্ধে আমি ইচ্ছা করি যে তারা আমার দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব হিতসুখে যুক্ত হউক, সকল মানুষ সম্বন্ধেও আমার সেইরূপই ইচ্ছা।[৭৭]

দেবপ্রিয় অশোক ধর্মবিজয়কে যে শ্রেষ্ঠ বিজয় মনে করতেন সেকথাও তাঁর শিলালিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে।[৭৮] তাঁর প্রেরিত ধর্মাচার্যগণ একদিন দূরবাসী অনাত্মীয়জনকেও 'আত্মার অমৃত-অন্ন' দান করার জন্য দিকে দিকে অভিযান করেছিলেন। আর এঁদের আত্মত্যাগ ও দুঃখবহনের ফলে বর্বর জাতীয়দেরও যে সদ্গতি সাধিত হয়েছিল সেকথা ইংরেজ ঐতিহাসিক এল. জে. সন্ডারস্-এর উক্তি থেকেও সমর্থিত হবে।—

> The missions of King Asoka are amongst the greatest civilizing influences in the world's history; for they entered countries for the most part barbarous and full of superstitions and amongst these animistic peoples Buddhism spread as a wholesome leaven.[৭৯]

অর্থাৎ, পৃথিবীর ইতিহাসে মানবসভ্যতার অগ্রগতির মূলে অশোকের ধর্মপ্রচার অন্যতম প্রধান কীর্তি। তাঁর প্রেরিত ধর্মদূতগণ যেসকল দেশে অভিযান করেছিলেন তার অধিকাংশই ছিল বর্বর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এসকল মানুষের জীবনে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ কল্যাণপ্রদ হয়েছিল।

আর অশোকের সময়ে ভারতবর্ষ প্রেমের ত্যাগধর্মকে বরণ করে নেওয়ার ফলে যে সামাজিক বিকাশ হয়েছিল তা সম্প্রতি ইউরোপের খ্রীষ্টীয় বদান্যতা ও সেবাপরায়ণতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু এখানে আর-একটা কথা বলবার অপেক্ষা রাখে। খ্রীষ্টীয় ধর্মাচার্যদের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অনেক স্থানে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যশক্তি ও বাণিজ্যবিস্তারের আকাঙ্ক্ষাও সক্রিয় ছিল।

---

[৭৬] অমূল্যচন্দ্র সেন, 'অশোকলিপি', পৃ. ৫৮-৫৯

[৭৭] অশোকলিপি, পৃ. ৯০, ৯৯

[৭৮] ত্রয়োদশ শিলানুশাসন, 'অশোকলিপি', পৃ. ৮৫

[৭৯] *The Story of Buddhism* (1916), p. 76; প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৮৪

বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের মূলে এই পার্থক্য সামান্য নয়। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন—

> ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-রাজাদের অধীনে বিদেশে আপন ধর্ম প্রেরণ করিয়াছে, আপন স্বার্থ বিস্তার করে নাই। ভারতবর্ষীয় সভ্যতায় বিনাশপ্লাবনের বেগ কোনোকালে ছিল না। ক্ষমতা ও স্বার্থবিস্তার ভারতবর্ষীয় সভ্যতার ভিত্তি নহে।[২০]

এখানেও বৌদ্ধরাজা বলতে প্রধানত অশোকের কথাই বলা হয়েছে।

বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে অর্থাৎ সম্রাট অশোকের সময় ও তৎপরবর্তী যুগে ভারতবর্ষ প্রেমের ত্যাগধর্মকে গ্রহণ করে মানবকল্যাণের জন্য অকাতরে যে দুঃখবহন করেছে, সেই বীর্যবান প্রেমের আবেগে জীবনের সকল ক্ষেত্র পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করেছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনোকালে হয় নাই।
>
> তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি। পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনোদিকেই মানুষকে খর্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।[২১]

এর অনেক কাল পরে ১৯৩৫ সালে কলকাতায় শ্রীধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে তিনি যে ভাষণ দান করেন, তাতেও বুদ্ধদেব ও অশোকের ধর্মপ্রেরণার প্রভাব সম্বন্ধে কবির এই মনোভাব আরো উজ্জ্বল-দীপ্তিতে প্রকাশ পেয়েছে।—

> ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের। মানব-ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশে দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেননা বুদ্ধের

[২০] স্বদেশ (১৯০২), 'ভারতবর্ষ'
[২১] মানুষের পূর্ণপথ (১৯১২), 'পথের সঞ্চয়'

বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে।...তিনি এসেছিলেন সকল মানুষের জন্যে, সকল কালের জন্যে। তিনি মানুষের কাছে সেই প্রকাশ চেয়েছিলেন, যা দুঃসাধ্য, যা চিরজাগরূক, যা সংগ্রামজয়ী, যা বন্ধনচ্ছেদী। তাই সেদিন পূর্ব মহাদেশের দুর্গমে দুস্তরে বীর্যবান পূজার আকারে প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর জয়ধ্বনি, শৈলশিখরে, মরুপ্রান্তরে, নির্জন গুহায়। এর চেয়ে মহত্তর অর্ঘ্য এল ভগবান বুদ্ধের পদমূলে যেদিন রাজাধিরাজ অশোক শিলালিপিতে প্রকাশ করলেন তাঁর পাপ, অহিংস্র ধর্মের মহিমা ঘোষণা করলেন, তাঁর প্রণামকে চিরকালের প্রাঙ্গণে রেখে গেলেন শিলাস্তম্ভে। এত বড়ো রাজা কি জগতে আর কোনো দিন দেখা দিয়েছে![৭২]

ভগবান বুদ্ধের বাণীকে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে যিনি দেশে দেশান্তরে ব্যাপ্ত করেছিলেন তিনি তো রাজাধিরাজ অশোক। আর বুদ্ধদেবের বাণীতে ভারতবর্ষ যে সকল মানুষকে স্বীকার করেছে তাকেও তিনি বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। বস্তুত নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে সম্রাট অশোক যে দুঃসাধ্য কল্যাণব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, হিংসার পরিবর্তে যে অহিংসা ও মৈত্রীর আদর্শকে বরণ করে নিয়েছিলেন, এর দ্বারাই তিনি ভগবান বুদ্ধের পদমূলে শ্রেষ্ঠতম অর্ঘ্য দান করেছেন। শৈলশিখরে, মরুপ্রান্তরে ও নির্জন গুহায় বুদ্ধদেবের উদ্দেশে পূজা নিবেদন করে যে কর্মকীর্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তার চেয়ে সর্বলোকের কল্যাণচিন্তায় নিয়োজিত অশোকের নিষ্কাম সেবার আদর্শ ও চিত্তমার্জনার ব্রত আরো দুঃসাধ্য ও মহত্তর। মহত্তের পূজারী রবীন্দ্রনাথ তাই অশোককে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নৃপতি বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বাস্তবিক জগতে এত বড় রাজা আর কোন দিন দেখা যায় নি। পৃথিবীর ইতিহাসে অশোকের স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌ বলেছেন—

> Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of history, the name of Asoka shines, and shines almost alone, a star. From the Volga to Japan his name is still honoured. China, Tibet...preserve the tradition of his greatness. More living men cherish his memory to-day than have ever heard the names of Constantine or Charlemagne.[৭৩]

---

[৭২] বুদ্ধদেব (১৯৩৫), 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে সংকলিত, পৃ. ৬-৮

[৭৩] H. G. Wells, *The Outline of History* (Vol. I), p. 269

অর্থাৎ, যে সহস্র সহস্র নৃপতিবৃন্দের নাম পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভারাক্রান্ত করেছে, তাঁদের মধ্যে অশোকের নাম প্রায় একক মহিমায় উজ্জ্বল এক জ্যোতিষ্কের ন্যায় দীপ্তিমান। ভল্‌গা থেকে জাপান পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডের সংখ্যাতীত নরনারী অশোকের নাম আজও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে। চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে তাঁর মহান ঐতিহ্যের নিদর্শন এখনো বিরাজিত। তাঁর পুণ্যময় নাম অদ্যাপি যতলোকের মুখে কীর্তিত হয়ে থাকে, ততলোক কনস্টান্টাইন বা সার্লামেনের নামও শোনে নি।

৪

ধর্মীয় উদারতা ও সুশাসনের জন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে মোগলসম্রাট আকবরের একটি বিশেষ স্থান আছে। রবীন্দ্রনাথ সেজন্য আকবরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। অশোক ও আকবরকে একত্রে উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> বৌদ্ধযুগের অশোকের মতো মোগলসম্রাট আকবরও কেবল রাষ্ট্র-সাম্রাজ্য নয়, একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। এইজন্যই সে সময়ে পরে পরে কত হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফির অভ্যুদয় হইয়াছিল যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতম মিলনক্ষেত্রে এক মহেশ্বরের পূজা বহন করিয়াছিলেন। এবং এমনি করিয়াই বাহিরের সংসারের দিকে যেখানে অনৈক্য ছিল, অন্তরাত্মার দিকে পরম সত্যের আলোকে সেখানে সত্য অধিষ্ঠান আবিষ্কৃত হইতেছিল।[৮৮]

আকবরের প্রসঙ্গে এখানে রবীন্দ্রনাথের মনে অশোকের ধর্মবিজয়ের কথাই উদিত হয়েছে। বস্তুত এদিক্ থেকে অশোক ও আকবরের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। ধর্মীয় উদারতার ক্ষেত্রে এই দুই মহান নৃপতির মধ্য দিয়ে যেন ভারতবর্ষের চিরন্তন সত্যস্বরূপ অভিব্যক্ত হয়েছে।[৮৯] প্রিয়দর্শী অশোক যেমন রাজ্যের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের সারবৃদ্ধি কামনা করতেন, আকবরও তেমনি হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখতেন। পূর্বে হিন্দুদের উপর যে জিজিয়া কর আরোপ করা হয়েছিল আকবরই তা উঠিয়ে দেন। এ ছাড়া তিনি হিন্দুদের উচ্চ রাজকার্যেও নিযুক্ত করেন। তিনি যে ইবাদতখানা বা উপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন তা ছিল সকল সম্প্রদায়ের এক

[৮৮] স্বাধিকারপ্রমত্তঃ (১৯১৮), 'কালান্তর'

[৮৯] Jawaharlal Nehru, *Glimpses of World History* (4th Edition), p. 306

উদার ও প্রশস্ত মিলনক্ষেত্র। সর্বধর্মের সার অবলম্বনে রচিত আকবরের দীন-ই-ইলাহি ধর্মের আদর্শও তাঁর ধর্মীয় উদারতা ও সমন্বয় সাধনার পরিচায়ক। এর ফলে দেখা যায়, আমাদের দেশে তখন বহু হিন্দু সাধক ও মুসলমান সুফির আবির্ভাব হয়েছে যাঁদের সমন্বয় সাধনার মধ্য দিয়ে আমাদের জাতীয় চিত্তে এক পরম ঐক্যের সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু আকবর যে ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করেছিলেন সে তাঁর অস্ত্রবিজিত রাষ্ট্রসাম্রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর অশোকের ধর্মসাম্রাজ্য তাঁর রাষ্ট্রসাম্রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে একদিকে তাম্রপর্ণী এবং অন্য দিকে এপিরাস-সাইরিনি পর্যন্ত পৃথিবীর বিশাল ভূখণ্ডে বিস্তারলাভ করে। বস্তুত পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধর্মবিজয়ের দৃষ্টান্ত বিরল। পৃথিবীতে সিজার, চেঙ্গিস, আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন ও হিটলারের মত দুর্দান্ত প্রতাপশালী অস্ত্রবিজয়ী বীরের অভাব নেই, কিন্তু ধর্মবিজয়ী বীর একমাত্র অশোক। অশোকের এই ধর্মবিজয় ভারতবর্ষের চিরন্তন গৌরবের সামগ্রী।[৮৬]

ধর্মীয় উদারতার দিক্ থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অশোক ও আকবরের সঙ্গে শিবাজীর নামও উল্লেখযোগ্য। অশোক ও আকবরের মত শিবাজীও এক ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> আমাদের দেশে মোগল শাসনকালে শিবাজীকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল তখন সে চেষ্টা ধর্মকে লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই। শিবাজীর ধর্মগুরু রামদাস এই চেষ্টার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রচেষ্টা ভারতবর্ষে আপনাকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিল।[৮৭]

আর ধর্মগত উদার ঐক্যই ছিল শিবাজীর ধর্মসাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু হলেও রাজা হিসাবে হিন্দু-মুসলমান উভয় প্রজাকেই সমদৃষ্টিতে দেখতেন। সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ উদার ধর্মীয় নীতির জন্য শিবাজী রবীন্দ্রনাথের এমন শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন।

অশোক ও আকবরকে রবীন্দ্রনাথ আরো একবার একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।—

> বিধাতার রচা ইতিহাস আর মানুষের রচা কাহিনী এই দুই কথায় মিলে মানুষের সংসার। মানুষের পক্ষে কেবল যে অশোকের গল্প, আকবরের গল্পই সত্য তা নয়, যে-রাজপুত্র সাত-সমুদ্রপারে সাত রাজার ধন মানিকের সন্ধানে চলে সেও সত্য।[৮৮]

---

[৮৬] প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ধর্মবিজয়ী অশোক', পৃ. ১৫

[৮৭] ধম্মপদং (১৯০৩), 'প্রাচীন সাহিত্য'

[৮৮] গল্প (১৯২০), 'লিপিকা'

'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' (১৯১৮) প্রবন্ধ রচনার অত্যল্পকালের মধ্যেই এই গল্পটি রচিত। বিধাতার রচা ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণরূপে রবীন্দ্রনাথ এখানে ভারতবর্ষের দুই মহান সম্রাট অশোক ও আকবরের নাম উল্লেখ করেছেন। অশোক ও আকবরকে এভাবে একাধিকবার একসঙ্গে উল্লেখ করার মূলে রয়েছে তাঁদের আদর্শগত ঐক্য। এই আদর্শ হল সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ উদার ধর্মীয় দৃষ্টি। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ আজীবন এই আদর্শের পূজারী।

৫

জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও রবীন্দ্রনাথের অন্তরে অশোকের মহিমা উজ্জ্বলভাবে জাগ্রত ছিল। ১৯৪০ সালে শ্রীমতী হিলডা সেলিগম্যান মৌর্য-বংশের কাহিনী নিয়ে When Peacocks Called নামক এক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখে দেন। এই ভূমিকাতে তিনি বলেছেন—

> In an age of fratricide, aided by intellectual dehumanization in the large areas of the world, it is difficult to restore the calm air so necessary for the realisation of great human ideals. Hilda Seligman has chosen in her book to reveal the organization side of a great humanism which came with King Asoka of India. My good thoughts go with the author in her venture to present ancient India through its message which has a perennially modern significance.[২৯]

অর্থাৎ, মানুষের বুদ্ধিগত অমানুষীকরণের ফলে পৃথিবীর বৃহৎ অংশ জুড়ে অধুনা এক ভ্রাতৃঘাতী নীতির যুগ চলছে। উচ্চতর মানবীয় আদর্শ উপলব্ধির জন্য যে শান্ত স্বাভাবিক অবস্থা বিশেষ প্রয়োজন এমতাবস্থায় তা ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন। ভারতবর্ষে সম্রাট অশোকের সময়ে যে মানবিকতার বিকাশ হয়েছিল, এই গ্রন্থে হিলডা সেলিগম্যান তার গঠনমূলক দিকটির উপর আলোকপাত করেছেন। প্রাচীন ভারতের সর্বকালীন আধুনিক আদর্শটি তুলে ধরার জন্য লেখিকা যে দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন তার সঙ্গে যুক্ত করি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

---

[২৯] Foreword (1940), *When Peacocks Called*; প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৯১

অশোক যে মহৎ মানবীয় আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা আজকের দিনের দ্বন্দ্বকোলাহলের মধ্যে স্মরণ করার বিশেষ সার্থকতা আছে। অশোকের সেই মানবীয় আদর্শ মানুষকে চিরদিন ত্যাগে প্রেমে ও মানবসেবায় দুঃখবরণের মহৎ সংকল্পে প্রেরণা জোগাবে। এদিক্ থেকে অশোকের আদর্শ চিরকালের আধুনিক বা সর্বকালীন। তাই মহৎ আদর্শের পূজারী রবীন্দ্রনাথ অশোককে এমন আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে একমাত্র বুদ্ধদেব ব্যতীত আর কেউ রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে এমন শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করতে পারেন নি।

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি

ক। ভাবাদর্শে

মূলত রসস্রষ্টা কবি হলেও রবীন্দ্রনাথ মননের ক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতির একজন মুখ্য ব্যাখ্যাতা। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার প্রতিটি স্তরেই রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ ও সদাজাগ্রত কৌতূহল। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিরই এক মহৎ প্রকাশ। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে এ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে অবলোকন করেছেন। তাঁর স্বাভাবিক সত্যানুসন্ধিৎসা ও মননশীলতার আলোকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৌদ্ধসংস্কৃতির সত্যস্বরূপটি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নয়তো শুধু দার্শনিকতত্ত্বের আলোচনা রবীন্দ্রনাথের স্বভাবের অনুবর্তী নয়। বৌদ্ধধর্ম যেখানে উচ্চতর মানবিক আদর্শের পূর্ণতাসাধন করেছে সেখানেই রবীন্দ্রনাথ তথা আধুনিক মনের প্রধান আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধও মূলত মানবিক ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এখানেই বৌদ্ধসংস্কৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবসাযুজ্য।

অল্পবয়সেই রবীন্দ্রনাথ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের জীবনে রাজেন্দ্রলালের প্রভাব অপরিসীম। তিনি যেসকল বৌদ্ধকাহিনী নিয়ে কাব্য ও নাটক রচনা করেন তার অধিকাংশই রাজেন্দ্রলালের Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (১৮৮২) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। তা ছাড়া ঠাকুর পরিবারের মধ্যেও যে তখনকার দিনে বৌদ্ধশাস্ত্রের চর্চা হত তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম' (১৯০১) গ্রন্থখানি। আর বাংলাদেশে তৎকালীন মনস্বী ও সাহিত্যিকগণের মনন ও কল্পনার ফলে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি আমাদের জাতীয় চিত্তে যে সশ্রদ্ধ ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয় সেই ভাবপরিবেশও রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধমানস গঠনে কম সহায়তা করে নি।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ব্যতীত অন্যত্রও রয়েছে। বৈশাখী পূর্ণিমা ও আষাঢ়ী পূর্ণিমা আমাদের জাতীয় জীবনে দুই প্রধান স্মরণীয় তিথি। বৈশাখী পূর্ণিমা ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব, বুদ্ধত্বলাভ ও মহাপরিনির্বাণের পুণ্যস্মৃতি

বিজড়িত। আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধদেব জগতের হিতার্থে সারনাথের ইসিপতন মৃগদাবে সর্বপ্রথম ধর্মচক্রপ্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় জীবনে এই তিথি-দুটির গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ধর্মচক্রপ্রবর্তন তিথি যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।[১] এ প্রসঙ্গে বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথিব' গানটি স্মরণীয়। প্রাণের আবেগ-ঢালা এই সর্বজনপ্রিয় গানটি রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেবের উদ্দেশে রচিত রবীন্দ্রনাথের আরেকটি প্রসিদ্ধ গান 'সকল কলুষতামস হর'।

আমাদের দেশে বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির এক বিরাট ঐতিহ্যের পরিচয় নিহিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এই বৌদ্ধশাস্ত্রকে উদ্ধার করার জন্য রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগ ছিল। চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক সম্পাদিত ধম্মপদ (১৯০৪) গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হয়ে আছে। এ কথা মনে করে সমস্ত দেশে পাঁচজন লোকও কি বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধার করাকে চিরজীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করতে পারেন না?[২] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে যুগে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে রথীন্দ্রনাথ-প্রমুখ ছাত্রদের বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে রথীন্দ্রনাথকে ধম্মপদ গ্রন্থখানি আগাগোড়া মুখস্থ করতে হয়। আবার নবাগত অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে রথীন্দ্রনাথ অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' কাব্যখানি বাংলায় অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও একসময়ে ধম্মপদ গ্রন্থখানি বাংলায় পদ্যানুবাদ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। তাঁর অসমাপ্ত অনুবাদ পরে বিশ্বভারতী পত্রিকায় (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫) প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ) পঞ্চদশ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।[৩] যা হক, এমনি ভাবে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিক্ থেকে বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধশাস্ত্রের চর্চা শুরু হয়। কালক্রমে দেশ-বিদেশের বৌদ্ধ-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সমাবেশে বিশ্বভারতী আমাদের দেশে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। তৎকালে যেসকল সুধীবৃন্দের দ্বারা

[১] সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, বাঙালি বৌদ্ধদের পূজাপার্বণ ও উৎসব, মাসিক বসুমতী, পৌষ ১৩৭০

[২] ধম্মপদং (১৯০৫), 'প্রাচীন সাহিত্য'

[৩] রবীন্দ্র রচনাবলী (প. ব. সরকার) ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৭-২৪

বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধশাস্ত্র অনুশীলনের ধারা অব্যাহত থাকে তার মধ্যে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, রাজগুরু ধর্মাধার মহাস্থবির, আচার্য সিলভাঁ লেভি, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডক্টর লিন ও-চিয়াং, অধ্যাপক জোসেফ তুচ্চি ও অধ্যাপক তান য়ুন-সান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধশাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা-লাভের জন্য অধ্যাপক নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামীকে সিংহলে প্রেরণের মূলেও রয়েছে বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক অনুরাগ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন তখনকার আর্থিক প্রতিকূলতার দিনেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে দেশ-বিদেশের বৌদ্ধশাস্ত্র-বিষয়ক অমূল্য গ্রন্থরাজি আহরণ করেছিলেন।

২

১৯২৭ সালে বৃহত্তর-ভারত যাত্রার প্রাক্‌কালে অনুষ্ঠিত বিদায় সংবর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সত্যপরিচয়-নির্ণয়প্রসঙ্গে বলেছেন

> ভারতবর্ষ যে কোন্‌খানে সত্য, নিজের লোহার সিন্দুকের মধ্যে তার দলিল সে রেখে যায় নি। ভারতবর্ষ যা দিতে পেরেছে তার দ্বারাই তার প্রকাশ। নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ যা তার কুলোয় নি তাতেই তার পরিচয়। অন্যকে সত্য করে দিতে পারার মূলেই হচ্ছে অন্যকে আপন করে উপলব্ধি। আপন সীমার বাধা যে ভাঙতে পেরেছে, বাইরের দুর্গম ভৌগোলিক বাধাও সে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। এইজন্যেই ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্যকে জানতে হলে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে বসে ধূলিকলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে।[৫]

ভারতবর্ষ যেখানে আপন সীমার বাধা ভেঙে অন্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে, ভারতবর্ষ অন্যকে যা দিতে পেরেছে, রবীন্দ্রদৃষ্টিতে সেখানেই তার সত্যস্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন—

> সভ্যতা সর্বমানবের সম্পদ। অদ্যকার মহাযুদ্ধের অধিনায়কদের অন্তত এক পক্ষ বলে থাকেন, তাঁরা সমস্ত মানবের জন্য লড়াই করছেন। কিন্তু নিজেদের গণ্ডির বাহিরের মানুষকে মানুষ বলেই গণ্য করে না, উদ্ধত লোভরিপুর এই লক্ষণ। কেননা, আত্মা যাদের মুখ্য লক্ষ্য নয় আত্মীয়তার বোধসীমা তাদের কাছে সংকীর্ণ। মানুষের সম্বন্ধে

[৫] বৃহত্তর ভারত (১৯২৭), 'কালান্তর'

> অদ্বৈতবুদ্ধি অর্থাৎ অখণ্ড মৈত্রী তাদের কাছে শ্রদ্ধা পায় না। মনে রাখতে হবে, এক দিন এই মৈত্রী প্রচার করবার জন্য সেদিনকার বুদ্ধভক্ত ভারত প্রাণান্ত স্বীকার করেও দেশে বিদেশে অভিযান করেছিল, পরসম্পদকে আত্মসাৎ করবার জন্য নয়।[১]

সভ্যতা যদি সর্বমানবের সম্পদ হয় এবং অন্যকে মৈত্রীবুদ্ধিতে গ্রহণ করার মধ্যে যদি এর সার্থকতা নিহিত থাকে, তাহলে ভারতীয় সভ্যতা বৌদ্ধধর্মের এই বিশ্বমৈত্রীর মধ্য দিয়েই চরম সার্থকতা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনব্যাপী বাণীসাধনার মধ্যেও দেখতে পাই এই বিশ্বমৈত্রীর জয়ঘোষণা। ব্যক্তিগত জীবনেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমৈত্রীর বিজয়বৈজয়ন্তী বহন করে বারবার পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অভিযান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মূলেও রয়েছে এই আদর্শ। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ-ধর্মের এই মৈত্রীর আদর্শকে এত উচ্চস্থান দিয়েছেন।

বৌদ্ধধর্মে মৈত্রী ও করুণার বাণীকে নানা ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। জাতকের কাহিনীতে দেখা যায়, এই মৈত্রী ও করুণার আদর্শ শুধু মানুষের পক্ষে নয়, সমগ্র প্রাণিজগতের পক্ষে এক চরম সত্য। বুদ্ধদেব তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মে মনুষ্যেতর প্রাণিরূপেও এই মৈত্রী ও করুণার আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। বুদ্ধদেবের শেষ বা বুদ্ধত্বলাভের জন্মেও এই আদর্শ প্রতিভাত হয়েছে। পরবর্তী বৌদ্ধসাহিত্য এবং শিল্পকলায় বুদ্ধদেবের যে মৈত্রী-করুণার রূপটি প্রাধান্য লাভ করেছে তা'ও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, বৌদ্ধধর্মে এই মৈত্রী-করুণার আদর্শ কত প্রাধান্য লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের এই মৈত্রী-করুণার বাণী উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এই আদর্শ কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা দেখা যাক।—

> সন্তানের জন্য আমরা মানুষকে দুঃসাধ্যকর্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছি, অনেক জন্তুকেও সেরূপ দেখিয়াছি; স্বদেশীয়-স্বদলের জন্যও আমরা মানুষকে দুরূহ চেষ্টা প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি, পিপীলিকাকেও মধুমক্ষিকাকেও সেরূপ দেখিয়াছি। কিন্তু মানুষের কর্ম যেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া গেছে, সেইখানেই আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গৌরব লাভ করিয়াছি। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে—বৎস যেমন গাভীমাতার পূর্ণস্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া

[১] আরোগ্য (১৯৪০), 'কালান্তর'

লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো শ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য।[৬]

সুত্তনিপাতের অন্তর্গত মেত্তাসুত্ত বা মৈত্রীসূত্র এই উক্তির প্রধান অবলম্বন। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বহুবার এর উল্লেখ করেছেন। মৈত্রীসূত্রে বলা হয়েছে, একমাত্র পুত্রের প্রতি মায়ের যে ভালবাসা সকল জীবের প্রতি সেরকম অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে। সব সময়ে মানুষের মনে এই ভাবটি রাখবে: সকল প্রাণী সুখিত হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক, সুখী আত্মা হয়ে কালহরণ করুক। সকল প্রাণী আপন যথালব্ধ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক। মানুষ যখন দাঁড়িয়ে আছে বা চলছে, বসে আছে বা শুয়ে আছে, যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যন্ত, এইপ্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে ব্রহ্ম-বিহার বলে।

বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সর্বভূতের প্রতি এই অপরিমেয় প্রেম বা মৈত্রীর আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দান করেছেন। তাঁর বিভিন্ন উক্তি থেকে একথা সপ্রমাণ হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> বুদ্ধদেবের আসল কথাটা কী সেটা দেখতে গেলে তাঁর শিক্ষার মধ্যে যে অংশটা নেগেটিভ সে দিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না—যে অংশ পজিটিভ সেখানেই তাঁর আসল পরিচয়। যদি দুঃখ-দূরই চরম কথা হয় তা হলে বাসনালোপের দ্বারা অস্তিত্বলোপ করে দিলেই সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়—কিন্তু মৈত্রীভাবনা কেন? মৃত্যুদণ্ডই যার উপর বিধান তার আর ভালোবাসা কেন, দয়া কেন? এর থেকে বোঝা যায় যে, এই ভালোবাসাটার দিকেই আসল লক্ষ্য—আমাদের অহং, আমাদের বাসনা স্বার্থের দিকে টানে—বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে, আনন্দের দিকে নয়—এইজন্যই অহংকে নির্বাপিত করে দিলেই সহজেই সেই আনন্দলোক পাওয়া যাবে।......সেই আনন্দই যে বুদ্ধদেবের লক্ষ্য তা বোঝা যায় যখন দেখি তিনি লোকলোকান্তরের জীবের প্রতি মৈত্রী বিস্তার করতে বলেছেন।......এই জগদ্ব্যাপী প্রেমকে সত্যরূপে লাভ করতে গেলে নিজের অহংকে নির্বাপিত করতে হয়, এই শিক্ষা দিতে বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন।[৭]

[৬] উৎসবের দিন (১৯০৫), 'ধর্ম'

[৭] মৈত্রীসাধন, প্রবাসী, ১৩৪৮ মাঘ। 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে সংকলিত, পৃ. ৫৪-৫৬

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন—

> সমস্ত বাসনা ও কর্ম নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া নির্বাণমুক্তির মধ্যেই আপনাকে একেবারে 'না' করিয়া দেওয়াই যে বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্য নহে তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। সর্বভূতের প্রতি প্রেম জিনিসটি শূন্য পদার্থ নহে। এমন বিশ্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন কোনো ধর্মেই নাই। প্রেমের দ্বারা সমস্ত সম্বন্ধ সত্য এবং পূর্ণ হয়, কোনো সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। অতএব প্রেমের চরমে যে বিনাশ ইহা কোনোমতেই শ্রদ্ধেয় নহে।[৮]

১৩৪২ সালের ৪ জ্যৈষ্ঠ কলকাতায় শ্রীধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে ভাষণদানের কালেও রবীন্দ্রনাথ একটু অন্যভাবে এ কথাই পুনরাবৃত্তি করেছেন।—

> তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি নঙর্থক নয়, সদর্থক; যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে; যে মুক্তি রাগ-দ্বেষবর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়।[৯]

উল্লিখিত উক্তিসমূহ থেকে বুঝতে পারা যায়, রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের মৈত্রীসাধনার উপর কত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এমন কি বৌদ্ধমতে যে পরম সত্য নির্বাণ, রবীন্দ্রনাথ তার চেয়েও এই মৈত্রীসাধনাকে অধিকতর প্রাধান্য দান করেছেন। তবে এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, অধিকাংশ লেখকের মত রবীন্দ্রনাথ নির্বাণের অভাবাত্মক শূন্যতার প্রতিই দৃষ্টিপাত করেছেন। এ ধারণা যে বৌদ্ধ-মতে সত্য নয় সেকথা আমরা পরে আলোচনা করব। যা হক, 'মৈত্রী যে কেবল একটা হৃদয়ের ভাব নয়, এ একটি বিশ্বসত্য'[১০]—একথা সেই জাপানি বৌদ্ধের মত রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিশ্বাস করতেন। আর যথার্থই 'এমন বিশ্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন কোনো ধর্মেই নাই'।[১১] এই বিশ্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন বা বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ অবলম্বন করে ভারতবর্ষ একদিন বিশ্ববিজয় অভিযানে বহির্গত হয়ে কালক্রমে প্রায় সমগ্র এশিয়া মহাদেশ জয় করেছিল। এই বিশ্ব-বিজয় বাহিনীর নায়ক ছিলেন দেবপ্রিয় অশোক, কাশ্যপমাতঙ্গ ও কুমারজীব, আর মহেন্দ্র, সংঘমিত্রা ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি। ভারতবর্ষ এই বিজয় অভিযানে সৈন্য ও অস্ত্র প্রেরণ করে নি, বিশ্বের ইতিহাসে পীড়ন ও লুণ্ঠনের

---

[৮] 'বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩১৮ পৌষ। 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে সংকলিত, পৃ. ৩৫

[৯] বুদ্ধদেব, প্রবাসী, ১৩৪২ আষাঢ়। 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে সংকলিত, পৃ. ১২

[১০] নবযুগ (১৯০২), 'কালান্তর'

[১১] 'বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ' (১৯১১), 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে সংকলিত, পৃ. ৩৫

আরেকটি নূতন অধ্যায় যুক্ত করে নি। এর বদলে ভারতবর্ষ সর্বত্র শান্তি, সান্ত্বনা ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন[১২] করে পৃথিবীতে এক অক্ষয় প্রেমের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। মহাকালের অনন্তস্রোতে কত শত নেপোলিয়ন-হ্যানিবাল, সিজার-চেঙ্গিস ও দলদর্পী হিট্‌লারের সাম্রাজ্য বুদ্‌বুদের মত মিলিয়ে গেছে, কিন্তু বৌদ্ধ-ভারতের এই প্রেমের সাম্রাজ্য চিরদিন অম্লানদীপ্তিতে বিরাজমান। ভারতের এই প্রেমের সাম্রাজ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> একদিন ভারতবর্ষ জ্ঞানের দ্বারা, ধর্মের দ্বারা, চীন-জাপান ব্রহ্মদেশ-শ্যামদেশ তিব্বত-মঙ্গোলিয়া—এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশই জয় করিয়াছিল। আজ য়ুরোপ অস্ত্রের দ্বারা বাণিজ্যের দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমরা ইস্কুলে পড়িয়া এই আধুনিক য়ুরোপের প্রণালীকেই যেন একমাত্র গৌরবের কারণ বলিয়া মনে না করি।[১৩]

চীন ও জাপানের উপর একদিকে ভারতবর্ষ ও অন্য দিকে আধুনিক ইউরোপ যে জয়লাভ করেছে দুই দেশের সেই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী জয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র আরো স্পষ্ট করে বলেছেন। আধুনিক ইউরোপের 'সর্দার-পোড়ো' জাপান সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

> জাপান মার খেয়ে জেগেছে। ভারতবর্ষ থেকে প্রেমের দৌত্য একদিন তাকে জাগিয়েছিল, আজ লোভ এসে ঘা দিয়ে ভয়ে তাকে জাগিয়েছে। লোভের দম্ভের ঘা খেয়ে যে জাগে সে অন্যকেও ভয় দেখায়। জাপান কোরিয়াকে মারলে, চীনকে মারতে গিয়েছিল।[১৪]

সেদিন জাপান প্রাচ্যখণ্ডে যে বিভীষিকার সঞ্চার করেছিল ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। আর চীনের উপর ভারত ও ইউরোপের প্রভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, বুদ্ধদেব মৈত্রীবুদ্ধিতে সকল মানুষকে এক দেখেছিলেন, তাঁর সেই ঐকাত্ম্য চীনকে অমৃত দান করেছিল। কিন্তু ইউরোপের লোভী বণিক এই ঐকাত্মকে মানে নি। সে অকুণ্ঠিতচিত্তে চীনকে কামান দিয়ে ঠেসে ঠেসে আফিম গিলিয়েছে।[১৫] এখানে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ও ইউরোপীয় সভ্যতার যথার্থ স্বরূপটি প্রকাশ করেছেন। আর, তিনি মনে করেন যে, ভারতবর্ষ তার প্রেমের দ্বারা দানের দ্বারা মানুষের চিত্তলোকে যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে সেখানেই তার সত্যপ্রকাশ, সেখানেই তার গৌরব। রবীন্দ্রনাথ আরো লক্ষ্য

---

[১২] স্বদেশী সমাজ (১৯০৪), 'আত্মশক্তি'
[১৩] দেশীয় রাজ্য (১৯০৫), 'আত্মশক্তি'
[১৪] বিশ্বভারতী—১১ (১৯২৪)
[১৫] শিক্ষার মিলন (১৯২১), 'শিক্ষা'

করেছেন যে, এইজন্যই তিব্বত-চীন-জাপান প্রভৃতি ভারতবর্ষকে গুরু বলে গ্রহণ করে পরম সমাদরে নিরুৎকণ্ঠিতচিত্তে তাকে গৃহের মধ্যে ডেকে নিয়েছে।[২৫] আর যে বৌদ্ধধর্মের যোগে ভারতবর্ষ এই গুরুর আসন লাভ করেছে তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও ঔৎসুক্য খুবই স্বাভাবিক।

৩

মৈত্রীশক্তি অহং-এর সীমা লুপ্ত করে মানুষকে অনৈক্যবোধ থেকে মুক্তিদান করে, তখন মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে আর বাধা থাকে না। এমনি ভাবে বৌদ্ধধর্মের মৈত্রীর আদর্শ প্রায় সমগ্র এশিয়াখণ্ডকে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে। এশিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে চেহারা ভাষা ও রীতিনীতিতে এক বিরাট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। ভারতবাসীর সঙ্গে তিব্বত-চীন-জাপান প্রভৃতি এশিয়ার যে-কোন মঙ্গোলীয় জাতির তুলনা করলেই একথা প্রমাণিত হবে। কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও এশিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৌদ্ধধর্মের যোগে এক বিরাট ঐক্য সাধিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লক্ষ্য করেছেন

> এই ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্মের মিলনমন্ত্র করুণাজলভারগম্ভীর মেঘমন্দ্রের মতো ধ্বনিত হইয়া এশিয়ার পূর্বসাগরতীরবাসী সমস্ত মঙ্গোলীয় জাতিদিগকে জাগ্রত করিয়া দিল এবং ব্রহ্মদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অতিদূরে জাপান পর্যন্ত ভিন্নভাষী অনাত্মীয়দিগকে ধর্ম সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্ম করিয়া দিয়াছে।[২৬]

বস্তুত যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ব্রহ্মদেশ হতে জাপান পর্যন্ত এশিয়ার বিভিন্ন জাতিকে একাত্ম করে দিয়েছে, এশিয়ার প্রকৃত যোগসূত্র এখানেই। এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ ডি. টি. সুজুকির উক্তি প্রণিধানযোগ্য।—

> If the East is one, and there is something that differentiates it from the West, the differentiation must be sought in the thought that is embodied in Buddhism. For it is in Buddhist thought and in no other that India, China and Japan, representing the East, could be united as one. Each nationality has its own characteristic modes of adapting the thought to its environmental needs, but when the East as a unity is

---

[২৫] স্বদেশী সমাজ (১৯০৪), 'আত্মশক্তি'

[২৬] পথ ও পাথেয় (১৯০৮), 'রাজাপ্রজা'

made to confront the West, Buddhism supplies the bond.[১৮]

অর্থাৎ, প্রাচ্যখণ্ডকে যদি এক বলে গণ্য করা হয় এবং এর মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে যা প্রতীচ্য থেকে পৃথক, বৌদ্ধ ভাবাদর্শের মধ্যেই তা খুঁজে দেখতে হবে। কারণ প্রাচ্যের প্রতিভূরূপে ভারত, চীন ও জাপান একমাত্র বৌদ্ধধর্মের মধ্য দিয়েই এক হয়ে মিলতে পারে। আপন পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে প্রত্যেক জাতির কোন ভাবধারা গ্রহণের একটি স্বকীয় রীতি আছে। কিন্তু সামগ্রিক-ভাবে প্রাচ্যকে প্রতীচ্যের সম্মুখীন হতে হলে বৌদ্ধধর্ম হবে এই যোগসূত্র।

বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে এশিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে যেমন এক গভীর ও বৃহৎ ঐক্য গড়ে উঠেছে তেমনি ভারতবর্ষের মধ্যেও আর্য-অনার্য বিভিন্ন জাতির মাঝখানকার ভেদের প্রাচীর এক ধর্মবন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। বৌদ্ধ-ধর্মের এই ঐক্যশক্তি রবীন্দ্রনাথকে কম মুগ্ধ করে নি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই ঐক্যমন্ত্রের উপাসক। তাঁর আজীবন বাণী সাধনার মধ্যে দূরকে নিকট বন্ধু, পরকে ভাই করার প্রয়াস দেখা যায়। নব মহাভারত রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ পূর্ব-পশ্চিম আর্য-অনার্য সবাইকে আহ্বান করেছেন।[১৯] রবীন্দ্রনাথের রচিত 'জনগণমন-অধিনায়ক' জাতীয় সংগীতের মধ্যেও এই ঐক্যবিধায়ক ভারত-ভাগ্যবিধাতার জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়েছে

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা![২০]

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর মূলেও রয়েছে এই আদর্শ। বিশ্বভারতী ভারতবর্ষেরই প্রাণরূপ। এখানে অখণ্ড ভারত ও সমগ্র জগৎ এক জায়গায় এসে মিলেছে। আর বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মূলেও রবীন্দ্রনাথের মনে বৌদ্ধ-ধর্মের আদর্শ সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ ও বৌদ্ধভাবধারা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

মৈত্রীশক্তি একদিকে যেমন মিলন সাধন করে অন্য দিকে আবার ত্যাগের প্রবর্তনা দান করে। নিখিলের প্রতি অপার মৈত্রীতে বুদ্ধদেব একদিন কপিল-

[১৮] D. T. Suzuki, Japanese Buddhism, *Essays in Zen Buddhism* (3rd Series), p. 348
[১৯] ভারততীর্থ, গীতাঞ্জলি
[২০] ভারতবিধাতা, গীতবিতান

বাস্তুর সুখসমৃদ্ধি ত্যাগ করেছিলেন। বস্তুত সমগ্র বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ত্যাগের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। ত্যাগধর্মের পূজারী রবীন্দ্রনাথকে এ বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'কথা' (১৯০০) কাব্যগ্রন্থের ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি ত্যাগেরই চিত্র। এর অন্তর্গত শ্রেষ্ঠভিক্ষা, মস্তক-বিক্রয়, পূজারিণী, মূল্যপ্রাপ্তি, নগরলক্ষ্মী প্রভৃতি কবিতায় বুদ্ধদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত ত্যাগের মহিমা প্রকাশ পেয়েছে। যে ত্যাগের প্রেরণায় নারী আপনার লজ্জা নিবারণের একমাত্র পরিধেয় বসন প্রভু বুদ্ধের নামে উৎসর্গ করে দেয়, পূজারিনী রাজদণ্ডের ভয়কে তুচ্ছ করে পূজার আবেগে আত্মাহুতি দেয়, নৃপতি সর্বস্ব ত্যাগ করে ভিখারীর বেশ পরিধান করে—এসকল ত্যাগের চিত্রই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক মহান অধ্যায় থেকে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। আর শুধু কাব্যের আবেগে নয়, মননের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ-ভারতের ইতিহাসে এই ত্যাগের আদর্শকে প্রত্যক্ষ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন যে, বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ এই ত্যাগধর্মকে বরণ করে নিয়ে অকাতরে কিভাবে দুঃখ বহন করেছে।—

> বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ যখন প্রেমের সেই ত্যাগধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছিল তখনি সমাজে তাহার এমন একটি বিকাশ ঘটিয়াছিল যাহা য়ুরোপে সম্প্রতি দেখিতেছি। রোগীদের জন্য ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা, এমন-কি পশুদের জন্যও চিকিৎসালয় এখানে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং জীবের দুঃখ-নিবারণের চেষ্টা নানা আকার ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছিল; তখন নিজের প্রাণ ও আরাম তুচ্ছ করিয়া ধর্মাচার্যগণ দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইয়া পরদেশীয় ও বর্বরজাতীয়দের সদ্গতির জন্য দলে দলে এবং অকাতরে দুঃখ বহন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সেদিন প্রেম আপনার দুঃখরূপকে বিকাশ করিয়াই ভক্তগণকে বীর্যবান মহৎ মনুষ্যত্বের দীক্ষা দান করিয়াছিল। সেইজন্যই ভারতবর্ষ সেদিন ধর্মের দ্বারা কেবল আপনার আত্মা নহে, পৃথিবীকে জয় করিতে পারিয়াছিল এবং আধ্যাত্মিকতার তেজে ঐহিক পারত্রিক উন্নতিকে একত্র সম্মিলিত করিয়াছিল। তখন য়ুরোপের খৃস্টান সভ্যতা স্বপ্নের অতীত ছিল।[১১]

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত; এর মধ্যে কোন অতিশয়োক্তি নেই। বাস্তবিকই বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ ত্যাগের প্রেরণায় যে জীবসেবার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে তখন ইউরোপের আধুনিক খ্রীষ্টান সভ্যতা স্বপ্নেরও অতীত ছিল। সম্রাট অশোকই

[১১] যাত্রার পূর্বপত্র (১৯১২), 'পথের সঞ্চয়'

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর জন্য ঔষধপত্র ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট্ স্মিথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য।—

> It may be doubted if any equally efficient foundation was to be seen elsewhere in the world at that date; and its existence, anticipating the deeds of modern Christian charity, speaks well both for the character of the citizens who endowed it, and for the genius of the great Asoka, whose teaching still bore such wholesome fruit many centuries after his decease.[১১]

অর্থাৎ, সেই প্রাচীনযুগে সম্রাট অশোক জীবসেবার যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তৎকালে সেই দৃষ্টান্ত বিরল। এর মধ্যে সম্রাট অশোক ও তখনকার জনগণের মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর এখানেই রয়েছে আধুনিক খ্রীষ্টীয় বদান্যতা ও সেবাপরায়ণতার পূর্বতন রূপ। অশোকের বহু শতাব্দী পরেও তাঁর সেই আদর্শ অধুনা মানুষকে জীবকল্যাণে প্রণোদিত করে।

আর নিজের প্রাণ ও আরামকে তুচ্ছ করে ধর্মাচার্যগণ পরদেশীয় ও বর্বর-জাতীয়দের কল্যাণের জন্য যে দুঃখ বহন করেছেন তাতে বীর্যপ্রতিষ্ঠিত মহৎ আত্মত্যাগের পরিচয়ই প্রকাশ পেয়েছে।

৪

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা আছে যে, এই ধর্ম মানবপ্রকৃতিকে দুর্বল করে দেয়, এই ধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করে-ছিলেন যে, এই ধর্ম কঠিন বীর্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। মানবকল্যাণে যে আত্মত্যাগের প্রেরণায় মানুষ দুর্গমে দুস্তরে অভিযান করে, যে মহৎ প্রেরণায় মানুষ মরুপ্রান্তরে শৈলশিখরে দ্বীপে দ্বীপান্তরে দুঃসাধ্য কীর্তি রচনা করে, সে তো কিছুতেই দুর্বলের ধর্ম হতে পারে না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> সেদিনকার ভারতবর্ষের বাণী শুষ্কতা প্রচার করে নি। মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্যকে সকল দিকে উদ্‌বোধিত করেছিল—স্থাপত্যে ভাস্কর্যে চিত্রে সংগীতে সাহিত্যে। তারই চিহ্ন মরুভূমে অরণ্যে পর্বতে দ্বীপে দ্বীপান্তরে, দুর্গম স্থানে, দুঃসাধ্য কল্পনায়। সন্ন্যাসীর যে মন্ত্র মানুষকে রিক্ত করে নগ্ন করে, মানুষের যৌবনকে পঙ্গু করে,

[১১] V. A. Smith, *Early History of India* (3rd Edition), p. 296

মানবচিত্তবৃত্তিকে নানা দিকে খর্ব করে, এ সে মন্ত্র নয়। এ জরাজীর্ণ কৃশপ্রাণ বৃদ্ধের বাণী নয়, এর মধ্যে পরিপূর্ণপ্রাণ বীর্যবান যৌবনের প্রভাব।[২৩]

শ্যামদেশে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র কিভাবে পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করেছে।—

ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে
বজ্রমন্দ্ররবে
আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পূরবে,
মরুপারে, শৈলতটে, সমুদ্রের কূলে উপকূলে,
দেশে দেশে চিত্তদ্বার দিল যবে খুলে
আনন্দমুখর উদ্‌বোধন—
উদ্দাম ভাবের ভার ধরিতে নারিল যবে মন,
বেগ তার ব্যাপ্ত হল চারি ভিতে,
দুঃসাধ্য কীর্তিতে কর্মে, চিত্রপটে মন্দিরে মূর্তিতে,
আত্মদানসাধনস্ফূর্তিতে,
উচ্ছ্বসিত উদার উক্তিতে,
স্বার্থঘন দীনতার বন্ধনমুক্তিতে।[২৪]

এখানে কাব্যের ব্যঞ্জনা ও ইতিহাসের সত্য একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। আর বৌদ্ধধর্মের এই বিচিত্র প্রকাশের মধ্যেই 'পরিপূর্ণপ্রাণ বীর্যবান যৌবনের প্রভাব' জাগ্রত রয়েছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন যে, বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে আমাদের জাতীয় জীবন কিভাবে সর্বতোমুখী বিকাশ লাভ করেছে।—

বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনোকালে হয় নাই।

তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে।[২৫]

[২৩] জাভা-যাত্রীর পত্র—১ (১৯২৭)
[২৪] সিয়াম (প্রথম দর্শনে), 'পরিশেষ'
[২৫] যাত্রার পূর্বপত্র (১৯১২), 'পথের সঞ্চয়'

এই উক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সুগভীর ঐতিহাসিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। যথার্থই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এদেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্য-শক্তির যেমন প্রসার হয়েছিল তেমন আর কোনকালে হয় নি। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করেই ভারত-শিল্পের উৎপত্তি।[২৬] অজন্তা, ইলোরা, কারলে, ভারহুত, মথুরা, সাঁচী প্রভৃতি ভারতীয় শিল্পকলার চরমোৎকর্ষের পরিচয় দান করে। জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতির উৎকর্ষ বৌদ্ধ-যুগেরই আনুষঙ্গিক ঘটনা। এই যুগেই জীবক, চরক, সুশ্রুত, নাগার্জুন, বসুবন্ধু, ধর্মকীর্তি প্রভৃতি মনীষিগণের অভ্যুদয় হয়েছিল। বৌদ্ধযুগে স্থল ও সমুদ্রবাণিজ্যের যে প্রসার হয়েছিল তা'ও উল্লেখযোগ্য। তখন ভরুকচ্ছ, সুপ্পারক, চম্পা, বৈশালী, সাকেত, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি বহু সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। আবার অন্য দিকে সমুদ্রপারে দ্বীপময়-ভারত, সিংহল, চীন, ব্যাবিলনে ভারতবর্ষের সমুদ্রবাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল।[২৭] অজন্তার নৌ-চিত্রসমূহ তৎকালীন সমুদ্রবাণিজ্যের পরিচয় দান করে। আর সর্বোপরি খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারত এই বৌদ্ধযুগে বিম্বিসার-অজাতশত্রুর সময় থেকে এক অখণ্ড ঐক্যের পথে অগ্রসর হয়ে চন্দ্রগুপ্ত-অশোকের সময় প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষকে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, কনিষ্ক ও হর্ষবর্ধনের গৌরবময় ঐতিহ্য বৌদ্ধ-ভারতের পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নয়।

পরশমণির স্পর্শে লোহাও নাকি সোনায় পরিণত হয়। বৌদ্ধধর্মও পরশ-মণির মত যে দেশকে স্পর্শ করেছে সেখানেই তার চিত্তের ঐশ্বর্যকে জাগ্রত করেছে, শিল্পে সংস্কৃতিতে সৌন্দর্যবোধে জাতীয় জীবনে এক নূতন প্রাণস্পন্দন সঞ্চার করেছে। বৌদ্ধধর্মের এই দিক্‌টি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। বস্তুত একদিক্ থেকে দেখতে গেলে, সংস্কৃতি বৌদ্ধধর্মেরই এক অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ। বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিরও প্রসার হয়েছে। এশিয়াখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের ইতিহাসে এ সত্যটি বিশেষ-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। সিংহল ব্রহ্ম শ্যাম তিব্বত মঙ্গোলিয়া চীন জাপান প্রভৃতি দেশসমূহ বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাট সংস্কৃতিরও অধিকারী হয়েছে। জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ফল সম্বন্ধে বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ তাইতারো সুজুকি বলেছেন—

Buddhism was to them a new philosophy, a new

[২৬] A. Grunwedel, *Buddhist Art in India*, p. 1
[২৭] T. W. Rhys Davids, *Buddhist India* (6th ed.), pp. 53-54

culture, and an inexhaustible mine of artistic impulses.[১৮]

অর্থাৎ, জাপানিদের কাছে বৌদ্ধধর্ম ছিল এক নূতন দর্শন, নূতন সংস্কৃতি, এবং এক অফুরন্ত শিল্পপ্রেরণার উৎস।

সুজুকির এই উক্তি শুধু জাপান সম্বন্ধে নয়, বৌদ্ধধর্মবিজিত সকল দেশ সম্বন্ধেই সমান প্রযোজ্য।

৫

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন শিল্প-সংস্কৃতির প্রসার হয়েছে অন্য দিকে বৌদ্ধধর্ম মানুষের অন্তরে উদ্‌বুদ্ধ করেছে সংযম ও সৌন্দর্যচেতনা। জাপানে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ সত্যটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন। জাপানিদের প্রতিদিনের ব্যবহারে যে সংযম ও সৌন্দর্যবোধ তা রবীন্দ্রনাথকে গভীর তৃপ্তিদান করেছে। জাপানি চরিত্রের এ দিক্‌টি রবীন্দ্রনাথ নানা জায়গায় উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও আজীবন সৌন্দর্যের উপাসক। শুধু সাহিত্য-সৃষ্টিতে নয়, দৈনন্দিন জীবনেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি কথায় কর্মে ব্যবহারে সুরুচি ও গভীর সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই জাপানি চরিত্রের এই সংযম ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথকে এমন ভাবে আকৃষ্ট করেছে।—

> সুন্দরের প্রতি এমন আন্তরিক সম্ভ্রম অন্য কোথাও দেখি নি। এমন সাবধানে, যত্নে, এমন শুচিতা রক্ষা করে সৌন্দর্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে অন্য কোনো জাতি শেখে নি। যা এদের ভালো লাগে তার সামনে এরা শব্দ করে না। সংযমই প্রচুরতার পরিচয় এবং স্তব্ধতাই গভীরতাকে প্রকাশ করে, এরা সেটা অন্তরের ভিতর থেকে বুঝেছে। এবং এরা বলে, সেই আন্তরিক বোধশক্তি এরা বৌদ্ধধর্মের সাধনা থেকে পেয়েছে।......জীবনযাত্রার রীতি যদি আমরা অসংকোচে জাপানের কাছ থেকে শিখে নিতে পারতুম, তাহলে আমাদের ঘরদুয়ার এবং ব্যবহার শুচি হত, সুন্দর হত, সংযত হত। জাপান ভারতবর্ষ থেকে যা পেয়েছে তাতে আজ ভারতবর্ষকে লজ্জা দিচ্ছে; কিন্তু দুঃখ এই যে, সেই লজ্জা অনুভব করবার শক্তি আমাদের নেই।[১৯]

রবীন্দ্রনাথ একথা যথার্থই শুনেছেন যে, জাপানিরা এই সংযম ও সৌন্দর্য-

[১৮] D. T. Suzuki, Japanese Buddhism, *Essays in Zen Buddhism* (3rd Series), p. 340

[১৯] জাপানযাত্রী—১৪ (১৯১৬)

চেতনা বৌদ্ধধর্মের সাধনা থেকেই পেয়েছে। বুদ্ধদেবের জীবনাদর্শ ও বৌদ্ধ-বিনয়ের প্রতি লক্ষ্য করলেই একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হবে। বৌদ্ধধর্ম সত্যই মধ্যপথের ধর্ম। উচ্চতর সাধনা কিংবা ব্যবহারিক জীবনে এর কোথাও আতিশয্যের স্থান নেই, সর্বত্রই সংযম ও মিতাচারের সাধনা। ধম্মপদের একটি শ্লোকে এই সংযমের কথা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।—

কায়েন সংবরো সাধু, সাধু বাচায় সংবরো,
মনসা সংবরো সাধু, সাধু সব্বত্থ সংবরো,
সব্বত্থ সংবুতো ভিক্খু সব্বদুক্খা পমুচ্চতি।[৩০]

অর্থাৎ, কায়িক সংযম উত্তম, বাচনিক সংযম উত্তম, মানসিক সংযম উত্তম, সর্বত্র সংযত স্বভাব উত্তম। সর্বথা সংযত ভিক্ষু সকল দুঃখ হতে বিমুক্ত হয়।

আবার এই সংযম ও সৌন্দর্য পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সৌন্দর্য যেমন মিতাচার শিক্ষা দেয়, তেমনি মিতাচারী হলেও অসুন্দরের কল্পনা করা যায় না। জাপানি চরিত্রের মধ্যে এমনি ভাবে সৌন্দর্য ও সংযমের সমন্বয়সাধন হয়েছে। যা হক, বৌদ্ধধর্মে এই যে সংযম ও সৌন্দর্যসাধনার পরিচয় পাওয়া যায় তা বুদ্ধদেবের জীবন থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে বৌদ্ধ-সংঘ এবং সামগ্রিকভাবে বৌদ্ধ জনমানসে প্রতিফলিত হয়েছে। বুদ্ধমূর্তি দেখে বুদ্ধদেবের সৌম্যসুন্দর মুখমণ্ডল কল্পনা করে মনে হয় জগতে এর তুলনা দুর্লভ। মহাকবি অশ্বঘোষ তাঁর 'বুদ্ধচরিত' কাব্যে ভগবান বুদ্ধকে শ্রীঘন নামেই বারবার উল্লেখ করেছেন। বাস্তবিকই বুদ্ধদেব যেন সমগ্র বিশ্বের ঘনীভূত শ্রী বা সৌন্দর্যের প্রতিরূপ। আবার তেমনি সৌন্দর্যচেতনায়ও বুদ্ধচরিত্র অতুলনীয়। এই গভীর সৌন্দর্য উপলব্ধিতেই জরা-ব্যাধি-মৃত্যুজনিত অসুন্দর পৃথিবীর প্রতি তাঁর অন্তর বিমুখ হয়ে উঠেছিল এবং এই অসুন্দরের হাত থেকে চিরতরে পরিত্রাণলাভের জন্যই তিনি তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

বস্তুত বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করে যে সংযম ও সৌন্দর্যসাধনার অপূর্ব বিকাশ হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ জাপানি চরিত্রের মধ্যে তারই প্রতিফলন দেখতে পেয়েছেন। বুদ্ধদেবের জীবনের মত বৌদ্ধ-সংঘের জীবনপ্রণালীও সংযম ও সামঞ্জস্যের সুরে বাঁধা। বিনয়ের বিধানগুলি দেখলে একথা সহজেই বুঝতে পারা যায়। বিনয়ের বিধান প্রধানত ভিক্ষুকের জন্য রচিত হলেও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সমগ্র বৌদ্ধ জনগণের জীবনযাত্রা প্রণালীকে প্রভাবিত করেছে। বিনয় পিটকের অন্তর্গত মহাবগ্‌গ, চুল্লবগ্‌গ ও পাতিমোক্‌খ প্রভৃতিতে যে সুন্দর ও সংযত জীবনযাত্রার বিবরণ দেখা যায় তা বর্তমান যুগেও যে-কোন সভ্যজাতির আদর্শ হতে পারে। পাতিমোক্‌খের অন্তর্গত 'সেখিয় ধম্ম'

[৩০] ভিক্খুবগ্‌গো—২, 'ধম্মপদ'

অধ্যায়ে বলা হয়েছে, শৈক্ষ্য[৩১] সুন্দরভাবে চীবর[৩২] পরিধান করে সংযত পদক্ষেপে জনপদে প্রবেশ করবেন। তিনি বাহুসঞ্চালন, মস্তকসঞ্চালন, উচ্চরব বা উচ্চহাস্য করবেন না। তিনি গৃহস্থের বাড়িতে সুন্দরভাবে উপবেশন করে আহার গ্রহণ করবেন। আহারের সময় মনোযোগী হবেন, পরিমিত গোলাকার গ্রাস করে মুখে দেবেন, বেশি মুখব্যাদান করবেন না।[৩৩] এরকম আরো অনেক বিধান এখানে উল্লিখিত হয়েছে। ধম্মপদে উক্ত হয়েছে—

যথাপি ভমরো পুপ্ফং বণ্ণগন্ধং অহেঠয়ং,
পলেতি রসমাদায় এবং গামে মুনী চরে।[৩৪]

অর্থাৎ, ভ্রমর যেমন পুষ্পের বর্ণগন্ধ নষ্ট না করে মধু আহরণ করে, ভিক্ষুও সেভাবে লোকালয়ে বিচরণ করবেন।

এভাবে বৌদ্ধ-সংঘে এক সুন্দর ও সংযত জীবনযাত্রার রীতি গড়ে উঠেছে। আর বৌদ্ধ-সংঘের এই জীবনধারার প্রতিফলন দেখা যায় বৌদ্ধগণজীবনে। রবীন্দ্রনাথ জাপানিদের সম্বন্ধে লক্ষ্য করেছেন যে, প্রতিটি কাজ এরা একান্ত নিবিষ্ট হয়ে এবং শোভনভাবে করে। দেখে তাঁর মনে হয়েছে, কাজের সমস্ত প্রণালীর মধ্যে আগাগোড়া এরা সমস্ত মনকে স্থাপিত করতে শিখেছে। একেই তিনি বলেছেন 'কর্মের মধ্যে ধ্যান'। এ সম্বন্ধে একদিনের সাধারণ একটি ঘটনা লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন—

একটি সাধারণ মেয়েকে খাবার সময় লক্ষ্য করে দেখেছি—পাত্র হাতে তুলে ধরা, গ্রাস মুখে তুলে নেওয়া, সমস্তই সুবিহিত যত্নে ও সংযত-ভাবে করে—আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে আহার ব্যাপারে যে অসংযম ও অশোভনতা আছে এ তার একেবারেই বিপরীত।[৩৫]

কাজেই জাপানিদের এই গুণ যে বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে পাওয়া এতে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

জাপানিদের এই সংযমের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে আবার একথাও বলেছেন যে—

জাপানের এই ধৈর্য এই শান্তি একেবারেই কাপুরুষের নয় এ কথা বলা বাহুল্য। স্বভাবকে বশে রেখে চাঞ্চল্যকে নিরোধ করে জাপান যে শক্তির বিকার বা খর্বতা ঘটিয়েছে, এ কথা বলা চলবে না।

---

[৩১] শিক্ষার্থী ভিক্ষু-শ্রমণ

[৩২] বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ব্যবহার্য গেরুয়া বসনকে চীবর বলে। উত্তরাসঙ্গ (বহির্বাস), অন্তর্বাস (অধোবস্ত্র) ও সঙ্ঘাটি (চাদর বিশেষ)—এই তিনটি নিয়ে ভিক্ষুদের ত্রিচীবর।

[৩৩] সেখিয় ধম্ম, 'ভিক্খু পাতিমোক্খ'

[৩৪] পুপ্ফবগ্গো—৬, 'ধম্মপদ'

[৩৫] ধ্যানী জাপান (১৯২৯), 'জাপানযাত্রী' (সংযোজন)

এই ধৈর্য ও শান্তি যথার্থই শক্তির পরিচয়। একটি কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ এ ভাবটি আরো সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।—

যে যথার্থ শক্তি সে তো শান্তিময়ী,
সৌম্য তাহার কল্যাণরূপ বিশ্বজয়ী।[৩৬]

এর থেকে বুঝতে পারা যায়, স্বভাবকে বশে রেখে চাঞ্চল্য নিরোধ করে জাপান বীর্যেরই অধিকারী হয়েছে। আর বুদ্ধদেব ত আত্মজয়কেই শ্রেষ্ঠ জয় বলে অভিহিত করেছেন।—

যো সহস্সং সহস্সেন সঙ্গামে মানুসে জিনে,
একঞ্চ জেয়্যমত্তানং স বে সঙ্গামজুত্তমো।[৩৭]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সংগ্রামে সহস্র সহস্র মানুষকে জয় করে তার তুলনায় যিনি কেবলমাত্র নিজেকে জয় করেন—তিনি সর্বোত্তম সংগ্রামজয়ী।

কাজেই জাপানিরা আত্মজয়ের দ্বারা যে বীর্যের অধিকারী হয়েছে তার মূল প্রবর্তনা যে বৌদ্ধধর্ম থেকে এসেছে এতে আর আশ্চর্য কি।

৬

বৌদ্ধধর্মে মুক্তির পক্ষে মানুষের আত্মশক্তির প্রাধান্য বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এর দ্বারা মানুষকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে জগতের অন্য কোন ধর্মে তার তুলনা বিরল। পৃথিবীর অন্যান্য প্রধান ধর্মসমূহে দেখা যায়, একজন ঈশ্বর বা সর্বনিয়ন্তা পরমপুরুষ আছেন, সমগ্র জগদ্ব্যাপার যাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সমস্ত মানুষকে যিনি পরিচালিত করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে—ঈশ্বর, আল্লা, গড্ ইত্যাদি। এঁদের সকলের স্বরূপ যে এক কিংবা কর্মপদ্ধতি অভিন্ন এমন কথা অবশ্য বলা যায় না। এতদ্‌সত্ত্বেও একদিক্ থেকে তাঁদের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, তাঁরা মানুষের এবং জগতের সবকিছুর নিয়ন্তা। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মানুষ নিজের দ্বারা নয়, বাইরের অন্য কোন শক্তির দ্বারা পরিচালিত। ভাগবত নীতিতে এই ভাবটি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়েছে—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ,
ত্বয়া হৃষীকেশ, হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।[৩৮]

অর্থাৎ, ধর্ম জানি তাতে আমার প্রবৃত্তি নেই, অধর্ম জানি তাতেও আমার

[৩৬] ভূমিকম্প, 'নবজাতক'
[৩৭] সহস্সবগ্গো—৪, 'ধম্মপদ'
[৩৮] কালীমোহন বিদ্যারত্ন সম্পাদিত 'হিন্দু সর্বস্ব' গ্রন্থে সংকলিত, পৃ. ২

নিবৃত্তি নেই। হে হৃষীকেশ, তুমি হৃদয়ে থেকে যাতে নিযুক্ত কর আমি তাই করি।

পক্ষান্তরে বৌদ্ধধর্মে দেখা যায়, মানুষ একমাত্র নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা। বৌদ্ধধর্মে এমন কোন মুক্তির কথা নেই যা স্বোপার্জিত নয়। বুদ্ধদেব কাউকে মুক্তি দেবেন বলে অঙ্গীকার করেন নি। এমন কি তিনি কাউকে মুক্তি দিতেও পারেন না, তিনি পথপ্রদর্শক (অক্খাতারো তথাগতা, ধম্মপদ ২৭৬) মাত্র। মানুষের মুক্তি যে সম্পূর্ণরূপে নিজের উপর নির্ভর করে একথা বুদ্ধদেব নানা জায়গায় নানাভাবে বলেছেন।—

অত্তদীপা বিহরথ অত্তসরণা অনঞ্ঞসরণা,
ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা।[৩৯]

অর্থাৎ, তোমরা আত্মদীপ হয়ে বিহার কর, আত্মশরণ ও অনন্যশরণ হও; ধর্মদীপ, ধর্মশরণ, অনন্যশরণ হও।

ধম্মপদেও একথা জোরের সহিত বলা হয়েছে—

অত্তাহি অত্তনো নাথো, কোহি নাথো পরো সিয়া?[৪০]

অর্থাৎ, নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা, এছাড়া অন্য ত্রাণকর্তা কে? কিংবা—

অত্তাহি অত্তনো নাথো, অত্তাহি অত্তনো গতি।[৪১]

—নিজেই নিজের প্রভু, নিজেই নিজের আশ্রয়।

অন্যান্য ধর্মমতের তুলনায় বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্ব এখানেই। মানুষের ধর্ম-চিন্তার ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের এই বিপ্লবাত্মক বাণীর গুরুত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই। বৌদ্ধধর্মের এই বিপ্লবী ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ রিস্ ডেভিডস্ বলেছেন—

> For the first time in the history of the world, it proclaimed a salvation which each man could gain for himself, and by himself, in this world, during this life, without any the least reference to the God, or to gods, either great or small.[৪২]

অর্থাৎ, বিশ্বের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মে সর্বপ্রথম এমন এক মুক্তির বাণী ঘোষিত হয়েছে, যেই মুক্তি প্রত্যেক মানুষ ইহলোকে জীবদ্দশাতেই অর্জন করতে সক্ষম। এর জন্য ঈশ্বর কিংবা ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন দেবতার সহায়তা বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই।

---

[৩৯] মহাপরিনিব্বান সুত্তং ২—৩১, 'দীঘনিকায়'
[৪০] ধম্মপদ, ১৬০
[৪১] ধম্মপদ, ৩৮০
[৪২] T. W. Rhys Davids, *Hibbert Lectures* (4th ed.), p. 29

এভাবে আত্মশক্তির প্রাধান্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মে যথার্থই মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তার প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের আত্মশক্তি উদ্‌বোধনের বাণী বারবার ধ্বনিত হয়েছে। রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মে মানুষের মর্যাদাকে তিনি বড় করে দেখেছেন বলে আত্মশক্তির উপর এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এজন্যই বৌদ্ধধর্মে মানুষের আত্মশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে মানুষকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন।...মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।[৪৩]

মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নহে একথা ঘোষণা করে এবং যাগযজ্ঞের অবলম্বন থেকে মুক্তি দিয়ে বুদ্ধদেব যথার্থই মানুষকে বড় করেছিলেন। আর মানুষ যে দৈবাধীন নহে, বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে শুধু একথা বললেও সব বলা হয় না। কেননা বৌদ্ধসাহিত্যের নানা স্থানে দেখা যায় ইন্দ্র, ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা-সহ দেবগণ নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের বন্দনা করছেন। এখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—চণ্ডীদাসের এই উক্তি এদিক্ থেকে বুদ্ধদেব তথা বৌদ্ধধর্মের দূরাগত প্রতিধ্বনি মাত্র। এমনি ভাবেই বৌদ্ধধর্মে মানুষকে দেবতার চেয়েও বড় অর্ঘ্য দান করা হয়েছে।[৪৪]

জাতক কাহিনীর উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন যে, বৌদ্ধধর্ম শুধু মানুষকে নয়, সমস্ত প্রাণীর ইতিহাসকে গৌরবদান করেছে। জাভায় বোরোবুদুর মন্দির দর্শন উপলক্ষে তিনি বলেছেন—

> এই মন্দিরে দেখতে পাই সর্বজনকে—রাজা থেকে আরম্ভ করে ভিখারি পর্যন্ত। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, এর মধ্যে শুদ্ধ মানুষের নয়, অন্য জীবেরও যথেষ্ট স্থান আছে। জাতক কাহিনীর মধ্যে খুব একটা মস্ত কথা আছে, তাতে বলেছে যুগ যুগ ধরে বুদ্ধ সর্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশ

[৪৩] মন্দির (১৯০০), 'বিচিত্র প্রবন্ধ'। 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে সংকলিত, পৃ. ৪৮

[৪৪] তুলনীয়—তুমি দেবতারও বড় আমার এ অর্ঘ্য ধর,
শৈব সাধু চন্দ্রধর বীর।
—কালিদাস রায়, চাঁদ সদাগর

প্রকাশিত।...জাতক কথায় অসংখ্য সামান্যের মধ্যে দিয়েই চরম অসামান্যকে স্বীকার করেছে। এতেই সামান্য এত বড়ো হয়ে উঠল। সেইজন্যেই এতবড়ো মন্দিরভিত্তির গায়ে গায়ে তুচ্ছ জীবনের বিবরণ এমন সরল ও নির্মল শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত। ধর্মেরই প্রকাশচেষ্টার আলোতে সমস্ত প্রাণীর ইতিহাস বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে মহিমান্বিত।[৬৫]

বুদ্ধদেব পূর্বে পূর্বে জন্মে হরিণ, ময়ূর, বানর, গরু প্রভৃতি প্রাণিরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। সাধারণ প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করেও তিনি প্রতি জন্মে দান, শীল, মৈত্রী, বীর্য প্রভৃতি কোন না কোন একটি পারমিতার[৬৬] পূর্ণতাসাধন করেছেন। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, যে-কোন প্রাণীই সুকৃতির ফলে মহৎ জীবনের অধিকারী হতে পারে এবং আপন কর্মের দ্বারা ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে সক্ষম। এ ছাড়া বুদ্ধদেব এভাবে জন্মে জন্মে সাধারণ প্রাণীর মধ্য দিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করাতেও বৌদ্ধধর্মে সমস্ত প্রাণীর ইতিহাস গৌরবলাভ করেছে।

৭

আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ্যসমাজসৃষ্ট বর্ণাশ্রমের যে জটিলতা দেখা যায়, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তার তুলনা বিরল। এর ফলে জাতিভেদ, বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি আমাদের সমাজদেহে বিস্তারলাভ করে তিলে তিলে তাকে পঙ্গু করেছে। একদিক থেকে বৌদ্ধধর্ম মূলত এই বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ। বৌদ্ধধর্ম মানুষের জন্মকৌলীন্যকে অস্বীকার করে মানুষে মানুষে সমতার আদর্শ স্থাপন করেছে। এটি বৌদ্ধধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগের অন্যতম প্রধান কারণ।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন যে, 'হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচার-মূলক।'[৬৭] এর ফলে একদিকে যেমন আমাদের দেশের সহস্র সহস্র লোক 'মানুষ হয়ে পশুর মত পীড়িত অবমানিত'[৬৮], আবার অন্য দিকে বিদেশী কোন সাধুব্যক্তিকেও আমাদের 'দ্বারস্থ কুক্কুরের ন্যায় মনে মনে দূরস্থ করিতে ইচ্ছা করে'।[৬৯] অন্যকে ঘৃণা করলে অন্যের ঘৃণাভাজন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই

[৬৫] জাভা-যাত্রীর পত্র—১৯ (১৯২৭)

[৬৬] বৌদ্ধমতে দশটি পারমিতা—দান, শীল, নৈষ্কর্ম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা

[৬৭] হিন্দুমুসলমান (১৯২২), 'কালান্তর'

[৬৮] ছোটো আশ্বিন (১৯৩২), 'মহাত্মা গান্ধী'

[৬৯] বিদেশী অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য (১৮৯৪), 'সমাজ'

এবং এই মানবঘৃণাই আমাদের দেশের এক অক্ষয় কলঙ্কের কারণ। রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার অবতারণা করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথের পরিণত চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে পরেশবাবুর মুখ দিয়ে তিনি বলেছেন—

> একটা বিড়াল পাতের কাছে বসে ভাত খেলে কোনো দোষ হয় না অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়, মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপমান এবং ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায় সেটাকে অধর্ম না বলে কী বলব? মানুষকে যারা এমন ভয়ানক অবজ্ঞা করতে পারে তারা কখনোই পৃথিবীতে বড়ো হতে পারে না, অন্যের অবজ্ঞা তাদের সইতেই হবে।[৩৩]

জাতিভেদের এই সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ গোরাকে যেখানে নিয়ে এলেন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম সত্যের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। গোরা যখন জানতে পারল যে সে হিন্দু নয়, তখন সে উপলব্ধি করল—আজ সে সত্যই মুক্ত, তার আর পতিত হবার ভয় নেই, তাকে শুচিতা বাঁচিয়ে চলতে হবে না। এই উপলব্ধি নিয়ে সে পরেশবাবুকে বলল—

> আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।...আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আমার আর অপবিত্রতার ভয় রইল না। পরেশবাবু, আজ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি—মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে এতদিন পরে তা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি।

তারপর গোরা আনন্দময়ীর কাছে গিয়ে বলল—

> মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।
>
> মা, এইবার তোমার লছমিয়াকে ডাকো। তাকে বলো আমাকে জল এনে দিতে।

আনন্দময়ীর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানের ভারতবর্ষ। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকেও দেখতে চেয়েছেন এই কল্যাণের প্রতিমারূপে—যেখানে জাত থাকবে না, বিচার থাকবে না, ঘৃণা থাকবে না। রবীন্দ্রনাথের

[৩৩] 'গোরা', ২৩ অধ্যায়, রচনাবলী (প-ব সরকার) ৯ম খণ্ড, পৃ. ১১৬

'ভারততীর্থ' কবিতা (১৮ আষাঢ় ১৩১৭) 'গোরা' উপন্যাসের সমকালে রচিত। এখানেও কবি জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষকে আহ্বান করেছেন।—

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার—
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।[৪১]

যে ব্রাহ্মণ মানুষের জন্মগত পার্থক্যকে প্রাধান্য দিয়ে আমাদের দেশে বিভেদমূলক কৃত্রিম সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, রবীন্দ্রনাথ তার মনকে এখানে অশুচি বলে ধিক্‌কার দিতেও কুণ্ঠিত হন নি। পক্ষান্তরে বুদ্ধদেবের যে উদার ধর্মমত মানবীয় অধিকার হতে বঞ্চিত অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য মানুষকেও মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকা খুবই স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> ভগবান বুদ্ধ একদিন রাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন। সে তপস্যা সকল মানুষের দুঃখমোচনের সংকল্প নিয়ে। এই তপস্যার মধ্যে কি অধিকারভেদ ছিল? কেউ ছিল কি ম্লেচ্ছ, কেউ ছিল কি অনার্য? তিনি তাঁর সব-কিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মূর্খতম মানুষেরও জন্যে। তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁর সেই এত বড়ো তপস্যা আজ কি ভারতবর্ষ থেকে বিলীন হবে?[৪২]

বৌদ্ধধর্মে একদিকে যেমন মানুষের জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে আবার অন্য দিকে অনার্য ম্লেচ্ছ বলেও কাউকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় নি। বুদ্ধদেব বলেছেন, "গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরযূ, মাহী প্রভৃতি নদনদী যেমন মহাসমুদ্রে এসে পূর্বের নাম-গোত্র পরিত্যাগ করে মহাসমুদ্ররূপে পরিগণিত হয়, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্র সকল জাতের লোক তথাগতের দেশিত ধর্মবিনয়ে প্রব্রজিত হয়ে পূর্বের নাম-গোত্র ত্যাগ করে এবং শ্রমণ শাক্যপুত্র নামে পরিচিত হয়।"[৪৩] রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' (১৯২৬) নাটকে দেখা যায়, রত্নাবলী যখন ভিক্ষু উপালিকে নাপিতের ছেলে, সুনন্দকে গোয়ালার ছেলে এবং সুনীতকে পুক্কুসজাতীয়[৪৪] বলে অবজ্ঞা করছিলেন, তখন ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণা বলেছেন, "রাজকুমারী, এঁরা জাতিতে সবাই এক, ওঁদের

---

[৪১] ভারততীর্থ, 'গীতাঞ্জলি'

[৪২] বুদ্ধদেব, 'বুদ্ধদেব', পৃ. ৯-১০

[৪৩] উপোসথ সুত্ত, 'উদানং' (খুদ্দকনিকায়)

[৪৪] আবর্জনা পরিষ্কারকারী অস্পৃশ্য জাতিবিশেষ। P. T. S. *Pali-English Dictionary* (1959), p. 462

আভিজাত্যের সংবাদ তুমি জান না।" এই উক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম সত্য ব্যক্ত হয়েছে এবং এখানেই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের ভাবসাযুজ্য।

জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি যেসকল প্রথা আমাদের দেশে ধর্মের নামে চলে আসছে প্রকৃতপক্ষে তা ধর্মমোহেরই নামান্তর। এমনি ভাবে ধর্মের নামে বহু নিরর্থক অন্ধসংস্কারও আমাদের দেশে মানুষের স্বাধীন মঙ্গলবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে সমগ্রজাতিকে 'আপাদমস্তক জড়ীভূত' করে রেখেছে। এখানেই যান্ত্রিক বাহ্য আচারের দ্বারা ধর্মের নিত্যস্বরূপ আবৃত। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন—

> আমাদের দেশ আচারনিষ্ঠতার দেশ বলেই দেবতার চেয়ে পাণ্ডার পা-পুজোর 'পরে আমাদের ভরসা বেশি। বাহিরকে ঘুষ দিয়ে অন্তরকে তার দাবি থেকে বঞ্চিত করতে পারি, এমনতরো বিশ্বাস আমাদের ঘোচে না। আমরা মনে করি, দড়ির উপরে যদি প্রাণপণে আস্থা রাখি তা হলেই সে নাড়ী হয়ে ওঠে। এই বাহ্যিকতার নিষ্ঠা মানুষের দাসত্বের দীক্ষা।[৩৪]

এই বাহ্যিক নিষ্ঠার দাসত্ব বা ধর্মমোহ একদিক থেকে আমাদের দেশের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি করেছে। এর দ্বারা মানুষের চিত্ত সংকীর্ণ ও বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছন্ন হয়। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ এই ধর্মমোহের চেয়ে এমন কি নাস্তিকতাকেও আমাদের দেশের পক্ষে শ্রেয়ঃ মনে করতেন। একবার মনীষী রোমাঁ রোলাঁর নিকট কথাপ্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ মন্তব্য করেন।[৩৫] নাস্তিকতা একদিকে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে উজ্জ্বল করে আবার অন্য দিকে মানুষকে কল্যাণের প্রেরণা দেয়। এ প্রসঙ্গে 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) উপন্যাসের নাস্তিক জ্যাঠামশাইয়ের চরিত্র স্মরণীয়। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে ধর্মমূঢ় মানুষের চেয়ে নাস্তিক অনেক বড়।—

> নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
> ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
> শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
> শাস্ত্রে মানে না, মানে মানুষের ভালো।[৩৬]

বৌদ্ধধর্ম বাহ্যিক আচারনিষ্ঠার দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্তিদান করেছে। বুদ্ধদেব এমন কোন মুক্তির কথা বলেন নি যা বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা লাভ করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে দেখা যায়, বুদ্ধদেব যাগযজ্ঞাদি বাহ্যিক

---

[৩৪] চরকা (১৯২৫), 'কালান্তর'

[৩৫] Alex Aronson and Krishna Kripalani Ed. *Rolland and Tagore*, p. 100

[৩৬] ধর্মমোহ (১৯২৬), 'পরিশেষ'

অনুষ্ঠানের অসারতা প্রতিপাদন করেছেন।[৫৮] এবং নগ্নচর্যা, মন্ত্রাচার, কেশ উৎপাটন, মাসার্দ্ধে একবার ভোজন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিন বার অবগাহন, শীতের রাতে হিমশীতল জলে স্নান প্রভৃতি আচারকে নিরর্থক বলে ঘোষণা করেছেন।[৫৯] থেরী পূর্ণিকা উদকশুদ্ধিক ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করে বলেছেন, "স্নানশুদ্ধি দ্বারা পাপমুক্তি হয় এ কথা কে তোমাকে বলেছে? এ মূঢ় কর্তৃক মূঢ়ের প্রতি উপদেশ। স্নানশুদ্ধিতে পাপমুক্তি হলে ভেক, কচ্ছপ, সর্প, কুম্ভীরাদি জলচরগণের স্বর্গপ্রাপ্তি নিশ্চিত।"[৬০] ধম্মপদেও উক্ত হয়েছে—

কিং তে জটাহি দুম্মেধ, কিং তে অজিনসাটিয়া,
অব্ভন্তরং তে গহণং বাহিরং পরিমজ্জসি।[৬১]

"রে দুর্মেধ, তোমার জটা কিংবা মৃগচর্ম ধারণের প্রয়োজন কি? তোমার অভ্যন্তর ক্লেদপূর্ণ, কেবল বাইরে পরিমার্জন করছ।"

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই অনুধাবন করেছেন যে—

> বিশেষ স্থানে গিয়ে, বিশেষ মন্ত্র পড়ে, বিশেষ অনুষ্ঠান করে মুক্তি লাভ করা যায়, এই বিশ্বাসের অরণ্যে যখন মানুষ পথ হারিয়েছিল তখন বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিষ্কার ও প্রচার করবার জন্যে এসেছিলেন যে, স্বার্থত্যাগ করে, সর্বভূতে দয়া বিস্তার করে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেললে তবেই মুক্তি হয়; কোনো স্থানে গেলে, বা জলে স্নান করলে, বা অগ্নিতে আহুতি দিলে, বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাটি শুনতে নিতান্তই সরল, কিন্তু এই কথাটির জন্যে একটি রাজপুত্রকে রাজ্যত্যাগ করে বনে বনে, পথে পথে, ফিরতে হয়েছে। মানুষের হাতে এটি এতই কঠিন হয়ে উঠেছিল।[৬২]

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে আচ্ছন্ন বিভ্রান্ত ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানুষকে সহজ সত্য মুক্তিপথের সন্ধান দিলেন। বুদ্ধদেব দিগন্তপ্রধাবিত ধ্বনিতে ঘোষণা করলেন—যাগযজ্ঞ, মন্ত্রতন্ত্র ও বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের কোন সার্থকতা নেই, মানুষের মুক্তি সৎকর্মে ও সদাচরণে। এদিক্ থেকে দেখতে গেলে বুদ্ধদেব যথার্থই 'বৈদিক ধর্মের বিদ্রোহী সন্তান'।

চিরাচরিত প্রথা ও শাস্ত্রের অন্ধ অনুকরণ নয়, বৌদ্ধধর্ম বিচার ও মননের ধর্ম। এদিক্ থেকে বৌদ্ধধর্ম আধুনিক মনেরই সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

---

[৫৮] কূটদন্ত সুত্ত, 'দীঘনিকায়'
[৫৯] কস্সপ-সীহনাদ সুত্ত, 'দীঘনিকায়'। জটিল সুত্ত, 'উদানং'
[৬০] থেরী গাথা ২৪০-৪১, 'খুদ্দকনিকায়'
[৬১] ব্রাহ্মণবগ্গো—১২, 'ধম্মপদ'
[৬২] ভক্ত (১৯০৯), 'শান্তিনিকেতন' (২য় খণ্ড)

আধুনিক বুদ্ধিবাদী মানুষ নির্বিচারে কিছু মানতে চায় না, সবকিছুকে বিচার-বিশ্লেষণ করে জানতে চায়। বৌদ্ধধর্মেও এমন কোন কথা নেই যা নির্বিচারে গ্রহণ করতে হবে। জগতে একমাত্র বৌদ্ধধর্মেই এই আহ্বান করা হয়েছে, 'এহি পস্‌সিকো' বা এসে দেখ।[৬০] এই আহ্বান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষা ও পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে। কেননা বৌদ্ধধর্মে কোন গুপ্ত রহস্য বা আচার্য-মুষ্টি নেই।[৬১] তা না হলে এই উদাত্ত ঘোষণা কিছুতেই সম্ভব হত না। বিভিন্ন মতবাদের প্রভাবে সংশয়গ্রস্ত কেশপুত্রনিবাসী কালামগণকে সম্বোধন করে বুদ্ধদেব বলেছেন যে, "শ্রুতিতে (বেদে) আছে বলে, চিরাচরিত প্রথা বলে কিংবা বক্তার ভব্যরূপে মুগ্ধ হয়ে নির্বিচারে কোন কিছু গ্রহণ করবে না। যখন নিজেরা উপলব্ধি করতে পারবে এই ধর্ম শুদ্ধ, নির্দোষ এবং কল্যাণপ্রদ একমাত্র তখনই তা গ্রহণ করবে।"[৬২] জগতের প্রধান ধর্মমতসমূহের মধ্যে একমাত্র বৌদ্ধধর্মেই এমন উদার স্বাধীন বাণীর সাক্ষাৎলাভ করা যায়। এদিক্ থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ নিতান্ত স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন—

> যে-কোনো সমাজেই কর্মকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ডের উপরে বসিয়েছে সেই-খানেই মানুষের সকল বিষয়ে পরাভব। বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে ভারতের মধ্যযুগের সাধু সাধক যাঁদেরই দেখি, যাঁরাই এসেছেন পৃথিবীতে কোনো মহাবার্তা বহন করে, তাঁরা সকলেই অন্যমনস্ক যান্ত্রিক বাহ্য আচারের বিরোধী।[৬৩]

বুদ্ধদেব থেকে আরম্ভ করে ভারতের মধ্যযুগের যেসকল সাধু সাধকেরা পৃথিবীতে মহাবার্তা বহন করে এনেছেন, এদিক্ থেকে তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেবই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ এখানে বিশেষ করে বুদ্ধদেবের নাম উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি সমস্ত জীবনব্যাপী মানুষের চিরাচরিত প্রথা ও অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তিনি মানার চেয়ে জানাকে, কর্মকাণ্ডের চেয়ে জ্ঞানকাণ্ডকে বড় বলে মনে করতেন। সাময়িক উত্তেজনায় যেখানে মানুষের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত, নিত্যসত্যের চেয়ে বাহ্যিক বিধান যেখানে প্রবল, কর্মকাণ্ড সেখানে জ্ঞানকাণ্ডকে অতিক্রম করে এসেছে, সেখানেই রবীন্দ্রনাথের রুদ্ররোষ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। আর ইতিহাসের

---

[৬০] B. M. Barua, Buddhism—its modern appeal, *Ceylon Lectures*, p. 291

[৬১] মহাপরিনিব্বান সুত্তং ২-২৫, 'দীঘনিকায়'

[৬২] কেসমুত্তি সুত্ত, 'অঙ্গুত্তরনিকায়' ৩।৭।৫

[৬৩] চরকা (১৯২৫), 'কালান্তর'

মহাপথে বুদ্ধদেব-প্রমুখ যেসকল জ্যোতির সাধক 'বিধান-মানা মানুষের' এসকল কৃত্রিম বিধানের উপর জ্ঞান ও মননের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ চিরদিন তাঁদেরই উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন।

খ। তত্ত্বচিন্তায়

রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার আলোকে বৌদ্ধ-ধর্ম ও সংস্কৃতি যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এতদ্‌ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের যে তত্ত্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন তা বর্তমান আলোচনার বিষয়। কিন্তু এর পূর্বে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ মূলত তত্ত্বজিজ্ঞাসু দার্শনিক নন, তিনি রসস্রষ্টা কবি। কবি জগৎ ও জীবনের মধ্যে যা কিছু দেখেন তাকে অনেকটা নিজের মত করে সৃষ্টি করে নেওয়াই তাঁর স্বভাবধর্ম। বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বরূপ আলোচনা করতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ তাই করেছেন। সেজন্য এখানে বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বের চেয়ে কবির আদর্শবাদ অনেকক্ষেত্রে বড় হয়ে উঠেছে।

ব্রহ্মবিহার

একদিক্ থেকে দেখতে গেলে বৌদ্ধধর্ম আলোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিহারের উপর সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই ব্রহ্মবিহারকে তিনি কতবার কতভাবে প্রকাশ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এর থেকে অনুমান করা যায়, এই ব্রহ্মবিহারের আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে ব্রহ্মবিহার আলোচনার পূর্বে ব্রহ্মবিহারের স্বরূপ নির্ণয় করা প্রয়োজন।

ব্রহ্মবিহার ব্রহ্মলোকে যাবার উপায় বা মার্গ। এই ভাবনার দ্বারা কোন না কোন একটি ব্রহ্মলোকে উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মবিহারে চার প্রকার ভাবনা উল্লিখিত হয়েছে—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা। মৈত্রী-ভাবনা দ্বারা সর্বলোকের সকল প্রাণীর মঙ্গল চিন্তা করা হয়; এতে মানুষের চিত্ত বৃহতের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। করুণা-ভাবনা বিশেষভাবে দুঃখদুর্দশাগ্রস্ত মানবের জন্য। পরের সুখে সুখী হওয়া মুদিতা-ভাবনার লক্ষ্য; এর বিপরীত ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা। আর রাগ, ভয়, মোহ ও পক্ষপাতমুক্ত হয়ে সর্বকিছুকে নিরাসক্তভাবে সমদৃষ্টিতে দেখাই উপেক্ষা-ভাবনার উদ্দেশ্য।[৭৭] রবীন্দ্রনাথ

[৭৭] M. M. N. Pieris, Four Sublime Abidings, *The Buddhist*, Oct 1964, p. 63

বিশেষভাবে মৈত্রীভাবনার কথাই বলেছেন। পালি 'সুত্তনিপাত' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মেত্তাসুত্ত' বা মৈত্রীসূত্রের যে অংশবিশেষ রবীন্দ্রনাথ বহুবার উল্লেখ করেছেন তা কবির নিজস্ব অনুবাদসহ এখানে উদ্ধৃত করা গেল।—

মাতা যথা নিযং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তমনুরকখে
এবম্পি সব্বভূতেসু
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ
অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।
তিট্‌ঠং চরং নিসিন্নো বা
সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং
ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

"মা যেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেইপ্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে। উর্ধ্বে অধোতে চার-দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে। যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যন্ত, এইপ্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে ব্রহ্মবিহার বলে।"[৮৮]

এরপর ব্রহ্মবিহার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়—মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালোবাসেন সেইরকম ভালোবাসা।
>
> ব্রহ্মের অপরিমিত মানস যে বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে, এক পুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই প্রেম যে তাঁর সর্বত্র। তাঁরই সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে সে তো ব্রহ্মবিহার হল না।
>
> কথাটা খুব বড়ো। কিন্তু, বড়ো কথাই যে হচ্ছে, বড়ো কথাকে ছোটো কথা করে তো লাভ নেই। ব্রহ্মকে চাওয়াই যে সকলের চেয়ে বড়োকে চাওয়া। উপনিষৎ বলেছেন : ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। ভূমাকেই, সকলের চেয়ে বড়োকেই, জানতে চাইবে।...

[৮৮] ব্রহ্মবিহার (১৯০৯), 'বুদ্ধদেব', পৃ. ২০-২১

> অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীকে সর্বত্র প্রসারিত করে দিলে ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয়।[৬৯]

রবীন্দ্রনাথ এখানে তাঁর নিজস্ব ধর্মীয় চিন্তা এবং চিন্তপ্রবণতা নিয়ে ব্রহ্মবিহারকে অনেক দূরে পর্যন্ত টেনে এনেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ব্রহ্ম-বিহারের ব্যাখ্যা করেছেন তার থেকে মনে হয় এর পশ্চাতে কবির মনে ঔপনিষদিক ভাবধারা জাগ্রত ছিল। সেজন্য তিনি ব্রহ্মবিহার প্রসঙ্গে এসকল উক্তি করেছেন। ব্রহ্মকে চাওয়াই যে সকলের চেয়ে বড় বা চরম লক্ষ্য, এমন কথা বুদ্ধদেব কোথাও বলেন নি। ব্রহ্মবিহারে শুধু বলা হয়েছে, এই মার্গ অনুসরণ করলে ব্রহ্মলোকে উৎপত্তি হয়। কিন্তু এখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। বুদ্ধদেব বর্ণিত এই ব্রহ্মবিহার উপনিষদের 'একমেব অদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মপ্রাপ্তি নয়। আর, বৌদ্ধশাস্ত্রে কথিত ব্রহ্মলোকের সংখ্যাও অনেক। ব্রহ্মা ও মহাব্রহ্মাগণ এখানে দেবতাবিশেষ। বৌদ্ধমতে যে চরম সত্য নির্বাণ তা ব্রহ্মলোকের অনেক ঊর্ধ্বে।[৭০] ব্রহ্মলোক থেকে চ্যুতি হতে পারে এবং ব্রহ্মাগণও জন্মমৃত্যুর অধীন। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে তৃষ্ণাক্ষয়ে যে নির্বাণের কথা বলা হয়েছে, সেখানে জন্মমৃত্যুর অনুশাসন নাগাল পায় না।

ঔপনিষদিক ব্রহ্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিহারকে এক করে দেখেছেন। রবীন্দ্রমানস আবাল্য উপনিষদের ভাবধারায় পরিপুষ্ট। সেজন্য যেই তিনি ব্রহ্মবিহারের কথা শুনেছেন অমনি তাঁর মনে হয়েছে সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা, যিনি অনাদি-অনন্ত এবং প্রেমময়। এই ধারণা নিয়েই তিনি বলেছেন, ব্রহ্মকে চাওয়াই সকলের চেয়ে বড় চাওয়া। ব্রহ্মের যে অপরিমিত মানস বিশ্বের সর্বত্র রয়েছে, তাঁর সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে সে তো ব্রহ্মবিহার হল না। ব্রহ্মবিহার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন—

> মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে।...কিন্তু, প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ, প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা; সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলই দেওয়া।
>
> যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা, সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ—তিনি নেন না।[৭১]

রবীন্দ্রনাথ এখানেও ব্রহ্মবিহারকে ব্রহ্মের স্বরূপের মধ্যে টেনে এনেছেন।

---

[৬৯] ব্রহ্মবিহার, 'বুদ্ধদেব', পৃ. ২১-২২
[৭০] বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি সম্পাদিত 'অভিধর্মার্থ সংগ্রহ' (১৯৪০), পৃ. ১৬৩
[৭১] ব্রহ্মবিহার, 'বুদ্ধদেব', পৃ. ১৭

আর, প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া কিংবা স্বতই আনন্দ স্বতই পূর্ণতা, এসব রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধ্যানধারণাপ্রসূত উক্তি। বৌদ্ধশাস্ত্রে কোথাও এর সমর্থন পাওয়া যায় না, বরঞ্চ একদিক্ থেকে এর বিপরীত ভাবই দৃষ্টিগোচর হয়। প্রেম এখানে তৃষ্ণা বা আসক্তিরই নামান্তর। জীবজগতের সকল দুঃখের মূলেই রয়েছে এই তৃষ্ণা। ধম্মপদে উক্ত হয়েছে—

> পেমতো জায়তে সোকো পেমতো জায়তে ভয়ং,
> পেমতো বিপ্পমুত্তস্স নত্থি সোকো কুতো ভয়ং।[৭২]

অর্থাৎ, প্রেম থেকে শোক ও ভয় উৎপন্ন হয়, প্রেম থেকে মুক্ত ব্যক্তির শোক কিংবা ভয় থাকে না।

> তণ্হায় জায়তে সোকো তণ্হায় জায়তে ভয়ং,
> তণ্হায় বিপ্পমুত্তস্স নত্থি সোকো কুতো ভয়ং।[৭৩]

অর্থাৎ, তৃষ্ণা থেকে শোক উৎপন্ন হয়, তৃষ্ণা থেকে ভয় উৎপন্ন হয়; যিনি তৃষ্ণা-বিমুক্ত তাঁর শোক থাকে না, ভয়ই বা কোথায়?

এর থেকে বুঝতে পারা যায়, রবীন্দ্রনাথের এই প্রেমবিষয়ক উক্তি বৌদ্ধ-মতের অনুবর্তী নয়। এমন কি নিখিলের প্রতি যে প্রেমের বিস্তার তা'ও বৌদ্ধমতে একেবারে আসক্তিমুক্ত নয়। প্রেম, তৃষ্ণাদি সকল আসক্তি জয় করে যে নির্বাণ, বৌদ্ধমতে তাকেই চরম সত্য বলে অভিহিত করা হয়।

ব্রহ্মবিহারের বিশ্বব্যাপী প্রেমের আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে এমনভাবে অভিভূত করেছে যে, তিনি এই ব্রহ্মবিহারকে নির্বাণের চেয়েও প্রাধান্য দান করেছেন। আসলে এই ব্রহ্মবিহারের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়ার মত উপাদান রবীন্দ্রনাথের নিজের মধ্যেই ছিল। কবিরূপে রবীন্দ্রনাথ চিরদিন জগতে প্রেম ও প্রীতির অর্ঘ্যই দিয়ে এসেছেন। এদিক্ থেকে ব্রহ্মবিহারের বিশ্বপ্রেমের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, এমন বিশ্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন তিনি আর কোথাও খুঁজে পান নি।[৭৪] রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বমানবতার আদর্শও যে এর দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছে সে অনুমান করা অসংগত হবে না। আর ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্মের এই বিশ্বপ্রেমের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করে দেশে দেশে যে তার অক্ষয় প্রেমের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে সে কথা রবীন্দ্রনাথ বহুবার উল্লেখ করেছেন। এসকল কারণেই রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিহারের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

---

[৭২] ধম্মপদ—২১৩
[৭৩] ধম্মপদ—২১৬
[৭৪] বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ, 'বুদ্ধদেব', পৃ. ৩৫

নির্বাণ

ব্রহ্মবিহারের মত নির্বাণের তত্ত্বটিও রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশেষ চিন্তপ্রবণতার জন্য সম্যকভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি নির্বাণ সম্বন্ধে যেসকল উক্তি করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব উক্তি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আর কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যে রূপরসানুভূতির জগতে আনন্দের জগতে বিচরণ করেন সেখানে নির্বাণের আদর্শকে গ্রহণ করা সত্যই কঠিন।

নির্বাণের আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে দেখেছেন তা কবির বিভিন্ন উক্তি থেকে বুঝতে পারা যায়। তিনি এক স্থানে বলেছেন—

> যারা বলে ধর্মনীতিই বৌদ্ধধর্মের চরম তারা ঠিক কথা বলে না। মঙ্গল একটা উপায় মাত্র। তবে নির্বাণই চরম? তা হতে পারে, কিন্তু সেই নির্বাণটি কী? সে কি শূন্যতা?
>
> যদি শূন্যতাই হত তবে পূর্ণতার দ্বারা তাতে গিয়ে পৌঁছনো যেত না। তবে কেবলই সমস্তকে অস্বীকার করতে করতে, 'নয় নয় নয়' বলতে বলতে, একটার পর একটা ত্যাগ করতে করতেই, সেই সর্ব-শূন্যতার মধ্যে নির্বাপণ লাভ করা যেত।
>
> কিন্তু, বৌদ্ধধর্মে সে পথের ঠিক উল্টা পথ দেখি যে। তাতে কেবল তো মঙ্গল দেখছি নে, মঙ্গলের চেয়েও বড়ো জিনিসটি দেখছি যে।[৭৩]

রবীন্দ্রনাথের মতে এই সবচেয়ে বড় জিনিসটি হল প্রেম। কেননা 'প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা'। এই প্রেমই হল ব্রহ্মের স্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র একথাই আবার একটু অন্যভাবে বলেছেন—

> সমস্ত বাসনা ও কর্ম নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া নির্বাণমুক্তির মধ্যেই আপনাকে একেবারে 'না' করিয়া দেওয়াই যে বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্য নহে তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। সর্বভূতের প্রতি প্রেম জিনিসটি শূন্য পদার্থ নহে।...প্রেমের দ্বারা সমস্ত সম্বন্ধ সত্য এবং পূর্ণ হয়, কোনো সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। অতএব প্রেমের চরমে যে বিনাশ ইহা কোনোমতেই শ্রদ্ধেয় নহে।[৭৪]

এমনি ভাবে রবীন্দ্রনাথ বারবার একথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, প্রেমই হল পূর্ণতা বা পরম সত্য। তাঁর মতে সর্বশূন্যতার মধ্যে নির্বাপণ লাভ করা যেমন প্রকৃত নির্বাণ নয় তেমনি সমস্ত বাসনা নিঃশেষে ধ্বংস করে নির্বাণ-মুক্তিকেও তিনি বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেন না। বৌদ্ধধর্ম

---

[৭৩] ব্রহ্মবিহার, 'বুদ্ধদেব', পৃ. ১৭

[৭৪] বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ, 'বুদ্ধদেব', পৃ. ৩৫

সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এসকল উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। বৌদ্ধধর্মে প্রেমকে কোথাও চরম সত্য বলা হয় নি। আর সমস্ত বাসনা নিঃশেষে ধ্বংস করে যে নির্বাণ তাকেই বৌদ্ধধর্মে চরম সত্য বলে অভিহিত করা হয়। নদীসমূহের স্বাভাবিক গতি যেমন সমুদ্রাভিমুখী তেমনি বৌদ্ধধর্মের সমস্ত ধ্যানধারণা ও দার্শনিক চিন্তা নির্বাণাভিমুখী।

বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণের প্রসঙ্গ প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। এখানে তার বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই। নির্বাণ সম্বন্ধে বিভিন্ন উক্তির মধ্যে যে বিষয়টির উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে সেটি হল তৃষ্ণা। আসক্তি বা বন্ধনেরই নামান্তর তৃষ্ণা। বৌদ্ধধর্মে এই তৃষ্ণাকেই সকল দুঃখের মূল কারণ হিসাবে নির্দেশ করা হয়। সেজন্য বলা হয়েছে, 'তণ্হায় বিপ্পহানেন নিব্বানং'—তৃষ্ণার বিনাশই নির্বাণ।[৭৭] আবার অন্যত্র দেখা যায়, 'নিব্বন্তি ধীরা যথায়ং পদীপো'—এই প্রদীপের ন্যায় ধীরগণ নির্বাণপ্রাপ্ত হন।[৭৮] তৃষ্ণার বিনাশ ও প্রদীপের নির্বাণ একই ভাব প্রকাশ করে।

নির্বাণের কথাটি বুদ্ধদেবের মনে কিভাবে উদিত হয় সে সম্বন্ধে একটি সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ কাহিনী আছে। মহাভিনিষ্ক্রমণের দিন রাজকুমার সিদ্ধার্থ শুনতে পেলেন তাঁর একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু এই সংবাদ শুনে তিনি কোনরূপ আনন্দ প্রকাশ করতে পারলেন না। পৃথিবীর জরা-ব্যাধি-মৃত্যু দুঃখ তখন তাঁর প্রাণকে গভীর বেদনায় আকুল করে তুলেছে। তিনি শুধু বললেন, 'রাহুলো জাতো, বন্ধনং জাতং'—রাহুল জন্মেছে, বন্ধন জন্মেছে। গভীর ভাবনা নিয়ে তিনি রাজপথে বেরিয়ে আসেন। এই সময়ে তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর দিব্যকান্তি দেখে ক্ষত্রিয় কন্যা কৃশাগোতমী আনন্দে গেয়ে ওঠে—

> নিব্বুতা নূন সা মাতা, নিব্বুতো নূন সো পিতা।
> নিব্বুতা নূন সা নারী যস্সায়ং ঈদিসো পতি।[৭৯]

অর্থাৎ, নিবৃত সেই মাতার হৃদয়, নিবৃত সেই পিতার হৃদয় (যাঁদের এমন পুত্র); নিবৃত সেই নারীর হৃদয় যাঁর এমন পতি।

মুগ্ধা নারীর এই প্রেমগীতি শুনে রাজকুমার সিদ্ধার্থ ভাবতে লাগলেন,—এই নারী বলছে এরূপ কাউকেও দেখলে মায়ের হৃদয় জুড়িয়ে যায়, পিতার হৃদয় জুড়িয়ে যায়, স্ত্রীর হৃদয় জুড়িয়ে যায়। তাহলে ত নিখিল মানবের

---

[৭৭] সংযুত্তনিকায় ১।৩৯

[৭৮] সুত্তনিপাত—২৩৫

[৭৯] অভিধম্মস্স নিদানানি ১।৮৭; এন. কে. ভাগবত সম্পাদিত (জাতক) নিদান কথা, পৃ. ৮২

হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে এক অনির্বাণ জ্বালা। সকলেই এখানে জ্বলেপুড়ে মরছে। সবাই চায় এই জ্বালা নির্বাপণ করতে এবং এর জন্য মানুষ দিশেহারা হয়ে এদিক্ ওদিক্ ছুটে চলেছে। কিন্তু মানুষ যে পথে ছুটে চলেছে সে পথে হৃদয়ের জ্বালা নির্বাপিত হয় না। মানুষের নিরন্তর কামনা-বাসনা তাকে দুঃখ থেকে দুঃখান্তরে নিয়ে যাচ্ছে, এর কোন নিবৃত্তি নেই। তখন সিদ্ধার্থের মনে এই ভাবনার উদয় হল,—সকলেই চায় হৃদয়জ্বালার নির্বাণ, কিন্তু 'কস্মিং নু খো নিব্বুতে হদয়ং নিব্বুতং নাম হোতি',—কি নিভে গেলে হৃদয়ের সকল জ্বালা নিভে যায়? এই মহাজিজ্ঞাসার সমাধানের জন্যই রাজপুত্র তাঁর সমস্ত রাজ্য-সংসার ত্যাগ করেছিলেন। তারপর তিনি সাধনাবলে এই সত্য উপলব্ধি করলেন যে, মানুষের সকল দুঃখের মূলেই রয়েছে তৃষ্ণা এবং এই তৃষ্ণাক্ষয়েই নির্বাণ।[৮০] যেহেতু সকল দুঃখের মূলোচ্ছেদ করে নির্বাণ লাভ হয় সেজন্য আবার বলা হয়েছে, 'নিব্বানং পরমং সুখং'—নির্বাণই পরম সুখ।[৮১] এসকল থেকে বুঝতে পারা যায়, নির্বাণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা স্বকল্পিত।

শাশ্বতবাদ

নির্বাণ, ব্রহ্মবিহার এবং মুক্তির কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে জিনিসটির কথা বারবার বলেছেন সেটি হল প্রেম। এই প্রেমধারণার মূলে রয়েছে একটি শাশ্বতবাদ। সামগ্রিকভাবে ভারতীয় ধর্মচিন্তাও এই শাশ্বতবাদ বা একটি পরমার্থ সত্যকে কেন্দ্র করে। ভারতীয় মনের স্বাভাবিক প্রবণতা এক পরম পুরুষের অভিমুখী। এদিক্ থেকে রবীন্দ্রনাথও ব্যতিক্রম নন। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে এই পরমার্থ সত্য কিভাবে প্রতিভাত হয়েছে সে সম্বন্ধে ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।—

> রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, বিশ্বপ্রবাহের পিছনে একটি মঙ্গলময় আত্ম-সচেতন সত্য রহিয়াছেন; তিনি এক অনন্ত প্রকাশকামী পুরুষ।...আসলে প্রত্যেকটি মানুষ হইল এক পরম পুরুষ মহাদেবের (মহান্ দেবের) এক একটি বিশিষ্ট ধ্যানকণা। যিনি পরমপুরুষ পরমাত্মা তিনি হইলেন পরম প্রেম; তাঁহারই ধ্যানকণা-স্বরূপ মানুষের মধ্যেও সঞ্চারিত সেই পরম প্রেমেরই কণা। জীবজগতে সেই প্রেম মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছে আত্মকেন্দ্রিকতার বেড়াজাল অতিক্রমের তীব্র আবেগ নিজের সকল শুভবুদ্ধিকে বিস্তারিত করিয়া দিতে নিখিল মানবের দিকে। পরম কল্যাণ-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া

[৮০] সংযুত্তনিকায় ৩।১৯০
[৮১] ধম্মপদ—২০৩, ২০৪

> নিখিল মানবের জন্য নিজের চেতনাকে ঊর্ধ্বে অধে চতুর্দিকে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়াই মানুষের পরম ধর্ম, ইহাই যথার্থ মানুষের ধর্ম।[৮২]

এর থেকে বুঝতে পারা যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রথমে শাশ্বতবাদকেই মূল সিদ্ধান্ত হিসাবে ধরে নিয়েছেন। এর উপর ভিত্তি করে তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আত্মার প্রকাশেই মুক্তি এবং প্রেমের বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়। ব্রহ্মের যে অপরিমিত মানস বিশ্বের সর্বত্র রয়েছে, তাঁর মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম মেশালে তবেই ব্রহ্মকে কিংবা পরম সত্যকে পাওয়া যায়।

কিন্তু বৌদ্ধধর্মকে এরকমভাবে গ্রহণ করার মধ্যে একটা গোড়ায় গলদ রয়েছে। ঔপনিষদিক কিংবা বলা যেতে পারে ভারতীয় ধর্মচিন্তার সঙ্গে বুদ্ধদেবের ধর্মীয় দৃষ্টির একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। যে আত্মা ও শাশ্বত-বাদকে নিয়ে ভারতীয় ধর্মচিন্তার মূল ভিত্তি, বুদ্ধদেব তাকে অবান্তর ও অনর্থকর হিসাবে প্রথমেই অগ্রাহ্য করেছেন। এ বিষয়ে মালুঙ্ক্যাপুত্র ও পোট্ঠপাদের সঙ্গে বুদ্ধদেব যে আলোচনা করেছেন তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। কাজেই বুদ্ধদেবের ধর্মীয় দৃষ্টির এই বিশেষত্বটুকু বিস্মৃত হয়ে আত্মা, পরমাত্মা ও শাশ্বতবাদের মাধ্যমে তাঁর ধর্মমতকে দেখতে গেলে ভুল করাই স্বাভাবিক। একটি মাত্র সূত্রে সমগ্র বৌদ্ধদর্শনকে প্রকাশ করে বলা যায়, এর নাম 'অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম' দর্শন।[৮৩] ঔপনিষদিক ভাবধারা থেকে বুদ্ধের ধর্মমত এখানে সম্পূর্ণ পৃথক।

ভক্তিবাদ

মহাযান বৌদ্ধধর্মে যে ভক্তির বিকাশ হয়েছিল সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ' নামক প্রবন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। বৌদ্ধধর্মের এই ভক্তির দিক্‌টা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। একথা তাঁর নিজের উক্তি থেকেই বুঝতে পারা যায়।—

> বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যদি এমন-কিছু থাকে যাহা আমাদের হৃদয়কে টানে এবং পরিতৃপ্ত করে, তবে জানিব, তাহার মর্মটি, তাহার ধর্মটি সেই জায়গাতেই আছে।[৮৪]

---

[৮২] শশিভূষণ দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬৬ বর্ষ, রবীন্দ্র-সংখ্যা, পৃ. ৩২৩

[৮৩] মহানিদান সুত্ত, 'দীঘনিকায়', ২।১৫। 'ধম্মপদ' ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯

[৮৪] বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ, 'বুদ্ধদেব', পৃ. ২৬

এখানে 'এমন-কিছু' বলতে রবীন্দ্রনাথ ভক্তির কথাই বলেছেন। তিনি মনে করেন মানুষের ভক্তিবৃত্তি একটা সত্য পদার্থ, তাকে কোন রকমে অবজ্ঞা করা যায় না। ভক্তিকে অবজ্ঞা করলে সে তার প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ে না। এইজন্যই দেখা যায় বৌদ্ধধর্মে একদিন যে জ্ঞান ও আত্মশক্তির প্রাধান্য দিয়ে ভক্তিকে অবহেলা করেছে কালক্রমে ভক্তি এসে সেই স্থান দখল করেছে। তিনি আরো বলেছেন যে, ধর্মকে সচলতার প্রতি দৃষ্টি রেখে বিচার করতে হবে, যেখানে এসে থেমে গেছে সেখানে তার আসল পরিচয় নয়।—

> ইতিহাসের কোনো-একটা বিশেষ স্থানে যাহা থামিয়া গিয়াছে তাহাকেই বৌদ্ধধর্ম বলিব—আর, যাহা মানুষের জীবনের মধ্যে নব নব কালে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, নব নব থাদাকে আত্মসাৎ করিয়া আপন জীবনকে পরিপুষ্ট প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে, তাহাকে বৌদ্ধধর্ম বলিব না—এই যদি পণ করিয়া বসি তবে কোনো জীবিত ধর্মকে ধর্ম নাম দেওয়া চলে না।[৮৩]

এই যুক্তি মেনে নিয়েও বলা যায়, সচলতার নামে ধর্ম কতটা বিস্তার লাভ করেছে কিংবা মূল আদর্শকেই বিকৃত করেছে সে কথা ভেবে দেখা প্রয়োজন। বৌদ্ধধর্মে মূলত যে জ্ঞান ও আত্মশক্তির প্রাধান্য ছিল তাকে যদি ভক্তির জলে একেবারে ডুবিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেখানে ধর্ম বিস্তার লাভ করেছে না আদর্শচ্যুত হয়েছে, সে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আসে। জাপানে বৌদ্ধধর্মের ভক্তির প্লাবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের তুলনা করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনেও কি ভক্তির আতিশয্য ও বিকার দেখা যায় নি? এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

> যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
> মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
> ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
> উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
> নাহি চাহি নাথ।[৮৪]

আমাদের দেশের বৈষ্ণবীয় ভক্তির আতিশয্যের দিক্‌টাই যে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির লক্ষ্য ছিল সে অনুমান করা অসংগত নয়। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশে শক্তিপূজাকে অবলম্বন করেও যে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, তাকে মানুষের ভক্তিবৃত্তির স্বাভাবিক প্রকাশরূপে গ্রহণ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন 'ভয়ার্ত ক্ষুধার্ত মানুষের

---

[৮৩] বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ, 'বুদ্ধদেব', পৃ. ২৮
[৮৪] অপ্রমত্ত, 'নৈবেদ্য'

বিলাপ'।[৮৭] কাজেই বৌদ্ধধর্মের এই ভক্তির মূলেও মানবপ্রকৃতির কোন অন্ত-র্নিহিত দুর্বলতা অত্যধিক প্রাধান্য লাভ করেছে কিনা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

পালিশাস্ত্রোক্ত বৌদ্ধধর্মে শ্রদ্ধা কথাটির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ধ্যানসমাধির জন্যও এই শ্রদ্ধা অপরিহার্যরূপে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই শ্রদ্ধা প্রধানত জ্ঞানমূলক। আর, রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মে ভক্তির বিকাশের কথা বলতে গিয়ে যেসকল দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সেখানে জ্ঞানের লেশমাত্র অবশিষ্ট আছে কিনা সন্দেহ।—

> হোনেন বলিয়াছেন, বড়ো বড়ো ভারী পাথর যেমন জাহাজকে আশ্রয় করিয়া অনায়াসে সমুদ্র পার হইয়া যায়, তেমনি পর্বতাকার পাপের বোঝা-সত্ত্বেও আমরা অমিত বুদ্ধের দয়াবলেই জন্মমৃত্যুর সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারি। হোনেন স্পষ্টই বলেন, 'কখনো মনে করিয়ো না আমরা স্বকর্মের বলে নিজের আন্তরিক ক্ষমতাতেই পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইতে পারি, অসাধুও বুদ্ধের শক্তিপ্রভাবে পরমগতি লাভ করে'।[৮৮]

হোনেন যা-ই বলুন না কেন, বুদ্ধদেব একথা কোন দিন বলেন নি। বুদ্ধদেব কাউকেও মুক্তি দিতে পারেন না, তিনি পথপ্রদর্শক মাত্র।[৮৯] আর আত্মশরণই যে বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বৌদ্ধধর্মে এই ভক্তি কিভাবে পরিণতি লাভ করেছে সেকথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন—

> অবশেষে এই নামের মাহাত্ম্যে নির্ভর এতদূর পর্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, অজ্ঞানে ভ্রমক্রমে নাম-উচ্চারণ করিলেও মহাপাপী উদ্ধার পায় এমন বিশ্বাস ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।[৯০]

আমাদের দেশে একটি লৌকিক বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, মরা মরা বলতে গিয়েও যদি কোনরকমে পাপী ব্যক্তির মুখে রাম নাম উচ্চারিত হয় তাহলে সে মুক্তি পাবে। এখানে অবিকল সেই জিনিসটিই আমরা দেখতে পাই। জীবনে যখন গ্লানির লক্ষণ দেখা দেয়, মানুষের পুরুষকার যখন এতটুকুও অবশিষ্ট থাকে না, একমাত্র তখনই দুর্বল ভীরু মানুষের মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে পারে। মহাযানের এই অন্ধবিশ্বাসের মূলেও রয়েছে তাই।

এর থেকে বুঝতে পারা যায়, ধর্ম বিশেষ স্থানে বা কালে যেভাবে আচরিত হয় সেখানে ধর্মের প্রকৃত আদর্শ খুঁজতে যাওয়া অনেক সময় বিড়ম্বনা মাত্র।

---

[৮৭] যাত্রায়িনিকের পত্র, 'কালান্তর'
[৮৮] বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ, 'বুদ্ধদেব', পৃ. ৪৩
[৮৯] ধম্মপদ, ২৭৬
[৯০] বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ, 'বুদ্ধদেব', পৃ. ৪৫

এর চেয়ে বরং রবীন্দ্রনাথ 'বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ' (১৯১১) প্রবন্ধ লেখার আরো আট বৎসর পরে যে মত প্রকাশ করেছেন তার সঙ্গে একমত হয়ে বলা উচিত— "কোনো ধর্মসাধনার উচ্চ অর্থ যদি দেশের কোনো বিশেষ শাস্ত্র বা সাধকের মধ্যে কথিত বা জীবিত থাকে তবে তাকে সম্মান করা কর্তব্য। এমন-কি, ভূরিপরিমিত প্রচলিত ব্যবহারের চেয়েও তাকে বড়ো বলে জানা চাই। ধর্মকে পরিমাণের দ্বারা বিচার না করে তার উৎকর্ষের দ্বারা বিচার করাই শ্রেয়।"[১১]

মহাযান বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে যে পরিণতি লাভ করেছে সেখানে এসে অনেকক্ষেত্রে তাকে বৌদ্ধধর্ম বলে চেনাই যায় না। বুদ্ধদেবের যে জ্ঞান ও যুক্তিমূলক ধর্ম জগতের চিন্তাশীল মনীষিগণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যে ধর্ম আধুনিক মনের পক্ষেও বিশেষ উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে, সেই উন্নত ধর্মীয় আদর্শের সঙ্গে বাংলাদেশের সহজসাধনা-রূপ বীভৎস পরিণতির তুলনা করলেই একথা বুঝতে পারা যাবে।[১২]

মহাযান বৌদ্ধধর্ম যে একদিক্ থেকে নব নব ধ্যানধারণা ও দার্শনিক মতবাদের দ্বারা পল্লবিত বিকশিত হয়েছে, সে কথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। সৃষ্টিধর্মিতা প্রাণশক্তিরই লক্ষণ। প্রাণ আপন প্রাচুর্যে সর্বদা সৃষ্টি করে নেয়। কিন্তু সেই সৃষ্টি মূলের প্রতিবাদ করছে কিনা দেখা প্রয়োজন। পল্লবিত শাখাটি যদি মূল বৃক্ষের পত্রপুষ্পের সঙ্গে স্বাভাবিক সামঞ্জস্যের স্থলে সরাসরি প্রতিবাদ করে বসে তাহলে বুঝতে হবে পরগাছা আশ্রয় করেছে।

'ধর্মকে তার উৎকর্ষের দ্বারা বিচার করাই শ্রেয়' এবং এর সঙ্গে আরো বলা প্রয়োজন, ধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান পরিচয়। বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে একথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। পূর্বেই বলা হয়েছে, পালি-শাস্ত্রোক্ত থেরবাদ বৌদ্ধধর্মকে মূলত 'অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম'—এই একটিমাত্র সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত বলা যেতে পারে। এখানে কোন ঈশ্বর বা সৃষ্টি-কর্তার স্থান নেই। মূল ভারতীয় ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের এখানেই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মহাযান মতবাদে বৌদ্ধধর্মের এই বৈশিষ্ট্যটুকুই অস্বীকার করা হয়। এখানে 'অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা'র বিপরীত ভাবই দেখা যায়।[১৩] শুধু তাই নয়, বুদ্ধকেও এখানে লোকোত্তর হিসাবে কল্পনা করে বলা হয়, বুদ্ধ অনাদি ও অনন্ত।[১৪] তা ছাড়া আরো কত বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের কল্পনা করা হয়েছে এখানে সে আলোচনার অবকাশ নেই। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, বুদ্ধদেব

[১১] শক্তিপূজা (১৯১৯), 'কালান্তর'

[১২] বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় সং), পৃ. ১৫৩-৫৪

[১৩] R. Kimura, What is Buddhism? *Journal of the Department of Letters.* Vol. 4, p. 195.

[১৪] ঐ পৃ. ১৯৩

দেখা হয়েছে এবং মানবগুরুকে ত্রাণকর্তারূপে পূজা করার রীতি প্রচলিত হয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। বুদ্ধদেব অবশ্য তাঁকে পূজা করার কোন নির্দেশ দেন নি। বরং মহাপরিনির্বাণের পূর্বমুহূর্তেও তিনি শিষ্যদের বারবার আত্মশরণ ও অনন্যশরণের কথা বলেছেন, তাঁর দেহাবসানে ধর্ম ও বিনয়কে শাস্তারূপে গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছেন।[১০১] কিন্তু বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর ভক্তবৃন্দ তাঁকে পূজার বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইতিপূর্বে আর কোন মানবগুরু এভাবে মানুষের পূজা লাভ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন, যে বৈদিক দেবতাগণ ইতিপূর্বে মানুষের পূজা লাভ করেছিলেন তাঁরা সবাই স্বর্গবাসী দিব্যপুরুষ।[১০২] এদিক্ থেকে বুদ্ধদেব যথার্থই এশিয়ার প্রথম শ্রেষ্ঠ মানবগুরু। আর বুদ্ধদেব নিজেকে ত্রাণকর্তারূপে পরিচয় না দিলেও কালক্রমে ভক্তদের দৃষ্টিতে মহান ত্রাণকর্তারূপে প্রতিভাত হয়েছেন। বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধধর্মে এই ভাবটি প্রাধান্য লাভ করেছে। এভাবে বৌদ্ধমতের অনুসরণ করে যে পরবর্তী কালে যিশুকে ত্রাণকর্তারূপে স্বীকার করা হয়েছে, সে অনুমান অসংগত মনে হয় না। খ্রীষ্টধর্ম আরো নানা দিক্ থেকে যে বৌদ্ধমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, এবিষয়ে আধুনিক পণ্ডিতগণের আর সন্দেহের অবকাশ নেই। বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্ত ও আদর্শের সঙ্গে খ্রীষ্টের জীবন ও বাণীর বহু সাদৃশ্য দেখা যায় এবং এর মূলে রয়েছে অনেকটা বৌদ্ধধর্মের প্রভাব।[১০৩] আর খ্রীষ্টের জন্মের বহুকাল পূর্বে অশোকের সময় যে বৌদ্ধধর্ম মিশর সিরিয়া প্রভৃতি দেশে প্রসারলাভ করেছে, ইতিহাসের এই তথ্য এখানে মনে রাখা প্রয়োজন।[১০৪]

বৌদ্ধধর্মের দ্বারা বৈষ্ণবধর্মের যে পুষ্টিসাধন হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের এই ধারণাও ইতিহাসসম্মত। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্তসহ আরো উল্লেখ করেছেন—

> দ্রাবিড় হইতেই যে প্রেমের ধর্মের স্রোত সমস্ত ভারতবর্ষে একদিন ব্যাপ্ত হইয়াছে সেই বৈষ্ণবধর্মকেও কি এই বৌদ্ধধর্মই সঞ্জীবিত করিয়া তোলে নাই? আমরা দেখিয়াছি বৌদ্ধ মন্দিরে বৈষ্ণব দেবতা স্থান লইয়াছে, এককালে যাহা বুদ্ধের পদচিহ্ন বলিয়া পূজিত হইত তাহাই বিষ্ণুপদচিহ্ন বলিয়া গণ্য হইয়াছে, রথযাত্রা প্রভৃতি বৌদ্ধ উৎসবকে বৈষ্ণব আত্মসাৎ করিয়াছে।[১০৫]

---

[১০১] মহাপরিনিব্বান সুত্ত, 'দীঘনিকায়'
[১০২] বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ, 'বুদ্ধদেব', পৃ. ৩২
[১০৩] D. R. Bhandarkar, *Asoka* (3rd Ed.), pp. 146-47
[১০৪] প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ধর্মবিজয়ী অশোক', পৃ. ১৪
[১০৫] বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ, 'বুদ্ধদেব', পৃ. ৩২

এতদ্‌ব্যতীত 'বৌদ্ধধর্ম্মের সার্ব্বভৌম প্রেম ও মৈত্রীভাব, অহিংসা দয়া দাক্ষিণ্য, মনুষ্যে মনুষ্যে সাম্যভাব ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ, বর্ণবিচার বর্জনে আপামর সাধারণের জ্ঞান-ধর্ম্মে সমান অধিকার' প্রভৃতি উদার নীতি গ্রহণ করে বৈষ্ণব-ধর্মের যথার্থ পুষ্টিসাধন হয়েছে।[১০৬] এমন কি শেষ পর্যন্ত স্বয়ং বুদ্ধদেবকে পর্যন্ত বিষ্ণুর অবতার হিসাবে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। মনে হয় এখানেই বৈষ্ণবধর্মের চরম কৃতিত্ব। যা হক, একদিক্‌ থেকে দেখতে গেলে শুধু বৈষ্ণবধর্ম নয়, বৌদ্ধধর্মের দ্বারা সমগ্রভাবে ভারতীয় ধর্ম প্রভাবিত হয়েছে। বুদ্ধদেবের অনুপম চরিত্রমাধুর্য এবং মহান উদার ধর্মীয় আদর্শ ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-ভূমিকে যেভাবে উর্বর ও সরস করেছে তার প্রভাব চিরদিন জাগ্রত থাকবে। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন যথার্থই বলেছেন, 'একদিক্‌ থেকে বুদ্ধদেবই আধুনিক হিন্দুধর্মের স্রষ্টা'।[১০৭] কিংবা বিবেকানন্দের সঙ্গে একযোগে বলা যায়, 'হিন্দুধর্ম স্বাভাবিক পূর্ণতালাভ করেছে বৌদ্ধধর্মের মধ্যেই'।[১০৮] এ দুয়ের মধ্যে ইতিহাস কোন উক্তিরই প্রতিবাদ করবে না।

গ। শিক্ষাদর্শে

রবীন্দ্রসাহিত্য ও বৌদ্ধসংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধ ভাবধারার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনার সার্থকতা আছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার সঙ্গে বিশ্বভারতী এক নিবিড় যোগসূত্রে জড়িত। তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে আদর্শ ও ধ্যানধারণাকে প্রকাশ করেছেন, বিশ্বভারতীতে সে আদর্শকেই রূপায়িত করতে চেয়েছেন। বস্তুত বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের বাণীসাধনার সংহত মূর্ত প্রতীক।[১০৯]

শান্তিনিকেতন আশ্রম তথা বিশ্বভারতীর মূলে রয়েছে প্রাচীন ভারতের তপোবনের অনুপ্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সে তপোবন তিনি ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পান নি, পেয়েছেন কবির কাব্য থেকে।[১১০] কিন্তু বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মূলে একমাত্র কবির কাব্য থেকে পাওয়া তপোবনের আদর্শ নয়, সত্যকারের ইতিহাসের প্রেরণাও সক্রিয় ছিল। এই ইতিহাস প্রধানত বৌদ্ধ-যুগের ইতিহাস। প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় তথা বৌদ্ধ ভাবধারার

---

[১০৬] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বৌদ্ধধর্ম' (২য় সং), পৃ. ৩০১-২

[১০৭] P. V. Bapat Ed., *2500 Years of Buddhism*, p. xvi, Foreword, Sarvapalli Radhakrishnan

[১০৮] Swami Vivekananda, *Chicago Address* (13th Ed.), p. 38

[১০৯] সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, বিশ্বভারতী ও বৌদ্ধ ভাবধারা, ভারতবর্ষ, ১৩৭০ বৈশাখ

[১১০] 'আত্মপরিচয়'-৬

দ্বারা বিশ্বভারতী বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তা ছাড়া তপোবনের কথা বলতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধযুগের কথা স্মরণ করেছেন।—

> বন ভারতবর্ষের চিত্তকে নিজের নিভৃত ছায়ার মধ্যে, নিগূঢ় প্রাণের মধ্যে, কেমন করে পালন করেছে। ভারতবর্ষে যে দুই বড়ো বড়ো প্রাচীন যুগ চলে গেছে, বৈদিক যুগ ও বৌদ্ধ যুগ, সে দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান্ বুদ্ধও কত আম্রবন কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন; রাজ-প্রাসাদে তাঁর স্থান কুলায় নি, বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল।[১১১]

বাস্তবিকই বৈদিক ঋষিদের মত ভগবান বুদ্ধও নিভৃত বনচ্ছায়াতেই তাঁর সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। গিরিরাজ হিমালয়ের পাদদেশে যেমন তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল তেমনি তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন গয়া, রাজগৃহ, ইসিপতন মৃগদাব, মংকুল পর্বত (বিহার), পারিলেয়া বন (মির্জাপুর), সুংসুমার গিরি (চুনার), চালিয় পর্বত (বিহার), শ্রাবস্তীর জেতবন প্রভৃতি স্থানসমূহে।[১১২] এর থেকে অনুমান করা যায় নিভৃত বনভূমি কিভাবে তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ও বৌদ্ধ ভাবাদর্শের কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণদান উপলক্ষে তিনি বলেছেন—

> য়ুনিভার্সিটির প্রথম প্রতিরূপ একদিন ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছিল। নালন্দা বিক্রমশিলা তক্ষশিলার বিদ্যায়তন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নিশ্চিত কালনির্ণয় এখনো হয় নি, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, য়ুরোপীয় য়ুনিভার্সিটির পূর্বেই তাদের আবির্ভাব। তাদের উদ্ভব ভারতীয় চিত্তের আন্তরিক প্রেরণায়, স্বভাবের অনিবার্য আবেগে। তার পূর্ববর্তী কালে বিদ্যার সাধনা ও শিক্ষা বিচিত্র আকারে ও বিবিধ প্রণালীতে দেশে নানা স্থানে ব্যাপ্ত হয়েছিল, এ কথা সুনিশ্চিত। সমাজের সেই সর্বত্র-পরিকীর্ণ সাধনাই পুঞ্জীভূত কেন্দ্রীভূত রূপে এক সময়ে স্থানে স্থানে দেখা দিল।...সে যুগে সে বিদ্যার মহৎমূল্য দেশের লোক গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল; তাকে সমগ্র সম্পূর্ণতায় কেন্দ্রীভূত করে সর্বজনীন জ্ঞানসত্র রচনা করবার ইচ্ছা স্বতই ভারতবর্ষের মনে সমুদ্যত হয়েছিল সন্দেহ নেই। ভগবান বুদ্ধ একদিন যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন সে ধর্ম তার নানা তত্ত্ব, নানা

---

[১১১] তপোবন (১৯০৯), 'শিক্ষা'

[১১২] রাহুল সাংকৃত্যায়ন, 'বৌদ্ধদর্শন', পৃ ১১, ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত

অনুশাসন, তার সাধনার নানা প্রণালী নিয়ে সাধারণচিত্তের আন্তর্ভৌম স্তরে প্রবেশ করে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তখন দেশ প্রবলভাবে কামনা করেছিল এই বহুশাখায়িত পরিব্যাপ্ত ধারাকে কোনো কোনো সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রস্থলে উৎসরূপে উৎসারিত করে দিতে সর্বসাধারণের স্নানের জন্য, পানের জন্য, কল্যাণের জন্য।[১১৩]

বিদ্যার মহৎমূল্যকে ভারতবর্ষ কোনদিন অস্বীকার করে নি। অতি প্রাচীন-কাল থেকে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মকে অবলম্বন করে ভারতবর্ষের শিক্ষার ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু বিদ্যার ক্ষেত্রেও বৌদ্ধযুগের একটি বিশেষত্ব আছে। এ যুগে বিদ্যাশিক্ষা সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হবার বিশেষ সুযোগ লাভ করেছে এবং বিদ্যায়তনগুলিও সত্যকারের সর্বজনীন জ্ঞানসত্রে পরিণত হয়েছে। বৈদিক যুগ থেকে আমাদের দেশে যে গুরুগৃহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, সেখানে মাত্র অল্পসংখ্যক ছাত্র একজন গুরুর নিকট অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করত। সেজন্য দেখা যায় বৌদ্ধ সঙ্ঘের সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা যে বৃহৎ বিদ্যায়তনসমূহ গড়ে উঠেছে, ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় তা সম্ভব ছিল না।[১১৪] তা ছাড়া, ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজে বিদ্যাশিক্ষা সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণের স্বার্থবুদ্ধি একদিকে যেমন ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়কে বিদ্যাশিক্ষার স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যাকে নিজেদের 'প্রভুত্বরক্ষণীরূপে' নিযুক্ত করেছে।[১১৫] রামায়ণে শূদ্র শম্বুকের মধ্য দিয়ে এসকল বঞ্চিত ও নিগৃহীত মানবাত্মার করুণ আর্তনাদ শুনতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধযুগের বিদ্যায়তনসমূহ সকল দেশের অভ্যাগতের জন্য উন্মুক্ত ছিল। পৃথিবীর দূর-দূরান্তের বিদ্যার্থীরা এসে এখানে তাঁদের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করতেন। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে এমন কোন আন্তর্জাতিক বিদ্যায়তনের কথা জানা যায় না। আর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে যে তপোবনের কথা বলেছেন সে তপোবনকে 'বিশ্ববিদ্যাপ্রাঙ্গণ' বলা যায় কিনা সন্দেহ। এদিক্ থেকে দেখতে গেলে বিশ্বভারতীর সঙ্গে বৈদিক ঋষির তপোবন নয়, নালন্দা প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়েরই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লক্ষ্য করেছেন—

> নালন্দায় ভারত আপন জ্ঞানের অন্নসত্র খুলেছিল স্বদেশবিদেশের সকল অভ্যাগতের জন্য। ভারত সে দিন অনুভব করেছিল, তার এমন

---

[১১৩] বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ (১৯৩২), 'শিক্ষা'

[১১৪] R. K. Mookerji, *Ancient Indian Education* (2nd ed.), p. 460

[১১৫] বঙ্কিমচন্দ্র, 'সাম্য' (শতবার্ষিক সং), পৃ. ৭

সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে সকল মানুষকে দিতে পারলে তবেই যার চরম সার্থকতা।[১১৬]

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর মূলেও রয়েছে এই আদর্শ। আধুনিক বিশ্বভারতীর মধ্যে প্রাচীন নালন্দাই যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। বিশ্বভারতীর জ্ঞানের অন্নসত্রও আজ দেশবিদেশের সকল অভ্যাগতের জন্য উন্মুক্ত। বিশ্বভারতী নামের মধ্যেও এই ইংগিতটুকু ধরা পড়ে। আর বিশ্বভারতীর কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বারবার উচ্চারণ করেছেন এই বাণী,—'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'—যেখানে সমগ্র বিশ্ব একনীড়ে ঠাঁই পাবে। ১৯২১ সালে (৮ পৌষ ১৩২৮) বিশ্বভারতী পরিষদ্-সভার প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণের উপসংহারে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেন—

> পূর্বে যে সংঘ ও বিহারের দ্বারা ভারতের সার্থকতা-সাধন হয়েছিল, তাদেরই এ যুগের উপযোগী করে, সেই পুরাতন আরণ্যককে বিশ্বভারতীরূপে এখানে পত্তন করা হয়েছে।[১১৭]

এই উক্তি থেকেও বুঝতে পারা যায় বিশ্বভারতী কিভাবে প্রাচীন বৌদ্ধ বিদ্যায়তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

বুদ্ধদেব তথা বৌদ্ধ ভাবধারার দ্বারা বিশ্বভারতী কিভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি উক্তি থেকে আরো স্পষ্ট প্রমাণিত হবে।—

> আধুনিক কালের পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমা ভেঙে গেছে, মানুষ পরস্পরের নিকটতর হয়েছে, এই সত্যকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মানুষের এই মিলনের ভিত্তি হবে প্রেম, বিদ্বেষ নয়। মানুষ বিষয়-ব্যবহারে আজ পরস্পরকে পীড়ন করছে, বঞ্চিত করছে, এ কথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সত্যসাধনায় পূর্ব-পশ্চিম নেই। বুদ্ধদেবের শিক্ষা ভারতবর্ষের মাটিতে উদ্ভূত হয়ে চীনদেশে গিয়ে মানবচিত্তকে আঘাত করল এবং ক্রমে সমস্ত এশিয়াকে অধিকার করল। চিরন্তন সত্যের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ নেই। এই বিশ্বভারতীতে সেই সত্যসাধনার ক্ষেত্রকে আমার গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার।[১১৮]

বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন যে, বুদ্ধদেব সমস্ত মানুষের দুঃখমোচনের জন্য যে সাধনা করেছেন, ভারতবর্ষের মধ্যে আবার সেই সাধনাকে জাগ্রত করে তুলতে হবে। বর্তমান পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের খর্বতা,

---

[১১৬] বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, 'শিক্ষা'
[১১৭] 'বিশ্বভারতী', পরিশিষ্ট
[১১৮] 'বিশ্বভারতী'-৪ (১৯২২)

অপূর্ণতা ও চরম বেদনার দিনে এর প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশি। তাই কবি সকলের নিকট আকুলভাবে প্রার্থনা করেছেন যেন তাঁরা সকলে মিলে বিশ্ব-ভারতীকে এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করার ভার গ্রহণ করেন।[১১৯]

বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধ ভাবধারা ও ঐতিহ্যের নিদর্শন হিসাবে বৌদ্ধশাস্ত্রের চর্চা, দেশবিদেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সমাগম, চীনভবন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তা ছাড়া শান্তিনিকেতনের মধ্যে বৌদ্ধযুগের নানা স্মৃতি বিরাজিত। চীনভবনের প্রাচীরচিত্রসমূহ, 'নন্দন' সম্মুখস্থ বিরাট বুদ্ধমূর্তি, সঙ্গীতভবন-সন্নিহিত সুজাতার প্রতিমূর্তি এবং 'উদয়ন' ও অন্যত্র বুদ্ধমূর্তিসমূহ দেখলে সামগ্রিকভাবে প্রাচীনযুগের বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের কথাই আমাদের মনে পড়ে। বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধযুগের ঐতিহ্য ও ভাবধারাকে সযত্নে রক্ষা করার সর্বতোমুখী প্রয়াস এসকল থেকে অনুমান করা কঠিন নয়।

পরিশেষে এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। একবার করাচিতে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথকে একজন ছাত্র প্রশ্ন করেছিল, "আপনাকে ত সবাই 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করে, আপনার গুরু কে?" রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমারও একজন গুরু আছেন, তোমরা সবাই তাঁকে জান। তিনি হলেন বুদ্ধদেব।"[১২০]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও শিক্ষাদর্শ পর্যালোচনা করলে এই উক্তির সত্যতা-নিরূপণ সহজ হবে।

ঘ। সাহিত্যে

নাটকে

ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশের অধিক নাটক রচনা করেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বন করেও তিনি কম নাটক রচনা করেন নি। কিন্তু এর মধ্যে বৌদ্ধযুগের কাহিনী নিয়েই তিনি সর্বাধিক নাটক রচনা করেন। তা ছাড়া বৌদ্ধযুগের আখ্যান অবলম্বনে রচিত প্রায় সব কটি নাটককেই তিনি বিভিন্ন সময়ে রূপান্তর সাধন করেন। পৌরাণিক কাহিনী-অবলম্বনে-রচিত আর কোন নাটককে রবীন্দ্রনাথ এতবার এতরূপে লেখেন নি। 'রাজা' নাটকটিকে তিনি চার বার রূপান্তরিত করেছেন। আবার সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পরেও 'পরিশোধ'-এর পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপ দিয়েছেন 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে।

---

[১১৯] 'বিশ্বভারতী'-১১ (১৯২৪)

[১২০] আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট এই তথ্য জানতে পারি।

এর থেকে বৌদ্ধ কাহিনীগুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে 'কথা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত বৌদ্ধযুগের কাহিনী নিয়ে রচিত কবিতাগুলি স্মরণীয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত সংস্কৃত অবদান সাহিত্য (১৮৮২) প্রকাশের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ এর অন্তর্গত বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বনে ১৮৯৬ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত অনেক নাটক ও আখ্যানকবিতা রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য।—

> অনেক ঘটনা আছে যা জানার অপেক্ষা করে, সেই জানাটা আকস্মিক। এক সময়ে আমি যখন বৌদ্ধ কাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ করে আমার মনের মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ 'কথা ও কাহিনী'র গল্পধারা উৎসের মতো নানা শাখায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।...কিন্তু এই 'কথা ও কাহিনী'র রূপ ও রস একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনে আনন্দের আন্দোলন তুলেছিল, ইতিহাস তার কারণ নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মাই তার কারণ।...সন্ন্যাসী উপগুপ্ত বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কী মহিমায়, এ কী করুণায়, প্রকাশ পেয়েছিল। এ যদি যথার্থ ঐতিহাসিক হত তা হলে সমস্ত দেশ জুড়ে 'কথা ও কাহিনী'র হরির লুট পড়ে যেত। আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি তার পূর্বে এবং তার পরে এ-সকল চিত্র ঠিক এমন করে দেখতে পায় নি। বস্তুত, তারা আনন্দ পেয়েছে এই কারণে, কবির এই সৃষ্টিকর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্য থেকে।[২২১]

এর থেকে উপলব্ধি করা যায় এই বৌদ্ধ কাহিনীগুলি রবীন্দ্রনাথের মনে কিভাবে 'আনন্দের আন্দোলন' তুলেছে। আর এই কাহিনীগুলি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কাব্যে ও নাটকে যে রূপ ও রস সৃষ্টি করেছেন এমন করে অন্য কেউ পারেন নি —কি এদেশে কি বিদেশে। জনপ্রিয়তার দিক্ থেকেও রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা ও নাটকগুলির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বস্তুত আমাদের দেশে বৌদ্ধ কাহিনীর জনপ্রিয়তার মূলে রবীন্দ্রনাথের দান সর্বাপেক্ষা বেশি। রূপবৈচিত্র্য ও ভাবগভীরতায় রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধ আখ্যানমূলক নাটকগুলি যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তার তুলনা বিরল।

রবীন্দ্রনাথের এই আখ্যানকাব্য ও নাটকগুলিতে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয়। তিনি প্রায় সমস্ত আখ্যায়িকাগুলি গ্রহণ করেছেন বৌদ্ধদের সংস্কৃত অবদান থেকে। আর অবদানের যেসকল কাহিনী তিনি কাব্য ও নাটকের

[২২১] সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা (১৯৪১), 'সাহিত্যের স্বরূপ'

উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন সেগুলিকে তিনি নিজের মত করেই নিয়েছেন। কবির পক্ষে এ স্বাভাবিক। এর ফলে ভাব ও আঙ্গিকের দিক্ থেকে আধুনিকীকরণ ও সৌন্দর্যবর্ধন হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত ও কালিদাসের যুগের কাহিনীকেও রবীন্দ্রনাথ এমনি ভাবে নবরূপ দান করেছেন।

শুধু রূপ ও রসের দিক্ থেকে নয়, ঐতিহাসিক সত্যানিষ্ঠার দিক্ থেকেও এই নাটকগুলির বিশেষ সার্থকতা আছে। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক প্রজ্ঞার আলোকে এখানে বৌদ্ধযুগের ইতিহাস সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তদানীন্তন ভারতবর্ষে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের যে সূচনা হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় এই নাটকগুলিতে। আবার রাষ্ট্র ও সমাজের কল-কোলাহলের ঊর্ধ্বে তুলে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সর্বত্রই বৌদ্ধধর্মের কালজয়ী মহিমার জয় ঘোষণা করেছেন। অবশ্য বৌদ্ধধর্ম এখানে চিরন্তন মানবধর্মেরই প্রতিরূপ। আর বৌদ্ধধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের মূলেও রয়েছে এই সত্য।

পরিশেষে আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধ আখ্যানমূলক নাটকগুলির মধ্যে মালিনী, নটীর পূজা ও চণ্ডালিকা প্রধান। এই তিনটি নাটকেই রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ্যধর্মের আচারনিষ্ঠা ও সংকীর্ণতার পাশে রেখে বৌদ্ধধর্মের মানবিক আদর্শকে জয়ী করেছেন। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, ব্রাহ্মণ্য আদর্শের চেয়ে বৌদ্ধধর্মই রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের অনুকূল ছিল।

রবীন্দ্রনাথ নাটিকার কাহিনীগুলি নিয়েছেন রাজেন্দ্রলাল-সম্পাদিত সংস্কৃত অবদান সাহিত্য থেকে। আর, নাটিকার অধিকাংশ পালি স্তবমন্ত্র গ্রহণ করেছেন ধর্মরাজ বড়ুয়া প্রণীত 'হস্তসার' (১৮৯০) গ্রন্থ থেকে। গোঁসাইজির নিকট শুনেছি, এই বইখানি রবীন্দ্রনাথ প্রায় সবসময় কাছে রাখতেন।

মালিনী (১৮৯৬)—এটি বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বনে রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক। এই নাটকের প্রথম উৎপত্তির একটি স্বপ্নঘটিত ইতিহাস আছে। কবি লন্ডনে থাকাকালীন একদিন এই স্বপ্ন দেখেন।—

> এমন সময় স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ

করে।...অনেক কাল এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করেছে। অবশেষে অনেক দিন পরে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হল।[১২২]

এই স্বপ্নের সঙ্গে মহাবস্তু-অবদানের কাহিনী[১২৩] যুক্ত করে 'মালিনী' নাটক রচিত। মূল কাহিনীটি সংক্ষেপে এভাবে দেওয়া আছে। বারাণসীরাজ কৃকির কন্যা মালিনী ভিক্ষু কাশ্যপের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণা। মালিনী একদিন ভিক্ষু কাশ্যপকে সদলবলে নিমন্ত্রণ করে। ফলে ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় মালিনীর নির্বাসনদণ্ড হয়। মালিনী পিতার নিকট এক সপ্তাহের সময় প্রার্থনা করে। ইতিমধ্যে মালিনীর ভাই, অমাত্যবর্গ ও নাগরিকগণ সকলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। মালিনীর প্রতি সকলের বিশেষ শ্রদ্ধা। এরা একযোগে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে ব্রাহ্মণেরা রাজার আশ্রয় গ্রহণ করে। এর পরেও ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষু কাশ্যপকে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টাও বিফল হয় এবং অবশেষে নিজেরাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

ভাবে ভঙ্গিতে অবদানের সঙ্গে 'মালিনী' নাটকের অনেক পার্থক্য। সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকর রবীন্দ্রনাথের নূতন সৃষ্টি। মালিনীর প্রতি সুপ্রিয়র অনুরাগও কবিকল্পিত। মূল কাহিনীকে প্রায় অক্ষুণ্ণ রেখে কবি নাটকে বৈচিত্র্য ও রস-সঞ্চার করেছেন। নাটকে নবপ্রবুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্যসমাজের বিরোধিতা ও উচ্ছেদসাধনের চেষ্টা এবং শেষপর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের কালজয়ী মহিমা সুন্দর-ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

নাটকের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে মালিনী চরিত্র। ধর্মনাশ আশঙ্কায় ব্রাহ্মণের দল এক হয়ে মালিনীর নির্বাসন কামনা করে। ব্রাহ্মণদের এ মূঢ়তায় সুপ্রিয়র মনে ধিক্‌কার জাগে। শুধু যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম ব্রত-উপবাসকে সে ধর্ম বলে গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু ক্ষেমংকরের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে চাপা পড়ে তার প্রাণের আকুতি। ক্ষেমংকর আসন্নসংকট থেকে আর্যধর্মকে রক্ষা করার জন্য দেশান্তরে যায় সৈন্য নিয়ে আসতে। এদিকে মালিনী নিজেই নির্বাসন বরণ করে নেয়। সুদূরের আহ্বান এসেছে তার কাছে,—'রাজদ্বারে মোরে যাচিয়াছে বাহির-সংসার'। বিদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ সকলে মিলে যখন সমস্বরে প্রলয়ংকরী পাষণ্ড-দলনীকে আহ্বান করছে ঠিক সেই সময়ে মালিনীর আবির্ভাব হল। ব্রাহ্মণেরা বুঝতে পারল মা আজ সংহারমূর্তি নিয়ে আসে নি, এক অপরূপ করুণা-মাখানো রূপ নিয়ে এসেছে। নির্বাসিতা রাজকন্যাকে তারা পরম সমাদরে বরণ করে নেয়।—

---

[১২২] সূচনা, 'মালিনী'
[১২৩] *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, p. 121

এস, এস মা জননী,
শতচিত্তশতদলে দাঁড়াও অমনি
করুণামাখানো মুখে।

নবপ্রবুদ্ধ হিন্দুধর্মের বুকে কন্যাস্থানীয়া বৌদ্ধধর্ম বুঝি একদিন এমনি করুণামাখানো রূপ নিয়ে এসেছিল। মালিনী যেন এখানে বুদ্ধদেব তথা বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতিরূপ। মালিনীর পরবর্তী উক্তি থেকে একথা আরো স্পষ্ট হবে।—

শুনিয়াছি দুঃখময়
বসুন্ধরা, সে দুঃখের লব পরিচয়
তোমাদের সাথে।...
আজি মোর মনে হয়
অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়—
যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা.
যেন সে ঢালিতে পারে সান্ত্বনার সুধা,
যত দুঃখ যেথা আছে সকলের 'পরে
অনন্ত প্রবাহে।

বসুন্ধরার দুঃখে আকুল মালিনীর উক্তি অনন্তকারুণিক বুদ্ধদেবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর বুদ্ধদেবের হৃদয় থেকে উৎসারিত অমৃতধারাই ত একদিন বিশ্বের ক্ষুধা নিবৃত্ত করেছে, অনন্ত প্রবাহে যেখানে যত দুঃখ আছে সকলের উপর সান্ত্বনার সুধা বর্ষণ করেছে। মালিনীচরিত্র-অঙ্কনে যে বুদ্ধদেবের বিশ্ব-জয়ী মহিমা রবীন্দ্রনাথের মনে অতি উজ্জ্বলভাবে জাগ্রত ছিল তা এর থেকে বুঝতে আর কষ্ট হয় না।

মালিনীর মধ্যে সুপ্রিয় ধর্মের এক জীবন্ত আদর্শ দেখতে পেয়েছে। এত-দিন এত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সে তা পায় নি। একেই বলে সে নবজন্ম। আজ সে অন্তরে উপলব্ধি করেছে—

শুধু জানি বলি দিয়া আত্ম-অভিমানে
বাসিতে হইবে ভালো, বিশ্বের বেদনা
আপন করিতে হবে—যে কিছু বাসনা
শুধু আপনার তরে তাই দুঃখময়।
যজ্ঞে যাগে তপস্যায় কভু মুক্তি নয়,
মুক্তি শুধু বিশ্বকাজে।

বস্তুত এই উক্তির মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মের আদর্শই ব্যক্ত হয়েছে। যা হক, সুপ্রিয় যে ধর্মকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেছে শেষপর্যন্ত তার মর্যাদা রেখেছে। ক্ষেমংকরের বজ্ররোষের সম্মুখে কিংবা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও সে

বিচলিত হয় নি। তারপর ক্ষেমংকরের নির্মম হস্তে চরম দণ্ড লাভ করে মৃত্যু-পথযাত্রীর এই শেষ বাণী—'দেবী, তব জয়'। সত্যের পরীক্ষায় সুপ্রিয় এখানে উত্তীর্ণ হয়েছে। আর এই জয়ধ্বনি তারই উদ্দেশে যার মধ্যে সে ধর্মের জীবন্ত আদর্শ প্রত্যক্ষ করেছে। এই জয় হিংসার উপর অহিংসার, নিষ্ঠুরতার উপর প্রেমের। নাটকের উপসংহারেও মালিনীর মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মের ক্ষমার আদর্শই জয়লাভ করেছে। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ এমনি ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ্য-সমাজকে পাশাপাশি রেখে বৌদ্ধধর্মের চিরন্তন মহত্ত্বকে জয়যুক্ত করেছেন।

রাজা (১৯১০)—এই নাটকটি মহাবস্তু-অবদানের অন্তর্গত কুশ জাতক[১২৪] অবলম্বনে রচিত। এর অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'অরূপ রতন' (১৯২০) নাট্যরূপকটি। রবীন্দ্রনাথ পরে এই আখ্যানের আভাসে 'শাপমোচন' কবিতা (১৯৩১) ও 'শাপমোচন' কথিকা (১৯৩১) রচনা করেন। অবদানের একটিমাত্র কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করেছেন।

বারাণসীরাজ ইক্ষ্বাকুর প্রধানা মহিষী অলিন্দার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে কুশ। সে অসাধারণ প্রজ্ঞাবান, কিন্তু চেহারা ছিল অতি কুৎসিত। কান্যকুব্জরাজের পরমাসুন্দরী কন্যা সুদর্শনার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। দিবালোকে কুশকে দেখলে সুদর্শনা ঘৃণা করে চলে যেতে পারে, এই ভেবে কুশের মা স্বামী-স্ত্রীকে এক অন্ধকার গর্ভগৃহে রাখে। সুদর্শনা স্বামীকে দেখতে চাইলে ছলনা করে তার এক সুরূপ দেবরকে দেখানো হয়। কিন্তু এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের দিনে স্বামীকে দেখতে পেয়ে সুদর্শনা লজ্জায় ঘৃণায় পিত্রালয়ে চলে যায়। বিরহকাতর কুশ বীণাটি নিয়ে কান্যকুব্জে গমন করে এবং সেখানে ছদ্মবেশে রাজবাড়ির রন্ধনশালায় নিযুক্ত হয়। অবশেষে সুদর্শনার পাণিপ্রার্থী সাত জন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে বীর্যবলে সুদর্শনার অন্তর জয় করে। সুদর্শনাকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসার সময় নদীতে প্রতিবিম্বিত নিজের কুৎসিত চেহারা দেখে কুশ আত্মহত্যার সংকল্প করে। পরে ইন্দ্রপ্রদত্ত মণিমালার সাহায্যে সে এক অপূর্ব রূপবান পুরুষে পরিণত হয়।

এর পর অবদানে বলা হয়েছে, পূর্বজন্মে বুদ্ধদেব ছিলেন কুশ, যশোধরা ছিলেন সুদর্শনা এবং অনুচরসহ মার ছিল সুদর্শনার পাণিপ্রার্থী সাত জন রাজা।

আসলে অবদানের এই কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে বুদ্ধদেবের মার-বিজয়-প্রসঙ্গে। এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল, মার প্রতিজন্মে বুদ্ধদেবের সঙ্গে

[১২৪] *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, p.p. 142-45

শত্রুতা করেও কোন ক্ষতি করতে পারে নি এবং প্রতিবারেই তার হার মানতে হয়েছে।

অবদানের এই কাহিনী অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ অপরূপ কাব্যসুষমায় এক অধ্যাত্মরসের রূপকনাট্য সৃষ্টি করেছেন। এ ছিল অবদানকারের কল্পনার বাইরে। এদিক্ থেকে দেখতে গেলে রূপে, রসে ও ভাবে 'রাজা' নাটক রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজের সৃষ্টি। কাহিনীর দিক্ থেকে শুধু অবদানের সঙ্গে মিল আছে। 'রাজা' নাটকে মানবহৃদয়ের ভগবৎ উপলব্ধির ইতিহাস প্রকাশ পেয়েছে।[১২৫] রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই নাট্য-রূপকটি ব্যাখ্যা করেছেন।—

> সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল।...তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল,—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়,—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।[১২৬]

সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদা রবীন্দ্রনাথের নূতন সৃষ্টি। সুরঙ্গমা ভক্ত সাধিকার প্রতীক—ঐকান্তিক নিষ্ঠাতেই যার সমস্ত চরিত্র স্থিতি পেয়েছে।[১২৭] ঠাকুরদা হল একজন আত্মনিবেদিত ও আনন্দিত রসসাধক।

অচলায়তন (১৯১২)—এই নাটকটি দিব্যাবদানমালার অন্তর্গত পঞ্চকের কাহিনী[১২৮] অবলম্বনে রচিত। সহজ অভিনয়যোগ্য করার জন্য পরে এই নাটকটিকে 'গুরু' (১৯১৮) নামে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হয়। অবদানের মূল কাহিনীটি সংক্ষেপে এখানে দেওয়া গেল।

এক ব্রাহ্মণ কোন সন্তানকে বাঁচাতে পারে না, ভূমিষ্ঠ হবার পরেই মারা যায়। অবশেষে একটি শিশুকে অনেক কষ্টে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদে মৃত্যুর

---

[১২৫] প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ' (২য় খণ্ড), পৃ. ৮৭

[১২৬] ভূমিকা (মাঘ ১৩২৬), 'অরূপ রতন'

[১২৭] অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'কাব্যপরিক্রমা', পৃ. ৩৮

[১২৮] *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, p. 311

কবল থেকে রক্ষা করে। এই শিশু মহাপন্থক। এর পরে ব্রাহ্মণের আর একটি ছেলে এমনি ভাবে বেঁচে ওঠে। এর নাম পন্থক। কালক্রমে মহাপন্থক একজন মহাজ্ঞানী হয় এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করে অনতিবিলম্বে অর্হত্ব লাভ করে। কিন্তু পন্থক সন্ন্যাস অবলম্বন করেও একজন মূর্খ হয়ে রইল। এর জন্য মহাপন্থক তাকে বিহার থেকে তাড়িয়ে দেয়। একদিন রাস্তার পাশে তাকে ক্রন্দনরত দেখে ভগবান বুদ্ধ বিহারে নিয়ে আসেন এবং অন্য একজন ভিক্ষুর উপর তার শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। পন্থক অচিরেই অর্হত্ব লাভ করে।

পন্থকের পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলেই অচিরে এই অর্হত্ব লাভ সম্ভব হয়েছিল। তার পূর্বজন্মের কাহিনীটি অবদানে এভাবে বিবৃত হয়েছে।

পিতার মৃত্যুর পর পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে পিতৃবন্ধুর নিকট পিতার গচ্ছিত ধন প্রার্থনা করল। পিতৃবন্ধু বললেন, 'যার পুরুষোচিত দৃঢ় সংকল্প আছে সে কারো সাহায্য চায় না, মৃত ইঁদুরটি নিয়েও জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে পারে'। এর পর যুবক দৃঢ় অধ্যবসায়ের দ্বারা বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়। তখন তার পিতৃবন্ধু সমস্ত গচ্ছিত ধন এবং পুরস্কারস্বরূপ নিজের একমাত্র কন্যাকে দান করেন। পূর্বজন্মে স্বয়ং বুদ্ধদেব ছিলেন এই পিতৃবন্ধু।

এই কাহিনীর অন্তর্নিহিত ভাব হল, দৃঢ়সংকল্প থাকলে জীবনে সফলতা অনিবার্য। বৌদ্ধ পরিভাষায় একে বলা হয় বীর্য-পারমী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পন্থকের কাহিনী নিয়ে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে 'অচলায়তন' নাটক রচনা করেছেন। মূল কাহিনীর সঙ্গে নাটকের আখ্যানভাগের যে মিল আছে তা বাহ্যিক। নাটকের অন্তর্নিহিত ভাব রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি।

বৌদ্ধধর্ম মূলত জ্ঞান মনন ও বিমুক্তির ধর্ম। কিন্তু কালক্রমে এই ধর্ম উচ্চ আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মন্ত্রতন্ত্র-সমন্বিত বিকৃত মহাযানে রূপান্তরিত হয়। যেভাবে 'বৌদ্ধধর্ম জীর্ণ হয়ে, বিদীর্ণ হয়ে, টুকরো টুকরো হয়ে নানাপ্রকার বিকৃতিতে পরিণত হয়েছিল',[১২১] সে ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে অনুধাবন করেছেন এবং বিভিন্ন প্রবন্ধেও একথা প্রকাশ করেছেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন—

> .তখন শ্রান্ত পুরাতন ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্ম বৌদ্ধদের দ্বারা পরাস্ত; এবং বৌদ্ধধর্ম বিচিত্র বিকৃত রূপান্তরে ক্রমশ পুরাণ-উপপুরাণের শতধা-বিভক্ত ক্ষুদ্র সংকীর্ণ বক্র প্রণালীর মধ্যে স্রোতোহীন মন্দগতিতে প্রবাহিত হইয়া একটি সহস্রলাঙ্গুল শীতরক্ত সরীসৃপের ন্যায় ভারতবর্ষকে শতপাকে জড়িত করিতেছিল। তখন ধর্মে সমাজে শাস্ত্রে কোনো বিষয়ে নবীনতা ছিল না, গতি ছিল না, বৃদ্ধি ছিল না,

[১২১] যাত্রারনিকের পত্র, 'কালান্তর'

সকল বিষয়েই যেন পরীক্ষা শেষ হইয়া গেছে, নূতন আশা করিবার বিষয় নাই।[১০০]

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের এই বিচিত্র বিকৃত রূপান্তরের ইতিহাস পেয়েছেন প্রধানত রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত Sanskrit Buddhist Literature of Nepal গ্রন্থ থেকে। সেখানে তিনি বিকৃত মহাযান বৌদ্ধধর্মের মন্ত্রতন্ত্র ব্রত-উপবাস প্রভৃতি বোধহীন শুষ্ক আচারের যে অনুবৃত্তি প্রত্যক্ষ করেছেন তাই 'অচলায়তন' নাটকের পটভূমি। সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশের জড়তাগ্রস্ত ও আচারসর্বস্ব ধর্মের বিধিবিধানকে এই নাটকের পটভূমি বললে অধিকতর সংগত হবে।

বহুকাল পূর্বে অদীনপুণ্যকে আচার্য করে আর্যগুরু যে বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কালক্রমে তা প্রাণহীন অভ্যাস ও অন্ধ-সংস্কারের অনুবৃত্তিতে অচলায়তনে পরিণত হয়। সেখানে বাইরের আলো-বাতাস আসতে পারে না—'চারপাশে পাথরের প্রাচীর, বন্ধ দরজা, নানা রেখার গণ্ডি, স্তূপাকার পুঁথি, আর অহোরাত্র মন্ত্রপাঠের গুঞ্জনধ্বনি'।[১০১] এই অচলায়তনের মধ্যে একমাত্র পঞ্চকই ব্যতিক্রম। সে মন্ত্র-তন্ত্র আচার-আচমন সূত্র-বৃত্তি কিছুই শিক্ষা করতে পারে না, অর্থাৎ করতে চায় না। পঞ্চক যেন নীরস পাথরের বুকে সবুজ কচি ঘাস। অচলায়তনের অন্ধকারার মধ্যে বন্দী হয়ে আলোর স্পর্শের জন্য তার প্রাণ কেঁদে ওঠে।—

আকাশে কার ব্যাকুলতা,
বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা
কেউ তো আনে না।

পঞ্চক সুযোগ পেলে আয়তনের বাইরে গিয়ে অন্ত্যজঅস্পৃশ্য দর্ভক ও শোণপাংশুদের সঙ্গে মেশে। ওখানে গেলে তার মনে হয়, 'এই আলোতে ভরা নীল আকাশটা আমার রক্তের ভিতরে গিয়ে কথা কচ্ছে, আমার সমস্ত শরীরটা গুন গুন করে বেড়াচ্ছে'।[১০২] তা ছাড়া সেখানে দাদাঠাকুরের সান্নিধ্যে যেন ওর প্রাণ মুক্তির স্বাদ পায়। সে দাদাঠাকুরকে বলে, 'যতবার বাইরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হয় ততবার ফিরে গিয়ে অচলায়তনে আমাকে যেন আর ধরে না। হয় ওটাকে বড়ো করে দাও, নয় আমাকে আর বাড়তে দিয়ো না'।[১০৩] এই পঞ্চক

---

[১০০] আবদুল করিম প্রণীত 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত' (১ম খণ্ড) গ্রন্থের সমালোচনা, 'ইতিহাস'

[১০১] 'অচলায়তন', রচনাবলী (প. ব. সরকার), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৭৬

[১০২] 'অচলায়তন', রচনাবলী (প. ব. সরকার), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৮৫

[১০৩] 'অচলায়তন', রচনাবলী (প. ব. সরকার), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯৩

হল মুক্তিপিপাসু মানবাত্মার প্রতীক। এর সঙ্গে ডাকঘরের অমল, মুক্তধারার অভিজিৎ এবং রক্তকরবীর রঞ্জনের মিল দেখা যায়। আর মহাপঞ্চক একেবারে ভাইয়ের বিপরীত। অচলায়তনের বিধিবিধান একমাত্র সে-ই সব জানে। এমন কি এই আচারনিষ্ঠা ভাঙলে সে আয়তনের আচার্যকে পর্যন্ত শাস্তিদানের স্পর্ধা প্রকাশ করে। মহাপঞ্চক স্থিতিশীল আচারনিষ্ঠার প্রতীক।

অবশেষে একদিন যখন অচলায়তনের পাপ পরিপূর্ণ হয়ে উঠল সেদিন যোদ্ধবেশে গুরু এসে অচলায়তনের প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিলেন। পঞ্চকের উপর ভার দিলেন সেখানে নূতন আয়তন গড়ে তোলার জন্য। এই নূতন আয়তন মহাপঞ্চক প্রভৃতি, শোণপাংশু ও দর্ভক সবাইকে নিয়ে পূর্ণ হবে। মহাপঞ্চক, শোণপাংশু ও দর্ভকগণ যথাক্রমে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিমার্গের পথিক। এই তিনের সমন্বয়েই সাধনার সার্থকতা—নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই ইংগিত দিয়েছেন।[১০৪]

'অচলায়তন' প্রকাশিত হবার পর অনেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই নাটকের সমালোচনা করেন। এতে নিন্দা ও প্রশংসা দুইই ছিল। হিন্দুধর্মের মন্ত্র ও আচার-অনুষ্ঠানকে রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপ করেছেন, এই অভিযোগের উত্তরে তিনি অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন—

> নিজের দেশের আদর্শকে যে ব্যক্তি যে-পরিমাণে ভালোবাসিবে সেই তাহার বিকারকে সেই পরিমাণেই আঘাত করিবে, ইহাই শ্রেয়স্কর। ভালোমন্দ সমস্তকেই সমান নির্বিচারে সর্বাঙ্গে মাখিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকাতেই প্রেমের পরিচয় বলিতে পারি না। দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে।...আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমস্ত-দেশব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই।... অচলায়তনে আমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে।[১০৫]

অচলায়তনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এমনি ভাবে জীর্ণপুরাতনকে ভেঙে নূতন করে প্রশস্ত করে গড়ে তোলার কথা বলেছেন।

নটীর পূজা (১৯২৬)—অবদান-শতকের যে কাহিনীটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'পূজারিণী' (১৮৯৯) কবিতা লিখেছিলেন, সুদীর্ঘ সাতাশ বৎসরের ব্যবধানে

[১০৪] প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ' (২য় খণ্ড), পৃ. ৬৬

[১০৫] 'পত্র', ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৮। রবীন্দ্ররচনাবলী (বি.ভা.) ১১, পৃ. ৫১০

আবার সেই কাহিনী অবলম্বনে 'নটীর পূজা' নাটিকা রচনা করেন। অবদানের এই কাহিনীটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ এর থেকেও অনুমান করা যায়। তা ছাড়া 'নটীর পূজা' কবির জন্মদিন উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে অভিনয়ের জন্য বিশেষভাবে রচিত হয়েছিল।[১০৬]

মূল কাহিনীটি সংক্ষেপে এভাবে দেওয়া আছে।[১০৭] মগধরাজ বিম্বিসার তাঁর প্রাসাদকাননে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশে এক স্তূপ নির্মাণ করেন। পরিচারিকাগণ প্রতিদিন সে স্থান পরিষ্কার করে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। অজাতশত্রু রাজা হয়ে তা বন্ধ করে দেন এবং ঘোষণা করেন যে, এই আদেশ কেউ অমান্য করলে মৃত্যুদন্ড হবে। একদিন দাসী শ্রীমতী জীবনের মায়া বিসর্জন দিয়ে স্তূপপদমূল ধৌত করে সেখানে একসারি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। ফলে রাজার আদেশে মৃত্যুবরণ করে।

দেশের জন্য কিংবা বিশেষ আদর্শের জন্য বীরের আত্মদানের কাহিনী ইতিহাসে অনেক আছে। কিন্তু পূজার আবেগে নারী প্রাণ দিতে পারে সে দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। এ অপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনী রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে এই কবিতা ও নাটিকা রচনায় প্রবৃত্ত করেছে। কিন্তু 'নটীর পূজা'তে শুধু আত্মত্যাগের কাহিনী নয়, তৎকালে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-ধর্মকে কেন্দ্র করে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের যে সূচনা হয়েছিল, সে ইতিহাস অতি স্পষ্টভাবে নাটিকার এই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। এতদ্‌ব্যতীত নাট্যরসের দিক্ থেকে এই নাটিকা শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যে নয়, সমগ্র বাংলাসাহিত্যে এক অপূর্ব সৃষ্টি। দ্বিতীয় বার কলকাতায় অভিনয়ের দিন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই নাটিকায় নূতন সংবলিত একমাত্র পুরুষ-চরিত্র উপালির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।[১০৮]

সমগ্র নাটিকাটি একদিনের ঘটনা নিয়ে। বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধের জন্মোৎসবের দিন।[১০৯] পূর্বগগনে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষু উপালি রাজপুরীতে এসে প্রভু বুদ্ধের নামে ভিক্ষাপ্রার্থী। তখন একমাত্র জেগেছে রাজবাড়ির নটী শ্রীমতী। ভিক্ষু জানিয়ে গেলেন, ভগবান শ্রীমতীকে দয়া করেছেন, তার দিন এসেছে। নাটকের সূচনায় এভাবে শ্রীমতীর আত্মদানের ইংগিত দেওয়া হয়েছে।

'কোন্ মরুর ধর্ম কানে নিয়ে' মহারাজ বিম্বিসার সিংহাসন ত্যাগ করেছেন।

---

[১০৬] 'রবীন্দ্রজীবনী' ৩য় খন্ড (১ম সং), পৃ. ১৮২
[১০৭] *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, p. 33
[১০৮] 'রবীন্দ্রজীবনী' ৩য় খন্ড (১ম সং), পৃ. ২০৪
[১০৯] রবীন্দ্রনাথ এখানে বসন্তপূর্ণিমা বলে উল্লেখ করেছেন

একমাত্র ছেলে চিত্রও ভিক্ষু হয়েছে। এজন্য মহিষী লোকেশ্বরীর অভিমানের অন্ত নেই। তিনি ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণাকে বলেন, 'আর্যপুত্রকে বলো গিয়ে আমার সব পুজো নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়েছি। কেউ বা ফুল দেয়, দীপ দেয়—আমি আমার সংসার শূন্য করে দিয়েছি।' যে বুদ্ধের ধর্ম এভাবে তাঁর সর্বনাশ করেছে তিনি সেই ধর্মকে আঘাত করতেও উদ্যত। কিন্তু রানীর অন্তরে রয়েছে উপাসিকা নারী। এখনো 'ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে, নমঃ সংঘায় মহত্তমায়' স্তবের ধ্বনি শুনলে তাঁর বুকের ভিতর দুলে ওঠে, নিজের অজ্ঞাতসারেও 'মহাকারুণিকো নাথো' বুদ্ধের উদ্দেশে অসীম শ্রদ্ধায় প্রণাম নিবেদন করেন। অজাতশত্রুর পাপসহচর ও ভগবান বুদ্ধের ধর্মবৈরী দেবদত্তের কথা শুনে তিনি বলেন, 'যে-আসনে আমার সেই পরমনির্মল জ্যোতির্ভাসিত মহাগুরুকে নিজে এনে বসিয়েছি তাঁর সেই আসনেই দেবদত্তকে ডেকে আনব'!

আজ অশোকবনে স্তূপপদমূলে পূজা নিবেদনের ভার পড়েছে শ্রীমতীর উপর। তাই সে পূজা নিয়ে চলেছে। রাজার আদেশে অন্তঃপুররক্ষিণীরা বাধা দেয়, ছিনিয়ে নেয় পূজার থালা। আজ কি যেন এক দুর্দিনের সংকেত! কিন্তু শ্রীমতীর ভয় নেই, সংকোচ নেই। সে বলে, 'প্রভু আহ্বান করেছেন আমাকে! বাধা যাবে কেটে। আজই যাবে।'

ওদিকে বিপ্লব ক্রমেই ঘনিয়ে আসে। অজাতশত্রুর উপদ্রবে ধর্ম পীড়িত, শ্রমণেরা শঙ্কিত। অজাতশত্রু অশোকতলে বুদ্ধের বেদী দিয়েছে ভেঙে, দেবদত্তের শিষ্যেরা ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণাকে হত্যা করেছে। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডে সকলে চঞ্চল হয়ে ওঠে। রোদিনী শ্রীমতীকে বলে, 'আমাদের হাতেও অস্ত্র আছে। এ পাপ সইব না। এ যে প্রভুর সংঘকে মারলে। শ্রীমতী ক্ষমা চলবে না, অস্ত্র ধরো।' তলোয়ার দেখে মুহূর্তমধ্যে শ্রীমতীর নাচের হাতও চঞ্চল হয়ে ওঠে। আবার পরমুহূর্তে তলোয়ার হাত থেকে খসে পড়ে। সে প্রভুর হাত থেকে চরম অস্ত্র পেয়েছে। তার দ্বারা হিংসার উপর অহিংসার, নিষ্ঠুরতার উপর প্রেমের জয় হবে। রবীন্দ্রনাথ নাট্যরসের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মের এই আদর্শকেই এখানে জয়ী করেছেন।

মহারাজ বিম্বিসার বেরিয়েছেন অশোকতলে বুদ্ধের আসনে পূজা দানের জন্য। সংবাদ পাওয়া গেল তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। রত্নাবলী একে তাঁর কর্মফল বলেই অভিহিত করে। 'মহারাজ বিম্বিসার পিতার বৈদিক ধর্মকে বিনাশ করেছেন। সে কি পিতৃহত্যার চেয়ে বেশি নয়? ব্রাহ্মণরা তো তখন থেকেই বলছে, যে যজ্ঞের আগুন উনি নিবিয়েছেন সেই ক্ষুধিত আগুন একদিন ওঁকে খাবে।' রত্নাবলীর মধ্য দিয়ে এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্যসমাজের মনোভাবটি ব্যক্ত হয়েছে। বেদবিরোধী ও যজ্ঞবিরোধী বৌদ্ধধর্ম প্রধানত ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি

খর্ব করেছে বলে বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাদের একটা স্বাভাবিক বিদ্বেষ ছিল। প্রসঙ্গক্রমে ব্রাহ্মণগণকর্তৃক বৌদ্ধধর্মানুরাগী হর্ষবর্ধনের প্রাণনাশের কাহিনী স্মরণীয়।

এর পর আসে শ্রীমতীর চরম ক্ষণ। রত্নাবলী হিংস্র কৌতুকে রাজার কাছ থেকে বুদ্ধের পূজাবেদীর সম্মুখে তার নাচের আদেশ এনেছে। সবাই বলে, এখানে নাচবার মহাপাতক থেকে শ্রীমতীকে আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। কিন্তু শ্রীমতী অন্তরে জানে উদ্ধারকর্তা একজন নিশ্চয়ই আছেন। পূজাবেদীর সম্মুখে শুরু হয় তার নৃত্য ও গীত।—

আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমঃ
তোমায় স্মরি হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম
উছল হয়ে বাজে।
আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।
এ কী পরম ব্যথায় পরান কাঁপায়
কাঁপন বক্ষে লাগে
শান্তিসাগরে ঢেউ খেলে যায়
সুন্দর তায় জাগে।
আমার সব চেতনা সব বেদনা
রচিল এ যে কী আরাধনা,
তোমার পায়ে মোর সাধনা
মরে না যেন লাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।

প্রাণের চরম আবেগঢালা এই সংগীত-নৃত্যের মধ্য দিয়ে কবির সমগ্র হৃদয়তনুর আকুলতা যেন বারেবারে ভগবান বুদ্ধের পায়ে প্রণাম হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। শ্রীমতীর সঙ্গে সংগীতের ভঙ্গিতে কবি নিজেকেও বন্দনায় নিয়োজিত করেছেন।

শ্রীমতী নৃত্যের তালে তালে অঙ্গের অলংকার এক একটি করে আবর্জনার

মধ্যে বিসর্জন দেয়। নটীর বেশ ফেলে দিয়ে ভিক্ষুণীর পীতবস্ত্র-পরিহিতা শ্রীমতী জানু পেতে বুদ্ধের স্তবমন্ত্র উচ্চারণ করে। ঠিক এই সময়ে রক্ষিণীর অস্ত্রাঘাতে শ্রীমতীর দেহ পুজার আসনে লুটিয়ে পড়ে। এমনি ভাবে শ্রীমতী নিজের প্রাণ দিয়ে পুজার আবেগ চরিতার্থ করেছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলেছেন—

> বুদ্ধদেবকে নটী যে অর্ঘ্য দান করতে চেয়েছিল সে তার নৃত্য। অন্য সাধকেরা তাঁকে দিয়েছিল যা ছিল তাদেরই অন্তরতর সত্য, নটী দিয়েছে তার সমস্ত জীবনের অভিব্যক্ত সত্যকে। মৃত্যু দিয়ে সেই সত্যের চরম মূল্য প্রমাণ করেছে। এই নৃত্যকে পরিপূর্ণ করে জাগিয়ে তুলেছিল তার প্রাণমনের মধ্যে তার প্রাণের প্রাণ।[১৪০]

এই নাটিকার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের মহিমাকে রবীন্দ্রনাথ কি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। নাটিকার একটি দিনের ঘটনার মধ্য দিয়ে একটি সমগ্রযুগের হৃদস্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে। শিল্পোৎকর্ষের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

চণ্ডালিকা (১৯৩৩)—এই নাটিকাটি শার্দূলকর্ণ-অবদানের কাহিনী[১৪১] অবলম্বনে রচিত। পাঁচ বৎসর পরে এর পরিবর্তিত রূপ 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' (১৯৩৮) প্রকাশিত হয়। মূল কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় এভাবে দিয়েছেন।—

> গল্পের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী। প্রভু বুদ্ধ তখন অনাথপিণ্ডদের উদ্যানে প্রবাস যাপন করছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ একদিন এক গৃহস্থের বাড়িতে আহার শেষ করে বিহারে ফেরবার সময় তৃষ্ণা বোধ করলেন। দেখতে পেলেন, এক চণ্ডালের কন্যা, নাম প্রকৃতি, কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছ থেকে জল চাইলেন, সে দিল। তাঁর রূপ দেখে মেয়েটি মুগ্ধ হল। তাঁকে পাবার অন্য কোনো উপায় না দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইলে। মা তার যাদুবিদ্যা জানত। মা আঙিনায় গোবর লেপে একটি বেদী প্রস্তুত করে সেখানে আগুন জ্বালল এবং মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে একে একে ১০৮টি অর্কফুল সেই আগুনে ফেললে। আনন্দ এই যাদুর শক্তি রোধ করতে পারলেন না। রাত্রে তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তাঁর জন্য বিছানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তখন পরিতাপ

---

১৪০ 'আত্মপরিচয়'—৬

১৪১ *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, p. 223

উপস্থিত হল। পরিত্রাণের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধমন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালিনীর বশীকরণবিদ্যা দুর্বল হয়ে গেল এবং আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।[১৪২]

কিন্তু মূল কাহিনীটি এখানেই শেষ হয় নি। এর পরে অবদানকার বুদ্ধদেবের মুখ দিয়ে প্রকৃতির পূর্বজন্মের ইতিহাস বিবৃত করেছেন। পূর্বজন্মে প্রকৃতি ছিল ব্রাহ্মণ পুস্করসারীর কন্যা। নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত চণ্ডাল ত্রিশঙ্কু তাঁর গুণবান পুত্র শার্দূলকর্ণের জন্য পুস্করসারীর কন্যাকে প্রার্থনা করলে ব্রাহ্মণ ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর দীর্ঘ জাতিবিচারে পরাস্ত হয়ে ব্রাহ্মণ অবশেষে চণ্ডালপুত্রকে কন্যাদান করেন। পূর্বজন্মে ত্রিশঙ্কু ছিলেন স্বয়ং বুদ্ধদেব।

এর থেকে সহজে অনুমান করা যায়, গল্পটির মূল বিষয় হল জাতিভেদের অসারতা প্রতিপাদন। 'চণ্ডালিকা' নাটিকাতে রবীন্দ্রনাথ মূল ভাবটি বজায় রেখেছেন। তবে জাতিভেদের মধ্যে অস্পৃশ্যতাই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, অল্পকাল পরেই মহাত্মা গান্ধী আমাদের দেশে অস্পৃশ্যতা ও জল-অচলনীয়তা নিবারণ করবার জন্যে আন্দোলন আরম্ভ করেন।[১৪৩] এই আন্দোলনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক সমর্থন ছিল। আমাদের দেশে অস্পৃশ্যতারূপী যে মজ্জাগত অভিশাপ রয়েছে, রবীন্দ্রনাথ 'চণ্ডালিকা' নাটিকায় তা এক নূতন ব্যঞ্জনায় অপরূপ নাট্যরসের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। এই নাটিকা সর্বভারতে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে সে কথা বলা বাহুল্য।

আনন্দ একদিন বিহারে ফিরবার পথে চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির হাতে জলপান করে তৃষ্ণা দূর করেন। তখন থেকে প্রকৃতির এক অদ্ভুত পরিবর্তন। একে সে বলে 'নূতন জন্মের পালা'। সে প্রতীক্ষা করে আবার কখন সেই পথিক আসবে। প্রকৃতির কথা শুনে ও ভাবগতিক দেখে তার মা আশ্চর্য হয়ে যায়। প্রকৃতি বলে, 'আমি চাই তাঁকে। তিনি আচমকা এসে আমাকে জানিয়ে গেলেন, আমার সেবাও চলবে বিধাতার সংসারে, এতবড়ো আশ্চর্য কথা!' এখানে প্রকৃতি নিজেকে নূতন করে আবিষ্কার করেছে, উপলব্ধি করেছে মানবাত্মার মর্যাদা। তাই চণ্ডালকন্যা হয়েও সে আনন্দের প্রেমাকাঙ্ক্ষী। বৌদ্ধধর্মে মানুষে মানুষে সমতার

১৪২ ভূমিকা, 'চণ্ডালিকা'
১৪৩ 'রবীন্দ্রজীবনী' ৩য় খণ্ড (১ম সং), পৃ. ৩৬৪

আদর্শ স্থাপন করে তথাকথিত অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য মানুষকে অপমানের তলা থেকে তুলে যে গৌরবদান করেছে এখানে তা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান।

প্রকৃতির মা তাকে সাবধান করে বলে, সে অশুচি চণ্ডালকন্যা, নিজের জায়গাটুকুর বাইরে সর্বত্র তার অপরাধ। কিন্তু প্রকৃতি এই আত্মাবমাননা স্বীকার করে না। সে বলে, 'ব্রাহ্মণের ঘরে কত চণ্ডাল জন্মায় দেশে দেশে, আমি নই চণ্ডাল।' ধর্মের কথায় প্রকৃতি জবাব দেয়, 'তাঁকেই মানি যিনি আমাকে মানেন। যে-ধর্ম অপমান করে সে ধর্ম মিথ্যে। অন্ধ করে, মুখ বন্ধ করে সবাই মিলে সেই ধর্ম আমাকে মানিয়েছে।' এখানে প্রকৃতির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহীসত্তাই প্রকাশ পেয়েছে। যে ধর্ম মানুষকে মর্যাদা না দিয়ে অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ তাকে কোনদিন ধর্ম বলে স্বীকার করেন নি। সে দাসত্বেরই নামান্তর। রবীন্দ্রসাহিত্যে সর্বত্র মানবাত্মার বন্ধনমুক্তির বাণীই ধ্বনিত হয়েছে। ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে রবীন্দ্রনাথ মানুষের কোনরকম দাসত্বকে কোনদিন সহ্য করতে পারেন নি। বৌদ্ধধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের অন্যতম প্রধান কারণ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মানুষের এই বন্ধনমুক্তির জন্য। বৌদ্ধধর্মের এই আদর্শটি নাটিকায় বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

অবশেষে মন্ত্রের জোরে অসীম গ্লানি নিয়ে আনন্দ এলেন প্রকৃতির দ্বারে। কিন্তু মহাপুরুষের এই অগৌরব সে আর সহ্য করতে পারল না। নারীর ক্ষুধার্ত প্রেম প্রণাম হয়ে লুটিয়ে পড়ল তাঁর পায়ে। এমনি ভাবে অসীম দুঃখের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এখানে মোহের উপর কল্যাণকে জয়ী করলেন।

শ্যামা (১৯৩৯)—মহাবস্তু-অবদানের যে কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'পরিশোধ' (১৮৯৯) কবিতা লিখেছিলেন, সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পরে আবার সেই কাহিনী নিয়ে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য রচনা করেন।

মূল কাহিনীটি এভাবে দেওয়া আছে।[১৮৮] তক্ষশিলার বণিক বজ্রসেন বারাণসীতে এসে রাত্রে পরিত্যক্ত গৃহে বাসকালে চোররূপে ধৃত হয়। বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার সময় বারাঙ্গনা শ্যামা তাকে দেখে প্রেমাসক্ত হয় এবং কৌশলে মুক্ত করে আনে। এর বদলে একজন শ্রেষ্ঠিপুত্রের প্রাণ দিতে হয়। শ্যামা বজ্রসেনের প্রেমে আত্মহারা। কিন্তু বজ্রসেন নির্দোষ শ্রেষ্ঠিপুত্রের নির্মম হত্যার কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না। একদিন নৌ-বিহারের সময় বজ্রসেন শ্যামাকে জলে ডুবিয়ে দেয় এবং মৃত মনে করে নদীর ঘাটে রেখে পালিয়ে যায়।

ভাবের দিক্ থেকে মূল কাহিনীর সঙ্গে 'শ্যামা' নাটিকার পার্থক্য লক্ষ্য করবার বিষয়। মূল কাহিনীতে বজ্রসেন প্রাণের ভয়ে কিংবা পাপবোধে শ্যামাকে

[১৮৮] *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal,* p. 135

নিষ্ঠুরভাবে পরিত্যাগ করেছে। রবীন্দ্রনাথ বজ্রসেনের মনে পাপবোধ জাগ্রত করেছেন। কিন্তু এই পাপবোধকে ছাড়িয়েও নাটিকায় এক অপরূপ করুণরসের সৃষ্টি হয়েছে।—

ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষম হে মম দীনতা পাপীজনশরণ প্রভু।

নাটিকার সমাপ্তিতে এই ভাবটিই শুধু আমাদের মনে গুঞ্জন তোলে। তখন শ্যামার প্রেম কিংবা বজ্রসেনের নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান এর নিকট গৌণ হয়ে যায়। নাটিকার মধ্যে শেষ পর্যন্ত এই ক্ষমার আদর্শই করুণরসের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

গাথাকবিতায়

রবীন্দ্রনাথের 'কথা' (১৯০০) কাব্যের অন্তর্গত বৌদ্ধ আখ্যানমূলক কবিতাগুলিতে বৌদ্ধযুগের ও বৌদ্ধ ভাবধারার পরিচয়টি অতি সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। বস্তুত সন্ন্যাসী উপগুপ্ত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে উক্তি করেছেন তা এই কবিতাগুলি সম্বন্ধে প্রয়োগ করে বলা যায়, 'এসকল কাহিনী বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কী মহিমায়, এ কী করুণায় প্রকাশ পেয়েছিল।' বৌদ্ধধর্মের স্পর্শে ভারতবর্ষের চিত্ত-সরোবরে ত্যাগে প্রেমে সেবায় ও ভক্তিতে যে অমৃত-শতদল প্রস্ফুটিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ সুনিপুণ মালাকারের ন্যায় তা এখানে নূতন করে চয়ন করেছেন।

'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' কবিতায় দেখা যায়, প্রভু বুদ্ধের নামে ভিক্ষাপ্রার্থী অনাথ-পিণ্ডদ শ্রাবস্তীপুরীর গগন-লগন প্রাসাদশ্রেণী অতিক্রম করে চলেছেন। ধনী পৌরজনের মুঠি মুঠি রত্নমাণিক্যের জন্য তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। অবশেষে মহানগরীর সীমা পার হয়ে বনের প্রান্তে এসে দীন নারীর ছিন্ন বসন শ্রেষ্ঠদান হিসাবে মাথায় তুলে নিলেন। নারী পূজার আবেগে লজ্জা নিবারণের একমাত্র পরিধেয় বসন পর্যন্ত দিতে পারে, রবীন্দ্রনাথ এই মহনীয় ত্যাগের চিত্রই এখানে জাগিয়ে তুলেছেন।

'নগরলক্ষ্মী'তে দেখি সেই সমৃদ্ধ শ্রাবস্তী নগরী দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হলে ভগবান বুদ্ধ ক্ষুধিতের অন্নদানের জন্য জনে জনে আবেদন জানালেন। ধনী মানী যাঁরা ছিলেন সকলেই ক্ষুধার্ত বিশালপুরীর ক্ষুধা মিটাবার অক্ষমতা জ্ঞাপন করে নীরব হলেন।

নির্বাক্ সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী-'পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি।

তখন বেদনায় অশ্রুপ্লুতা ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া বুদ্ধদেবের চরণধূলি নিয়ে বললেন, তিনি নগরীর অন্ন বিলাবার ভার গ্রহণ করবেন, খাদ্যহারা এসকল বুভুক্ষু মানুষ তাঁরই সন্তান। ভিক্ষুণী হয়ে কোন্ সাহসে এই গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন—

আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা—
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধযুগের আর এক মহনীয় আত্মত্যাগের আদর্শ তুলে ধরেছেন 'মস্তক বিক্রয়' কবিতায়। ঈর্ষাপরায়ণ কাশীরাজের নিকট পরাজিত হয়ে দীনের প্রতিপালক কোশলরাজ বনের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সর্বহারা অভাগা বণিক তার দুঃখের কাহিনী জানালে বনবাসী কোশলরাজ নিজ শিরের বিনিময়ে বণিকের অর্থাগমের জন্য কাশীরাজের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন—

'আমার ধরা পেলে যা দিবে পণ
দেহো তা মোর সাথিটিরে।'
উঠিল চমকিয়া সভার লোকে,
নীরব হল গৃহতল;
বর্ম-আবরিত দ্বারীর চোখে
অশ্রু করে ছলছল।

এই কাহিনী পড়ে পাঠকের চোখও ছলছল করে ওঠে।

'অভিসার' রজনীতে মথুরাপুরীর আরেক চিত্র ভেসে ওঠে। রূপের বেসাতি নিয়ে যৌবনমদে মত্তা নগরীর নটী বাসবদত্তা চলেছে অভিসারে। পথে নবীন গৌরকান্তি তরুণ সন্ন্যাসী উপগুপ্তকে ললিতকণ্ঠে তার বিলাসকুঞ্জে আমন্ত্রণ জানায়। করুণকণ্ঠে সন্ন্যাসী বলেন, সময় হলে তিনি নিজেই যাবেন। তারপর একদিন উতলা চৈত্রসন্ধ্যায় সন্ন্যাসী একা নির্জন পথে চলেছেন। নগরের বাইরে এসে দেখতে পেলেন রোগমসীঢালা মৃতপ্রায় পরিত্যক্ত এক নারীদেহ। তিনি আর্ত নারীর শির সযত্নে নিজ অঙ্কে তুলে নিয়ে সেবা করেন। নারী তার দয়াময় পরিত্রাতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সেই নবীন সন্ন্যাসীর পরিচিত কণ্ঠে শুনতে পায়—

'আজি রজনীতে হয়েছে সময়
এসেছি বাসবদত্তা।'

যথার্থই একমাত্র রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের এই মহান সেবাধর্মের কাহিনীকে 'এত মহিমায় এত করুণায়' প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন।

'সামান্য ক্ষতি'-তে দেখা যায়, মহিষী করুণার এক-প্রহরের নিষ্ঠুর লীলায় দরিদ্র প্রজার কুটিরগুলি লেলিহান অগ্নিশিখায় নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিচারে কাশীরাজ তাঁর মহিষীকে ভিখারি নারীর বেশ পরিয়ে আদেশ দিলেন দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে যেন সে দরিদ্রের কুটিরগুলি তৈরী করে দেয়। তারপর এক বৎসর পরে সে করজোড়ে রাজসভায় এসে জানাবে, জীর্ণ-কুটিরগুলি নাশ করে জগতের কতটুকু ক্ষতি হয়েছে। এখানে বৌদ্ধযুগের নৃপতির রাজধর্ম ন্যায়ধর্ম রক্ষা করবার এক কঠিন সুন্দর দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে।

'মূল্যপ্রাপ্তি'-তে সুদাস মালী অকালের পদ্মফুলটি বহু মাষা স্বর্ণের বিনিময়েও বিক্রী না করে চলেছে প্রভু বুদ্ধের চরণে উৎসর্গ করতে। বুদ্ধদেব জেতবন উজ্জ্বল করে বিরাজ করছেন।—

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে
নিরঞ্জন আনন্দমুরতি।
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে স্ফুরিছে অধর 'পরে
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।

ব্যাকুল সুদাস পরম আগ্রহে প্রভুর চরণপদ্মে নিবেদন করে তার ফুল এবং প্রার্থনা করে—

'প্রভু, আর কিছু নহে,
চরণের ধূলি এক কণা।'

ভক্তির আলোকে ভক্ত ও ভগবানের রূপটি রবীন্দ্রনাথ এখানে এক অপার মহিমায় প্রকাশ করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, এই কবিতাগুলি পাঠ করলে বৌদ্ধ ভাবধারা ও বৌদ্ধযুগের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সে যুগের একটি ভৌগোলিক চিত্রও আমাদের মানসপটে জেগে ওঠে। শ্রাবস্তীর গগন-লগন প্রাসাদ ও অনাথপিণ্ডদ শ্রেষ্ঠির জেতবন বিহার, গৃধ্রকূট পর্বতের পাদদেশে বিম্বিসারের প্রাসাদকাননের স্তূপ, বরুণার তীরে অতীতের ব্রহ্মদত্তের রাজধানী বারাণসী এবং মথুরাপুরীর হর্ম্যরাজি যেন আমরা আবার নূতন করে দেখতে পাই। আর সর্বোপরি এই কবিতাগুলির সর্বত্র দেখতে পাই ভগবান বুদ্ধের কল্যাণসুন্দর দীপ্তি। ত্যাগে প্রেমে সেবায় ভক্তিতে সে যুগের যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহৎ আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে, তা যেন ভগবান বুদ্ধের দীপ্তি থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি। সব কিছুর উর্ধ্বে তিনি মধ্যগগনের সূর্যসম অম্লান জ্যোতিতে বিরাজমান।

বিবিধ প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধ আখ্যানমূলক নাটক ও কবিতাগুলির সঙ্গে আরো একটি জিনিস আলোচনার অপেক্ষা রাখে। রবীন্দ্রনাথের এমন কয়েকটি নাটক ও উপন্যাস আছে যেখানে মূলত কোন বৌদ্ধ ভাবধারার প্রভাব নেই, অথচ সেখানে তিনি কোন সময়ে হঠাৎ বুদ্ধদেব কিংবা বৌদ্ধধর্মের কথা উল্লেখমাত্র করেছেন। কিন্তু এই সামান্য উল্লেখও কোন কোন ক্ষেত্রে অসামান্য রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'শোধবোধ' (১৯২৬) নাটিকা 'নটীর পূজা'র সমকালীন। এই নাটিকায় নায়ক-নায়িকার সংলাপের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি।—

নলিনী—এই টেনিস্‌কোর্টের অযোগ্যতাকে তুমি অযোগ্যতা বলে লজ্জা পাও? এতেই আমি সবচেয়ে লজ্জা বোধ করি। তুমি তো তুমি, এখানে স্বয়ং বুদ্ধদেব এসে যদি দাঁড়াতেন, আমি দুই হাত জোড় করে পায়ের ধুলো নিয়েই তাঁকে বলতুম, ভগবান, লাহিড়িদের বাড়ির এই টেনিস্‌কোর্টে আপনাকে মানায় না, মিস্টার নন্দীকে তার চেয়ে বেশি মানায়। শুনে কি তখনই তিনি হার্মানের বাড়ি ছুটতেন টেনিস্‌সুট অর্ডার দিতে।
সতীশ—বুদ্ধদেবের সঙ্গে—
নলিনী—তোমার তুলনাই হয় না, তা জানি। আমি বলতে চাই টেনিস্‌কোর্টের বাইরেও একটা মস্ত জগৎ আছে—সেখানে চাঁদনির কাপড় পরেও মনুষ্যত্ব ঢাকা পড়ে না।[১৪৪]

উক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে লক্ষ্য করবার বিষয় হল, রবীন্দ্রনাথ এই মস্ত জগতের মধ্যে বুদ্ধদেবকেই মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ হিসাবে খুঁজে পেয়েছেন। আর একটি উদাহরণ থেকে একথা আরো স্পষ্ট হবে। 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে নিখিলেশের আত্মকথায় একস্থানে বলা হয়েছে—

"সেদিন বিমলাকে এসে বললুম, বিমল, আমাদের দুজনের জীবন দেশের দুঃখের মূল-ছেদনের কাজে লাগাব।

বিমল হেসে বললে, তুমি দেখছি আমার রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, দেখো শেষে আমাকে ভাসিয়ে চলে যেয়ো না। আমি বললুম, সিদ্ধার্থের তপস্যায় তাঁর স্ত্রী ছিলেন না, আমার তপস্যায় স্ত্রীকে চাই।"[১৪৫]

দেশের দুঃখমোচনের কাজে যেখানে আত্মত্যাগের সংকল্প জেগেছে

[১৪৪] 'শোধবোধ', রচনাবলী (প-ব সরকার) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮০২
[১৪৫] 'ঘরে বাইরে', রচনাবলী (প-ব সরকার) ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৭

সেখানেও রবীন্দ্রনাথ ত্যাগের শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত খুঁজে পেয়েছেন বুদ্ধদেবের মধ্যে, যিনি প্রিয়তমা পত্নী ও রাজ্যসংসার ছেড়ে মানুষের দুঃখমোচনের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আর আপন কর্মজীবনেও যে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন তা আমরা বিশ্বভারতী ও বৌদ্ধ ভাবাদর্শ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করেছি। এই উপন্যাসের আরেক জায়গায় নিখিলেশের মুখে শুনতে পাই—

> সুন্দরকে আমরা দেখতেই পাই নে যতক্ষণ না তাকে আমরা ছেড়ে দিই। বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেক্‌জাণ্ডার করেন নি।[১৫৭]

রবীন্দ্রনাথের মতে বুদ্ধদেব ত্যাগের দ্বারা প্রেমের দ্বারা যে পৃথিবী জয় করেছিলেন তা-ই সত্যকারের জয়। আর আলেক্‌জাণ্ডার লোভের বশবর্তী হয়ে অস্ত্রের দ্বারা যে ভূখণ্ড অধিকার করেছিলেন তা সত্যকারের জয় নয়। সেজন্য দেখা যায়, আলেক্‌জাণ্ডারের অস্ত্রবলে অর্জিত ভূখণ্ড কালক্রমে স্থায়ী হয় নি; কিন্তু বিনা অস্ত্রে অর্জিত বুদ্ধদেবের প্রেমের সাম্রাজ্য মানবমনে চিরদিন দেদীপ্যমান হয়ে বিরাজ করছে। আর নিখিলেশের চরিত্রাঙ্কনে কিংবা অন্যান্য নাটক ও উপন্যাসের কোন কোন আদর্শ চরিত্রচিত্রণে কবি তাঁর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বুদ্ধদেবের চরিত্র দ্বারা যে প্রভাবিত হন নি, সেকথা জোর করে বলা যায় না।

'শেষের কবিতা' (১৯২৯) উপন্যাসে শোভনলাল সম্বন্ধে অমিত এক জায়গায় লাবণ্যকে বলেছে—

> এক সময়ে সে খেপেছিল, আফগানিস্থানের প্রাচীন শহর কাপিশের ভিতর দিয়ে একদিন যে পুরোনো রাস্তা চলেছিল সেইটেকে আয়ত্ত করবে। ওই রাস্তা দিয়েই ভারতবর্ষে হিউয়েন-সাঙের তীর্থযাত্রা, ওই রাস্তা দিয়েই তারও পূর্বে আলেকজাণ্ডারের রণযাত্রা।...এবার ইচ্ছে হয়েছে, হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তটাতেও সন্ধান করবে। বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের রাস্তা এ দিক্‌ দিয়ে কোথায় কোথায় গেছে সেইটে দেখতে চায়। ওই পথ-খেপাটার কথা মনে করে আমারও মন উদাস হয়ে যায়। পুঁথির মধ্যে আমরা কেবল কথার রাস্তা খুঁজে খুঁজে চোখ খোওয়াই, ওই পাগল বেরিয়েছে পথের পুঁথি পড়তে, মানববিধাতার নিজের হাতে লেখা।[১৫৮]

প্রথমে একটা কথা এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। 'শেষের কবিতা' উপন্যাস প্রকাশের মাত্র বৎসর দুয়েক পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭ সালের শেষের দিকে

[১৫৭] 'ঘরে বাইরে', রচনাবলী (প-ব সরকার) ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫০১
[১৫৮] 'শেষের কবিতা', রচনাবলী (প-ব সরকার) ৯ম খণ্ড, পৃ. ৭৭৪

বৌদ্ধধর্মের স্মৃতিবিজড়িত দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ ভ্রমণ করেন। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ যে বৌদ্ধধর্মবিজিত প্রায় সমস্ত দেশগুলি পরিভ্রমণ করেছেন সেকথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে আমরা বুঝতে পারি, আফগানিস্থানের প্রাচীন শহর কাপিশের ভিতর দিয়ে হিউয়েন-সাঙ যে পথে ভারতবর্ষে এসেছেন কিংবা হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের রাস্তা কোথায় কোন্ দিকে গেছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল। শুধু তাই নয়, এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক জ্ঞানও স্বীকার না করে উপায় নেই। 'পথ-খেপা' বন্ধু শোভনলালের কথা মনে করে অমিত রায়ের মন উদাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিজের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে জানলে অমিত অনেক বেশি আশ্চর্য হত। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মত 'পথ-খেপা' আর কে আছে এবং মানববিধাতার নিজের হাতে লেখা পুঁথি তাঁর চেয়ে আর কে বেশি পড়েছে! বিশেষত বৌদ্ধধর্ম অধ্যুষিত দেশসমূহে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ব্যাপক ভ্রমণ করেছেন এবং বৌদ্ধ-সভ্যতার আলোকে সেসকল দেশের যে বিস্তৃত মনোজ্ঞ বিবরণ রেখে গেছেন তার তুলনা বিরল। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক অনুরাগ এর থেকে সহজে অনুমান করা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শ ও বৌদ্ধধর্ম

ক। সাদৃশ্য

রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধধর্ম আলোচনা মূলত কোন তত্ত্বালোচনা নয়। সেজন্য দেখা যায় চারি আর্যসত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মের মূল দার্শনিক তত্ত্বগুলি তিনি আলোচনা করেন নি। পক্ষান্তরে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ কতকগুলি আদর্শের উপর তিনি সর্মাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যায়, এই আদর্শগুলি রবীন্দ্রনাথের নিজের মধ্যেও প্রবল ছিল। এমনি ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক ভাবধারা কিংবা কবীর, দাদূ প্রভৃতি মধ্যযুগের সাধকদের জীবনদর্শনের মধ্যেও যেখানে আপন চিত্তে বিধৃত আদর্শের সমর্থন খুঁজে পেয়েছেন সেখানেই তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। বৌদ্ধধর্মের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথকে সর্বাপেক্ষা বেশি আকর্ষণ করেছে প্রথমে সে আলোচনা করা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মে একদিকে আচার ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান এবং অন্য দিকে দার্শনিক তত্ত্বের প্রাধান্য বেশি। এখানে মানব সম্পর্ক এবং দয়া করুণা প্রেম প্রভৃতি মানুষের হৃদয়বৃত্তি বিকাশের প্রতি লক্ষ্য অপেক্ষাকৃত কম। আর ত্যাগে প্রেমে কল্যাণে মানুষী মহিমার যা কিছু শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাকেও দৈবী লীলারূপে চিত্রিত করার একটা সচেতন প্রয়াস দেখা যায়। যেহেতু এখানে মানুষের চেয়ে দেবতা বড়, মর্ত্যলোকের চেয়ে অমর্ত্যলোকের মহিমা অধিকতর স্বীকৃত। পক্ষান্তরে বৌদ্ধধর্মে মানবসম্পর্ক ও উক্ত হৃদয়বৃত্তিকেই অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এখানে যাগযজ্ঞ ও বাহ্যিক অনুষ্ঠানের কোন সার্থকতা নেই। মানুষের মধ্যে যে উদ্যম, শ্রেয়োবোধ ও কল্যাণশক্তির মহিমা নিহিত রয়েছে, তাকে উদ্বুদ্ধ করাই বৌদ্ধধর্মের প্রধান লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই অনুধাবন করেছেন—

> ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহা তিনি

আহ্বান করিয়াছিলেন। এমনি করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, মানুষের অন্তরের জ্ঞান শক্তি ও উদ্যমকে তিনি মহীয়ান করিয়া তুলিলেন। মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।[১]

বাস্তবিক দয়া কল্যাণ প্রভৃতি বৃত্তিসমূহ একান্তভাবে স্বর্গের সামগ্রী নয়, তা মানব মহিমারই শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। বিশেষত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এর স্পষ্ট প্রমাণ নিহিত রয়েছে। বুদ্ধদেব তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মে বিভিন্ন প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বিশেষত মনুষ্যরূপে তিনি প্রতি জন্মে দান শীল ক্ষান্তি মৈত্রী প্রভৃতি পারমীর একটি না একটি পূর্ণতাসাধন করে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এর মধ্য দিয়ে মানুষের কল্যাণশক্তির অমিত মহিমাই অত্যুজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পেয়েছে। এর থেকে বুঝতে পারা যায়, বৌদ্ধধর্মে মানুষের হৃদয়বৃত্তি বিকাশের প্রতি কতখানি গুরুত্ব দান করা হয়েছে।

জ্ঞানের মর্যাদা ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেই বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এখানেও উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করবার বিষয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে জ্ঞান প্রধানত তত্ত্বমুখী, আর বৌদ্ধধর্মে জ্ঞান প্রধানত প্রেমমুখী। এসকল দিক্ থেকে বিচার করতে গেলে আধুনিক কাল তথা আধুনিক মনের পক্ষে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের চেয়ে বৌদ্ধ আদর্শই অধিকতর উপযোগী। আর রবীন্দ্রনাথ চিরদিন মানবধর্ম অর্থাৎ মৈত্রীধর্মেরই উপাসক। রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতকে কোন নাম দিতে হলে মানুষের ধর্মই বলতে হবে। কেন না মানুষই এখানে প্রধান লক্ষ্য, যে মানুষের পরিচয় জাতিগত, সম্প্রদায়গত ও ভৌগোলিক সীমানা ডিঙিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে আছে সর্বদেশে ও সর্বকালে। বস্তুত নবযুগের ধর্মের আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে উক্তি করেছেন তাঁর মধ্যে তাঁর আপন ধর্মবোধের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে।—

> আধুনিক পৃথিবীতে সেই পুরাতন ধর্মের সহিত নূতন বোধের বিরোধ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে এমন একটি ধর্মকে চাহিতেছে যাহা কোনো একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম নহে: যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতির দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই; মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হউক যে ধর্ম কোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বরঞ্চ সকল দিকেই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিবে। মানুষের জ্ঞান আজ যে মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেইখানকার উপযোগী

[১] মন্দির, 'বিচিত্র প্রবন্ধ'। 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে সংকলিত, পৃ. ৪৮

> হৃদয়বোধকে এবং ধর্মকে না পাইলে তাহার জীবনসংগীতের সুর মিলিবে না, এবং কেবলি তাল কাটিতে থাকিবে।[২]

এখানে রবীন্দ্রনাথ এমন এক নবধর্মের আদর্শকে তুলে ধরেছেন যা একদিকে চিরাচরিত প্রথার বন্ধন থেকে মানুষের জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধিকে মুক্ত রাখবে, আবার অন্য দিকে মানুষের হৃদয়কে প্রসারিত করে কল্যাণের প্রেরণা দান করবে। জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে জীবনের এই সমন্বিত রূপের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-চিন্তার প্রধান পরিচয় নিহিত।[৩] আর রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের এক গভীর ঐক্য দেখা যায়। এই ধর্মে জ্ঞানকে যেমন উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে তেমনি মৈত্রী-করুণার প্রেরণাও প্রবল। এখানেই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক যোগসূত্র। এইজন্যই দেখা যায়, বৌদ্ধধর্মে যেখানে মানুষের আত্মশক্তি ও মোহমুক্ত জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে সেখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রধান আকর্ষণ; এইজন্যই বুদ্ধদেব তথা বৌদ্ধধর্মের করুণার বাণী, ত্যাগের আদর্শ ও বিশ্বতোমুখী কল্যাণচিন্তার জয়গানে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতিটি বিভাগ এমন সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বৌদ্ধধর্মের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথকে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ করেছে এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় বলেছেন—

> অহিংসা, করুণা, ত্যাগ, বিশ্বমৈত্রী, ঐক্য, সংহতি এবং সর্বমানবের সমতা, প্রধানতঃ এই ক'টি নীতিই বৌদ্ধসংস্কৃতি ও রবীন্দ্রসংস্কৃতির মধ্যে গভীর যোগসূত্ররূপে কাজ করেছে। এজন্যই চারিত্রপূজারী রবীন্দ্রনাথ পুণ্যচরিত বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নি।[৪]

বৌদ্ধধর্মের এই চিরন্তন আদর্শগুলি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার আলোকে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং এর দ্বারা তিনি কতখানি প্রভাবিত হয়েছেন সে সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তা পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

খ। পার্থক্য

বুদ্ধদেবের নৈতিক আদর্শের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এবং এই আদর্শকে তিনি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-

---

[২] ধর্মের নবযুগ, 'সঞ্চয়'

[৩] প্রবোধচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা; বিশ্বভারতী ১৩৫৯ শ্রাবণ-আশ্বিন, পৃ. ২৫

[৪] প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ৬৬

নাথের ধর্মাদর্শের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে তাকেও উপেক্ষা করা যায় না। বুদ্ধদেব যে নীতির কথা বলেছেন এখানেই বৌদ্ধধর্মের শেষ কথা নয়। তা হল উপায় মাত্র। বুদ্ধদেব তাকে বলেছেন ভেলা।[৫] সাগর পার হতে গেলে যেমন ভেলার প্রয়োজন তেমনি ভবসাগর থেকে উত্তীর্ণ হতে গেলেও এই নীতি বা মার্গ অনুসরণ করতে হবে।[৬] এখানে একমাত্র লক্ষ্য হল পারে যাওয়া। বুদ্ধদেব একেই বলেছেন নির্বাণ বা মুক্তি। এই মুক্তি অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও ভববন্ধন থেকে মুক্তি। মানুষের সকল দুঃখের মূলে রয়েছে অবিদ্যা। এর থেকে উৎপন্ন হয় তৃষ্ণা। আবার এই তৃষ্ণার ফলেই মানুষ জন্মান্তরের আবর্তে ঘুরে মরে। পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করা দুঃখজনক। কেননা জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, প্রিয়-বিয়োগ ও অপ্রিয়সংযোগ প্রভৃতি দুঃখে পরিপূর্ণ এই জগৎ। এখানে কোথায় আনন্দ কোথায় সুখ! সেজন্য বুদ্ধদেব তৃষ্ণার মূলোচ্ছেদ করে জন্মান্তরের অনুশাসন মুক্ত হয়ে নির্বাণলাভের কথা বলেছেন। এখানেই বৌদ্ধধর্মের পরম প্রাপ্তি ও চরম লক্ষ্য।

বুদ্ধদেব এখানে যে মুক্তির কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ সে অর্থে মুক্তির কথা বলেন নি। সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াকেই রবীন্দ্রনাথ মুক্তি মনে করেন না। বরঞ্চ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে এখানে একটা বিপরীত সুরই ধ্বনিত হয়েছে।—

> বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
> অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ।[৭]

রবীন্দ্রনাথ এখানে যে বন্ধনের কথা বলেছেন সে বন্ধন আনন্দের বন্ধন, প্রেমের বন্ধন। এই প্রেমের মধ্যেই রয়েছে যথার্থ মুক্তি। কবি জগতের এই প্রেমের বন্ধনকে অস্বীকার করেন না।—

> প্রকৃতি তাহার রূপরস বর্ণগন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া, আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে।...জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন—

[৫] মজ্ঝিমনিকায় ১, ১৩৪
[৬] বৌদ্ধ পরিভাষায় এর নাম আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এর আটটি অঙ্গ হল সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি
[৭] নৈবেদ্য, ৩০

আর কাহারও টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়া সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ—সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।[৮]

জগতের প্রতি মানুষের প্রতি কবির অসীম আকর্ষণ। তাঁর নিকট 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি'; তিনি সীমার মধ্যেই অসীমের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেন। সংসারকে অস্বীকার করে এবং সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিন্ন করে একান্ত বিশুদ্ধ-ভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করা যায় না। রবীন্দ্রসাহিত্যে নানা ভাবে এই কথাই ব্যক্ত হয়েছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র মধ্যেও তিনি এই তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। সংসার বিমুখতার আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ কোনদিন গ্রহণ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রসাহিত্য মর্ত্যপ্রেম ও মানবপ্রেমের বাণীতে পরিপূর্ণ।—

শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে;
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
ভরে আসে আঁখিজল—
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা,
লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল।[৯]

কবির নিকট এই সংসারের কিছুই তুচ্ছ নয়, স্বর্গের চেয়েও প্রিয় এই পৃথিবী। তাই তো কবি বার বার কান্নাহাসির এই জগতের মধ্যেই ফিরে আসতে চান।—

আবার যদি ইচ্ছা কর
আবার আসি ফিরে
দুঃখসুখের-ঢেউ-খেলানো
এই সাগরের তীরে।
আবার জলে ভাসাই ভেলা,
ধুলার 'পরে করি খেলা,
হাসির মায়ামৃগীর পিছে
ভাসি নয়ন-নীরে।

[৮] 'আত্মপরিচয়'—১
[৯] পুরস্কার, 'সোনার তরী'

কাঁটার পথে আঁধার রাতে
আবার যাত্রা করি—
আঘাত খেয়ে বাঁচি কিংবা
আঘাত খেয়ে মরি।
আবার তুমি ছদ্মবেশে
আমার সাথে খেলাও হেসে,
নূতন প্রেমে ভালোবাসি
আবার ধরণীরে।[১০]

বুদ্ধদেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এখানে সহজেই ধরা পড়ে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'গীতালি'র অন্তর্গত উদ্ধৃত কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়াতে বসেই রচনা করেন। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অন্য একটি উদাহরণ থেকে আরো স্পষ্ট হবে।—

কহিল গভীর রাতে সংসারে বিরাগী
"গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে?"
দেবতা কহিলা, "আমি"।—শুনিল না কানে।
সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল, "কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা?"
দেবতা কহিলা, "আমি"।—কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ন ছাড়ি, "তুমি কোথা প্রভু?"
দেবতা কহিলা, "হেথা"।—শুনিল না তবু।
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি—
দেবতা কহিলা, "ফির"। শুনিল না বাণী।
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, "হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়?"[১১]

'চৈতালি'র অন্তর্গত এই কবিতাটি রাজকুমার সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বুদ্ধদেবের জীবনদর্শনের একটি প্রধান দিক্ দুঃখসত্য। তাঁর জীবন ও বাণীতে দুঃখের একটি নির্মম কঠোর রূপ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জাতক-

[১০] 'গীতালি', ৮৬
[১১] বৈরাগ্য, 'চৈতালি'

নিদানে উল্লিখিত হয়েছে, মহাভিনিষ্ক্রমণের প্রাক্‌কালে রাজকুমার সিদ্ধার্থ জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও প্রব্রজিত পুরুষ—এই চারিনিমিত্ত দর্শন করেন। এর থেকে তিনি জীবনের দুঃখরূপটি প্রথম গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন। মানুষের জীবনে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু দুঃখ অনিবার্যরূপেই আসে। এই দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় উদ্‌ভাবনের জন্যই তিনি সংসার ত্যাগ করে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বুদ্ধত্বলাভের পর সারনাথের ইসিপতন মৃগদাবে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের[১২] নিকট সর্বপ্রথম তিনি যে নবলব্ধ সত্যধর্ম বিবৃত করেছেন তা'ও দুঃখকে কেন্দ্র করে। দুঃখ আছে, দুঃখের হেতু আছে, দুঃখের নিরোধ আছে এবং দুঃখ নিরোধের উপায় আছে—এই চারি আর্যসত্য বৌদ্ধদর্শনের গোড়ার কথা।[১৩] এর থেকে বুঝতে পারা যায়, দুঃখসত্য বৌদ্ধদর্শনে কতখানি প্রাধান্য লাভ করেছে। মানুষের জীবনে সীমাহীন দুঃখের সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলেছেন—

> চিরকাল তোমরা...মাতা-পিতা-পুত্র-কন্যার মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করেছ। রোগের ভোগের বিপত্তি সহ্য করেছ, প্রিয়-বিয়োগ অপ্রিয়-সংযোগ হেতু রোদন করেছ। ক্রন্দন করতে করতে তোমরা যত অশ্রু বিসর্জন করেছ তা চারি মহাসমুদ্রের জল থেকেও বেশি।[১৪]

সমস্ত জগৎ জুড়ে রয়েছে এক অনির্বাণ জ্বালা। এখানে দুঃখের আগুনে সবাই জ্বলেপুড়ে মরছে। তাই বুদ্ধদেব মানুষের প্রতি বার বার এ কথাই বলতে চেয়েছেন—

> 'কো নু হাসো কিমানন্দো নিচ্চং পজ্‌জলিতে সতি।'[১৫]

অর্থাৎ, এখানে জ্বলেপুড়ে মরে তোমার কিসের হাস্য, কিসের আনন্দ?

এমনি ভাবেই বুদ্ধদেব মানবজীবনে দুঃখের নির্মম ভয়াবহ রূপটিকে তুলে ধরেছেন।

বুদ্ধদেব মানুষের জীবনে দুঃখকে যেভাবে একান্ত করে দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেভাবে দেখেন নি। জগতে যে দুঃখ আছে রবীন্দ্রনাথ সে কথা অস্বীকার করেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এই দুঃখ সুখের বিপরীত হলেও আনন্দের বিপরীত নয়, বরং আনন্দের পরিপূরক। সেজন্য দেখা যায়, মানুষ অনেক সময় সানন্দে দুঃখের মহিমাকে বরণ করে নেয়। বুদ্ধদেবের মত রবীন্দ্রনাথ জীবনকে দুঃখময় বলেন নি। কবির নিকট এই জগৎ আনন্দময়।[১৬]

---

[১২] কোণ্ডঞ্‌ঞ, ভদ্দিয়, অস্‌সজি, মহানাম ও বপ্‌প—এই পাঁচ জন বুদ্ধদেবের প্রথম ভিক্ষু-শিষ্য

[১৩] ধম্মচক্কপবত্তন সুত্ত, 'সংযুত্তনিকায়'

[১৪] সংযুত্তনিকায়, ১৪

[১৫] ধম্মপদ, ১৪৬

[১৬] ভবতোষ দত্ত, বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ, জগজ্জ্যোতিঃ ১৩৬৪ প্রবারণা সংখ্যা, পৃ. ২০৩

আর এক পরম আনন্দময়ের প্রসন্নজ্যোতিতে সমগ্র জগৎ প্লাবিত।—

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।
চেতনা আমার কল্যাণরসসরসে
শতদলসম ফুটিল পরম হরষে
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।[১৭]

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি চ"—রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনসাধনার মূলে রয়েছে উপনিষদের এই বাণী। এ কথা কবির নিজের উক্তি থেকেও সপ্রমাণ হবে।—

> উপনিষৎ বলেছেন, আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবন-যাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্তন। বিশ্বজগতে এই-যে আনন্দসমুদ্রে কেবলই তরঙ্গলীলা চলছে প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে, সেই অনন্ত আনন্দ হতেই সে জেগে উঠেছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারম্ভ। তার পরে কর্মের বেগে সে যতদূর পর্যন্তই উচ্ছ্রিত হয়ে উঠুক-না এই অনুভূতিটিই যেন সে রক্ষা করে যে সেই অনন্ত আনন্দসমুদ্রেই তার লীলা চলছে। তার পরে কর্ম সমাধা করে আবার যেন সে অতি সহজেই নত হয়ে সেই আনন্দসমুদ্রের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশান্ত করে দেয়। এই হচ্ছে যথার্থ জীবন। এই জীবনের সঙ্গেই সমস্ত জগতের মিল। সে মিলেই শান্তি এবং মঙ্গল এবং সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।[১৮]

রবীন্দ্রনাথ এখানে যে আনন্দের কথা বলেছেন তার সঙ্গে বুদ্ধদেবের জীবনদর্শনের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানে যেন বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ দুই ভিন্ন জগতের অধিবাসী। একজন জগতের অসীম দুঃখ জ্বালা থেকে মুক্তির জন্য আকুল, আরেকজন জগতের আনন্দরসে মগ্ন। আর সমগ্র

[১৭] 'গীতাঞ্জলি', ৬
[১৮] চিরনবীনতা, 'শান্তিনিকেতন' (২য় খণ্ড)

জগদ্‌ব্যাপারের মূলে মঙ্গলময় আনন্দময় এক পরমপুরুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আজীবন অবিচলিত বিশ্বাসের পরিচয় তাঁর জীবন ও সাহিত্যে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব একেবারেই নীরব। পরমার্থবিষয়ক কোন আলোচনাকে বুদ্ধদেব অবান্তর ও অনর্থকর বলেই অভিহিত করেছেন।

বুদ্ধদেব মুক্তিকামী সাধক। আর রবীন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয় হল তিনি কবি। এখানেই বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শের মূলে পার্থক্য নিহিত। আপাতদৃষ্টিতে সংসারের যা কিছু আমাদের নিকট মনোরম ও আকর্ষণীয়, মানুষের যে স্নেহপ্রেম আমাদের মুগ্ধ করে, বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে এসকল তৃষ্ণার বন্ধনরূপেই প্রতিভাত হয়েছে। এই তৃষ্ণাই মানুষের সকল দুঃখের মূলে। সেজন্য তৃষ্ণার মূলোৎপাটনেই বুদ্ধদেবের সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সাধক নন, তিনি কবি। এই বসুধার দৃশ্যে গন্ধে গানে যে আনন্দের প্রকাশ তা-ই কবির বীণাতন্ত্রীতে ঝংকার তোলে। তা না হলে তিনি কবি হতেন কি করে? তিনি বলেন—

> একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।...শুভ্র নিরঞ্জনের যাঁরা দূত তাঁরা পৃথিবীর পাপ ক্ষালন করেন, মানবকে নির্মল নিরাময় কল্যাণব্রতে প্রবর্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য; তাঁদের আসনের কাছে আমার আসন পড়ে নি। কিন্তু সেই এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহু বিচিত্র হন, তখন তিনি নানা বর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন, আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমরা নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি—যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহৈতুক আনন্দে অধীর আমরা তাঁরই দূত। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ। মানবকে গম্যস্থানে চালাবার দাবি রাখি নে, পথিকদের চলার সঙ্গে চলার কাজ আমার। পথের দুই ধারে যে ছায়া, যে সবুজের ঐশ্বর্য, যে ফুল পাতা, যে পাখির গান, সেই রসের রসদে জোগান দিতেই আমরা আছি। যে বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে, সুরে গানে, নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে, রূপে রূপে, সুখদুঃখের আঘাতে-সংঘাতে, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে—তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপক-গুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এইই আমার একমাত্র পরিচয়।[১১]

আর বুদ্ধদেব যাকে বন্ধন বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ মানুষের সেই স্নেহপ্রেমেই

[১১] 'আত্মপরিচয়'—৪

মুগ্ধ। এই প্রেমের মধ্যেই তিনি পেয়েছেন মুক্তির স্বাদ, অসীমের পুণ্যস্পর্শ। জগতের লীলানিকেতনে রবীন্দ্রনাথ চিরদিন প্রেম ও প্রীতির অর্ঘ্যই দিয়ে এসেছেন। এখানেই তাঁর সার্থকতা। কবি এর বেশি আর কি-ই বা দিতে পারেন।—

ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে, অরণ্য-ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।
সংসার মাঝে দু-একটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর—
তার পরে ছুটি নিব।[২০]

বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ জগতের কাছে তাঁদের সমস্ত জীবনের অভিব্যক্ত সত্যকেই রেখে গেছেন। বুদ্ধদেব মানুষকে দিলেন মুক্তিপথের সন্ধান। তাই মানুষের পূজার বেদীতে তিনি চিরদিন অম্লান মহিমায় বিরাজমান। আর রবীন্দ্রনাথ মানুষকে যে প্রেমগীতিহার উপহার দিয়েছেন, তার বিনিময়ে পেলেন মানুষের হৃদয়ে স্থান। এখানেই তাঁদের সত্য পরিচয়।

---

[২০] পুরস্কার 'সোনার তরী'

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বুদ্ধদেবের প্রতি কবির এই শ্রদ্ধা আজীবন অক্ষুন্ন ছিল। একদিন বুদ্ধগয়াতে গিয়ে কবির মনে বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে প্রণতি জ্ঞাপনের আকুলতা জেগেছিল। আবার জাভায় বোরোবুদুর বুদ্ধমন্দিরের সম্মুখে দাঁড়িয়েও কবির মনে পরম শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে বার বার এই ধ্বনিই গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে—'বুদ্ধের শরণ লইলাম।' এমনি ভাবে রবীন্দ্রনাথ বারে বারে তাঁকেই শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, যাঁর মধ্যে দেখেছিলেন তিনি পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ। বুদ্ধদেব একদিন অপার মৈত্রীতে সকল দেশের সকল কালের মানুষকে আপনার মধ্যে অধিকার করেছিলেন, তাঁর চেতনা রাষ্ট্রগত জাতিগত ও দেশকালের কোন সংকীর্ণ সীমানায় খণ্ডিত হয় নি। বুদ্ধদেবের এই সর্বব্যাপী অপরিমিত মানসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের পূর্ণ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছেন।

সাধারণ মানুষ যে পরিচয় দিয়ে থাকে সেখানে সে বিশেষ শ্রেণীর, বিশেষ জাতির, বিশেষ সমাজের। সে নিজের গণ্ডির বাইরের মানুষকে আপন বলে গ্রহণ করতে পারে না। কেননা তার আত্মীয়তার বোধসীমা সংকীর্ণ। কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁর মৈত্রীবুদ্ধিতে সকল মানুষকে আপন বলে জেনেছিলেন। তাঁর তপস্যা ছিল সকল দেশের সকল মানুষের দুঃখমোচনের সংকল্প নিয়ে। বুদ্ধদেবের এই তপস্যার ফল পৃথিবীর দীনতম মূর্খতম মানুষও পেয়েছে। সেজন্য দেশকালের অভ্যস্ত সীমানা পেরিয়ে তাঁর পরিচয় সর্বদেশে ও সর্বকালে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশের আলোকে দেদীপ্যমান এই মানবমহিমার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের যথার্থ পরিচয় খুঁজে পেয়েছিলেন।

বুদ্ধদেব একদিন সর্বজীবে অপরিমেয় মৈত্রী বিস্তারের কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হিংসাকে মৈত্রীর দ্বারা জয় করবে, অসত্যকে সত্যের দ্বারা। আজ লোভে স্বার্থে ও অহঙ্কারে মানুষের এই বোধ আচ্ছন্ন। পরস্পরের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষে মানবসভ্যতা এক মহাসঙ্কটের সম্মুখীন। রবীন্দ্রনাথ আপন জীবনে দুইটি মহাযুদ্ধের নির্মম বীভৎস অমানুষিকতা প্রত্যক্ষ করেছেন, দেখেছেন রণোন্মাদ জাতিসমূহ দেশপ্রেম জাতিপ্রেমের নাম নিয়ে নির্লজ্জ

হুহুংকারে দলে দলে বেরিয়েছে 'মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভর্তি করতে।' কিন্তু কবি এতদ্‌সত্ত্বেও বিশ্বাস করেন, আজকের হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে ভগবান বুদ্ধের বাণী মানুষকে এই মহাবিনাশের হাত থেকে পরিত্রাণ করতে পারে। তাই সভ্যতার এই দারুণ সংকটের দিনে কবি আকুলভাবে ভগবান বুদ্ধের পুনরাবির্ভাব কামনা করেছেন। কবি বিশ্বাস করেন, অনন্তপুণ্য বুদ্ধের দক্ষিণপাণির কল্যাণস্পর্শে ধরণীর রক্তলেখা মুছে যাবে, পৃথিবী আবার শুচিস্নাত হবে। বুদ্ধদেবের প্রতি এই ঐকান্তিক বিশ্বাস ও নির্ভরতায় রবীন্দ্রসাহিত্য সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

একদিন বুদ্ধদেব জন্মেছিলেন এই ভারতবর্ষে। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন যে, বুদ্ধদেবের সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে সে দিন সমগ্র ভারত-বর্ষেরও প্রকাশ হয়েছে। কেননা বুদ্ধের বাণীতে সেদিন ভারতবর্ষ সকল মানুষকে গ্রহণ করেছে, সকলের অন্তর জয় করেছে। তাই চীন-জাপান, সিংহল-ব্রহ্ম, তিব্বত-মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি প্রায় সমগ্র এশিয়া ভারতবর্ষকে গুরু বলে পরম সমাদরে গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষের এত বড় জয়ের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখা যায় না। এর দ্বারা ভারতবর্ষ সর্বত্র শান্তি সান্ত্বনা ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন করে নিখিল বিশ্বে এক অক্ষয় প্রেমের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। মহাকালের অনন্তস্রোতে কত শত আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য বুদ্‌বুদের মত মিলিয়ে গেছে; কিন্তু বুদ্ধের ভারতের এই প্রেমের সাম্রাজ্য চিরভাস্বর হয়ে আছে।

বুদ্ধদেব তথা বৌদ্ধসংস্কৃতির মাধ্যমে ভারতবর্ষ যেখানে আপন সার্থকতা উপলব্ধি করেছে প্রধানত সেখানেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি নিবদ্ধ। আর বুদ্ধদেব তথা বৌদ্ধধর্মের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ অন্যকে যা দিতে পেরেছে রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যেই দেখেছেন ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্য। বুদ্ধদেবের বাণীতে ভারতবর্ষ একদিন যে সত্য লাভ করেছিল তা শুধু ধর্মতত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন যে, সে সত্যের প্রেরণায় ভারতের মনুষ্যত্ব শিল্পকলায় বিজ্ঞানে ঐশ্বর্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছিল। মানুষের চিত্ত যখন সুপ্তি থেকে, অপ্রকাশ থেকে মুক্তিলাভ করে তখন জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে। বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন শুষ্কতা প্রচার করে নি, দিকে দিকে মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্যকে উদ্‌বোধিত করে তুলেছিল। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, এই ধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন এক 'পরিপূর্ণপ্রাণ বীর্যবান যৌবনের প্রভাব।' এর ফলে দেখা যায় বৌদ্ধধর্মের দ্বারা ভারতবর্ষ শুধু আপনার মধ্যে সার্থকতা অনুভব করে নি, সমুদ্রমরুপারেও এই ধর্ম যেসকল

দেশকে স্পর্শ করেছে সেখানেই তার চিত্তের ঐশ্বর্যকে জাগ্রত করেছে। বৌদ্ধ-ধর্মকে অবলম্বন করে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যে বিরাট শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য করলেই এই সত্য হৃদয়ঙ্গম হবে।

বৌদ্ধধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান এশিয়ার মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের সঙ্গে ভারতবর্ষের মিলন সাধন। ভাষা, সংস্কৃতি ও রীতিনীতিতে ভারতবর্ষের সঙ্গে এদের যে বিরাট পার্থক্য তা এক ধর্মবন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে এসকল জাতিকে এক মহান ঐক্যবন্ধনে বেঁধে দিয়েছে। এশিয়ার বৌদ্ধধর্মবিজিত দেশসমূহ পরিভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ এই সত্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। আর যে বৌদ্ধধর্মের প্রেম ও মৈত্রীর বাণীতে এই মিলন সাধিত হয়েছে তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ খুবই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের এশিয়া তথা বিশ্বপরিক্রমার মূলেও ছিল এই মৈত্রী ও প্রেমের আদর্শকে জয়যুক্ত করার সাধনা। আর এদিক্ থেকে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের ভারতের সার্থক প্রতিনিধি।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নাটকে ও প্রবন্ধে সর্বত্রই বুদ্ধ ও বৌদ্ধসংস্কৃতির মহিমা অত্যুজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তবে বুদ্ধদেবের ধর্মমত আলোচনার ক্ষেত্রে কোন কোন সময়ে তিনি বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব থেকে কিছুটা দূরে সরে এসেছেন। এখানে তাঁর আদর্শবাদ বড় হয়ে উঠেছে। কবির পক্ষে এ অস্বাভাবিক নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও রবীন্দ্রসাহিত্যে বুদ্ধ ও বৌদ্ধসংস্কৃতির কালজয়ী মহিমা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে তার তুলনা বিরল। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সার্থকতা।

পরিশেষ

বুদ্ধদেব

আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলংকার নয়, একান্তে নিভৃতে যা তাঁকে বার-বার সমর্পণ করেছি সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি।

একদিন বুদ্ধগয়াতে গিয়েছিলাম মন্দিরদর্শনে, সেদিন এই কথা আমার মনে জেগেছিল— যাঁর চরণস্পর্শে বসুন্ধরা একদিন পবিত্র হয়েছিল তিনি যেদিন সশরীরে এই গয়াতে ভ্রমণ করছিলেন, সেদিন কেন আমি জন্মাই নি, সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর পুণ্যপ্রভাব অনুভব করি নি?

তখনি আবার এই কথা মনে হল যে, বর্তমান কালের পরিধি অতি সংকীর্ণ, সদ্য উৎক্ষিপ্ত ঘটনার ধূলি-আবর্তে আবিল, এই অল্পপরিসর অস্বচ্ছ কালের মধ্যে মহামানবকে আমরা পরিপূর্ণ করে উপলব্ধি করতে পারি নে, ইতিহাসে বার-বার তার প্রমাণ হয়েছে। বুদ্ধদেবের জীবিতকালে ক্ষুদ্র মনের কত ঈর্ষা, কত বিরোধ তাঁকে আঘাত করেছে; তাঁর মাহাত্ম্য খর্ব করবার জন্যে কত মিথ্যা নিন্দার প্রচার হয়েছিল। কত শত লোক যাঁরা ইন্দ্রিয়গত ভাবে তাঁকে কাছে দেখেছে তারা অন্তরগত ভাবে নিজেদের থেকে তাঁর বিপুল দূরত্ব অনুভব করতে পারে নি, সাধারণ লোকালয়ের মাঝখানে থেকে তাঁর অলৌকিকত্ব তাদের মনে প্রতিভাত হবার অবকাশ পায় নি। তাই মনে করি, সেদিনকার প্রত্যক্ষ ধাবমান ঘটনাবলীর অস্পষ্টতার মধ্যে তাঁকে যে দেখি নি সে ভালোই হয়েছে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা জন্মমুহূর্তেই স্থান গ্রহণ করেন মহাযুগে, চলমান কালের অতীত কালেই তাঁরা বর্তমান, দূরবিস্তীর্ণ ভাবী কালে তাঁরা বিরাজিত। এ কথা সেদিন বুঝেছিলুম সেই মন্দিরেই। দেখলুম, দূর জাপান থেকে সমুদ্র পার হয়ে একজন দরিদ্র মৎস্যজীবী এসেছে কোনো দুষ্কৃতির অনুশোচনা করতে। সায়াহ্ন উত্তীর্ণ হল নির্জন নিঃশব্দ মধ্যরাত্রিতে, সে একাগ্রমনে করযোড়ে আবৃত্তি করতে লাগল : আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। কত শত শতাব্দী হয়ে গেছে, একদা শাক্যরাজপুত্র গভীর রাত্রে মানুষের দুঃখ দূর করবার সাধনায় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়েছিলেন; আর সেদিনকার সেই মধ্যরাত্রে জাপান থেকে এল তীর্থযাত্রী গভীর দুঃখে তাঁরই শরণ কামনা করে। সেদিন তিনি ঐ পাপপরিতপ্তের কাছে পৃথিবীর সকল প্রত্যক্ষ বস্তুর চেয়ে প্রত্যক্ষতম, অন্তরতম; তাঁর জন্মদিন ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে ঐ মুক্তিকামীর

জীবনের মধ্যে। সেদিন সে আপন মনুষ্যত্বের গভীরতম আকাঙ্ক্ষার দীপ্ত-শিখায় সম্মুখে দেখতে পেয়েছে তাঁকে যিনি নরোত্তম। যে বর্তমান কালে ভগবান বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল সেদিন যদি তিনি প্রতাপশালী রাজরূপে, বিজয়ী বীররূপেই প্রকাশ পেতেন, তা হলে তিনি সেই বর্তমান কালকে অভিভূত করে সহজে সম্মান লাভ করতে পারতেন; কিন্তু সেই প্রচুর সম্মান আপন ক্ষুদ্র কালসীমার মধ্যেই বিলুপ্ত হ'ত। প্রজা বড়ো করে জানত রাজাকে, নির্ধন জানত ধনীকে, দুর্বল জানত প্রবলকে—কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণতাকে সাধনা করছে যে মানুষ সেই স্বীকার করে, সেই অভ্যর্থনা করে মহামানবকে। মানব-কর্তৃক মহামানবের স্বীকৃতি মহাযুগের ভূমিকায়। তাই আজ ভগবান বুদ্ধকে দেখছি যথাস্থানে মানবমনের মহাসিংহাসনে মহাযোগের বেদীতে, যার মধ্যে অতীত কালের মহৎপ্রকাশ বর্তমানকে অতিক্রম করে চলেছে। আপনার চিত্তবিকারে আপন চরিত্রের অপূর্ণতায় পীড়িত মানুষ আজও তাঁরই কাছে বলতে আসছে: বুদ্ধের শরণ কামনা করি। এই সুদূর কালে প্রসারিত মানবচিত্তের ঘনিষ্ঠ উপলব্ধিতেই তাঁর যথার্থ আবির্ভাব।

আমরা সাধারণ লোক পরস্পরের যোগে আপনার পরিচয় দিয়ে থাকি; সে পরিচয় বিশেষ শ্রেণীর, বিশেষ জাতির, বিশেষ সমাজের। পৃথিবীতে এমন লোক অতি অল্পই জন্মেছেন যাঁরা আপনাতে স্বতই প্রকাশবান্, যাঁদের আলোক প্রতিফলিত আলোক নয়, যাঁরা সম্পূর্ণ প্রকাশিত আপন মহিমায়, আপনার সত্যে। মানুষের খণ্ড প্রকাশ দেখে থাকি অনেক বড়ো লোকের মধ্যে; তাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা বিদ্বান, তাঁরা বীর, তাঁরা রাষ্ট্রনেতা; তাঁরা মানুষকে চালনা করেছেন আপন ইচ্ছামত; তাঁরা ইতিহাসকে সংঘটন করেছেন আপন সংকল্পের আদর্শে। কেবল পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ তাঁরই, সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষকে যিনি আপনার মধ্যে অধিকার করেছেন, যাঁর চেতনা খণ্ডিত হয় নি রাষ্ট্রগত জাতিগত দেশকালের কোনো অভ্যস্ত সীমানায়।

মানুষের প্রকাশ সত্যে। এই সত্য যে কী তা উপনিষদে বলা হয়েছে: আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি। যিনি সকল জীবকে আপনার মতো করে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। আপনার মধ্যে সত্যকে যিনি এমনি করে জেনেছেন তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হয়েছে, তিনি আপন মানবমহিমায় দেদীপ্যমান।

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
চাত্মানং সর্বভূতেষু ন ততো বিজুগুপ্সতে।

সকলের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সকলকে যিনি দেখতে পেয়েছেন, তিনি আর গোপন থাকতে পারেন না, সকল কালে তাঁর প্রকাশ।

মানুষের এই প্রকাশ জগতে আজ অধিকাংশ লোকের মধ্যে আবৃত। কিছু কিছু দেখা যায়, অনেকখানি দেখা যায় না। পৃথিবীসৃষ্টির আদিযুগে ভূমণ্ডল ঘন বাষ্প-আবরণে আচ্ছন্ন ছিল। তখন এখানে সেখানে উচ্চতম পর্বতের চূড়া অবারিত আলোকের মধ্যে উঠতে পেরেছে। আজকের দিনে তেমনি অধিকাংশ মানুষ প্রচ্ছন্ন, আপন স্বার্থে, আপন অহঙ্কারে, অবরুদ্ধ চৈতন্যে। যে সত্যে আত্মার সর্বত্র প্রবেশ সেই সত্যের বিকাশ তাদের মধ্যে অপরিণত।

মানুষের সৃষ্টি আজও অসম্পূর্ণ হয়ে আছে। এই অসমাপ্তির নিবিড় আবরণের মধ্যে থেকে মানুষের পরিচয় আমরা পেতুম কী করে যদি না মানব সহসা আমাদের কাছে আবির্ভূত হ'ত কোনো প্রকাশবান্ মহাপুরুষের মধ্যে? মানুষের সেই মহাভাগ্য ঘটেছে, মানুষের সত্যস্বরূপ দেদীপ্যমান হয়েছে ভগবান বুদ্ধের মধ্যে, তিনি সকল মানুষকে আপন বিরাট হৃদয়ে গ্রহণ করে দেখা দিয়েছেন। ন ততো বিজুগুপ্সতে, আর তাঁকে গোপন করবে কিসে, দেশকালের কোন্ সীমাবদ্ধ পরিচয়ের অন্তরালে, কোন্ সদ্যপ্রয়োজনসিদ্ধির প্রলুব্ধতায়?

ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের। মানব-ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম ক'রে ব্যাপ্ত হল দেশে দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেননা বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে। সে কাউকে অবজ্ঞা করে নি, এইজন্যে সে আর গোপন রইল না। সত্যের বন্যায় বর্ণের বেড়া দিলে ভাসিয়ে; ভারতের আমন্ত্রণ পেঁাছল দেশ-বিদেশের সকল জাতির কাছে। এল চীন ব্রহ্মদেশ জাপান, এল তিব্বত মঙ্গোলিয়া। দুস্তর গিরি-সমুদ্র পথ ছেড়ে দিলে অমোঘ সত্যবার্তার কাছে। দূর হতে দূরে মানুষ বলে উঠল, মানুষের প্রকাশ হয়েছে, দেখেছি—মহান্তং পুরুষং তমসঃ পরস্তাৎ। এই ঘোষণাবাক্য অক্ষয় রূপ নিল মরুপ্রান্তরে প্রস্তরমূর্তিতে। অদ্ভুত অধ্যবসায়ে মানুষ রচনা করলে বুদ্ধ-বন্দনা, মূর্তিতে, চিত্রে, স্তূপে। মানুষ বলেছে, যিনি অলোক-সামান্য দুঃসাধ্য সাধন ক'রেই তাঁকে জানাতে হবে ভক্তি। অপূর্ব শক্তির প্রেরণা এল তাদের মনে; নিবিড় অন্ধকারে গুহাভিত্তিতে তারা আঁকল ছবি, দুর্বহ প্রস্তর-খণ্ডগুলোকে পাহাড়ের মাথায় তুলে তারা নির্মাণ করলে মন্দির, শিল্পপ্রতিভা পার হয়ে গেল সমুদ্র, অপরূপ শিল্পসম্পদ রচনা করলে, শিল্পী আপনার নাম করে দিলে বিলুপ্ত, কেবল শাশ্বত কালকে এই মন্ত্র দান করে গেল: বুদ্ধং

শরণং গচ্ছামি। জাভাদ্বীপে বরোবুদরে দেখে এলুম সুবৃহৎ স্তূপ পরিবেষ্টন ক'রে শত শত মূর্তি খুদে তুলেছে বুদ্ধের জাতককথার বর্ণনায়; তার প্রত্যেকটিতেই আছে কারুনৈপুণ্যের উৎকর্ষ, কোথাও লেশমাত্র আলস্য নেই, অনবধান নেই; এ'কে বলে শিল্পের তপস্যা, একই সঙ্গে এই তপস্যা ভক্তির— খ্যাতিলোভহীন নিষ্কাম কৃচ্ছ্রসাধনায় আপন শ্রেষ্ঠশক্তিকে উৎসর্গ করা চিরবরণীয়ের, চিরস্মরণীয়ের নামে। কঠিন দুঃখ স্বীকার ক'রে মানুষ আপন ভক্তিকে চরিতার্থ করেছে; তারা বলেছে, যে প্রতিভা নিত্যকালের সর্বমানবের ভাষায় কথা বলে সেই অকৃপণ প্রতিভার চূড়ান্ত প্রকাশ না করতে পারলে কোন্ উপায়ে যথার্থ করে বলা হবে 'তিনি এসেছিলেন সকল মানুষের জন্যে সকল কালের জন্যে'? তিনি মানুষের কাছে সেই প্রকাশ চেয়েছিলেন, যা দুঃসাধ্য, যা চিরজাগরূক, যা সংগ্রামজয়ী, যা বন্ধনচ্ছেদী। তাই সেদিন পূর্ব মহাদেশের দুর্গমে দুস্তরে বীর্যবান পূজার আকারে প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর জয়ধ্বনি, শৈলশিখরে, মরুপ্রান্তরে, নির্জন গুহায়। এর চেয়ে মহত্তর অর্ঘ্য এল ভগবান বুদ্ধের পদমূলে যেদিন রাজাধিরাজ অশোক শিলালিপিতে প্রকাশ করলেন তাঁর পাপ, অহিংস্র ধর্মের মহিমা ঘোষণা করলেন, তাঁর প্রণামকে চিরকালের প্রাঙ্গণে রেখে গেলেন শিলাস্তম্ভে।

এত বড়ো রাজা কি জগতে আর কোনো দিন দেখা দিয়েছে! সেই রাজাকে মাহাত্ম্য দান করেছেন যে গুরু, তাঁকে আহ্বান করবার প্রয়োজন আজ যেমন একান্ত হয়েছে এমন সেদিনও হয় নি যেদিন তিনি জন্মেছিলেন এই ভারতে। বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, অপবিত্র ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তা ধর্মের নামে আজ রক্তে পঙ্কিল করে তুলেছে এই ধরাতল; পরস্পর হিংসার চেয়ে সাংঘাতিক পরস্পর ঘৃণায় মানুষ এখানে পদে পদে অপমানিত। সর্বজীবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ ব'লে ঘোষণা করেছিলেন সেই তাঁরই বাণীকে আজ উৎকণ্ঠিত হয়ে কামনা করি এই ভ্রাতৃবিদ্বেষকলুষিত হতভাগ্য দেশে। পূজার বেদীতে আবির্ভূত হোন মানবশ্রেষ্ঠ, মানবের শ্রেষ্ঠতাকে উদ্ধার করবার জন্যে। সকলের চেয়ে বড়ো দান যে শ্রদ্ধাদান, তার থেকে কোনো মানুষকে তিনি বঞ্চিত করেন নি। যে দয়াকে, যে দানকে তিনি ধর্ম বলেছেন সে কেবল দূরের থেকে স্পর্শ বাঁচিয়ে অর্থদান নয়, সে দান আপনাকে দান—যে দানধর্মে বলে 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'। নিজের শ্রেষ্ঠতাভিমান, পুণ্যাভিমান, ধনাভিমান প্রবেশ ক'রে দানকে অপমানকর অধর্মে পরিণত করতে পারে এই ভয়ের কারণ আছে; এইজন্যে উপনিষদ্ বলেন: ভিয়া দেয়ম্। ভয় ক'রে দেবে। যে ধর্মকর্মের দ্বারা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারাবার আশঙ্কা আছে তাকেই ভয় করতে হবে। আজ ভারতবর্ষে ধর্মবিধির প্রণালীযোগে মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধার পথ চারি

দিকে প্রসারিত হয়েছে। এরই ভয়ানকত্ব কেবল আধ্যাত্মিক দিকে নয়, রাষ্ট্রীয় মুক্তির দিকে সর্বপ্রধান অন্তরায় হয়েছে এ প্রত্যক্ষ দেখছি। এই সমস্যার কি কোনো দিন সমাধান হতে পারে রাষ্ট্রনীতির পথে কোনো বাহ্য উপায়ের দ্বারা?

ভগবান্ বুদ্ধ একদিন রাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন। সে তপস্যা সকল মানুষের দুঃখমোচনের সংকল্প নিয়ে। এই তপস্যার মধ্যে কি অধিকারভেদ ছিল? কেউ ছিল কি ম্লেচ্ছ? কেউ ছিল কি অনার্য? তিনি তাঁর সব-কিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মূর্খতম মানুষেরও জন্যে। তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁর সেই এত বড়ো তপস্যা আজ কি ভারতবর্ষ থেকে বিলীন হবে?

জিজ্ঞাসা করি, মানুষে মানুষে বেড়া তুলে দিয়ে আমরা কী পেরেছি ঠেকাতে? ছিল আমাদের পরিপূর্ণ ধনের ভাণ্ডার: তার দ্বার, তার প্রাচীর, বাইরের আঘাতে ভেঙে পড়ে নি কি? কিছু কি তার অবশিষ্ট আছে? আজ প্রাচীরের পর প্রাচীর তুলেছি মানুষের প্রতি আত্মীয়তাকে অবরুদ্ধ করে, আজ দেবতার মন্দিরের দ্বারে পাহারা বসিয়েছি দেবতার অধিকারকেও কৃপণের মতো ঠেকিয়ে রেখে। দানের দ্বারা, ব্যয়ের দ্বারা, যে ধনের অপচয় হয় তাকে বাঁচাতে পারলুম না: কেবল দানের দ্বারা যার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয়, মানুষের প্রতি সেই শ্রদ্ধাকে সাম্প্রদায়িক সিন্ধুকের মধ্যে তালা বন্ধ করে রাখলুম। পুণ্যের ভাণ্ডার বিষয়ীর ভাণ্ডারের মতোই আকার ধরল। একদিন যে ভারতবর্ষ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর কাছে আপন মনুষ্যত্ব উজ্জ্বল করে তুলেছিল আজ সে আপন পরিচয়কে সংকুচিত করে এনেছে; মানুষকে অশ্রদ্ধা ক'রেই সে মানুষের অশ্রদ্ধাভাজন হল। আজ মানুষ মানুষের বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে; কেননা মানুষ আজ সত্যভ্রষ্ট, তার মনুষ্যত্ব প্রচ্ছন্ন। তাই আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের প্রতি মানুষের এত সন্দেহ, এত আতঙ্ক, এত আক্রোশ। তাই আজ মহামানবকে এই ব'লে ডাকবার দিন এসেছে: তুমি আপনার প্রকাশের দ্বারা মানুষকে প্রকাশ করো।

ভগবান্ বুদ্ধ বলেছেন, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে। কিছুদিন পূর্বেই পৃথিবীতে এক মহাযুদ্ধ হয়ে গেল। এক পক্ষের জয় হল, সে জয় বাহুবলের। কিন্তু যেহেতু বাহুবল মানুষের চরম বল নয়, এইজন্যে মানুষের ইতিহাসে সে জয় নিষ্ফল হল, সে জয় নূতন যুদ্ধের বীজ বপন করে চলেছে। মানুষের শক্তি অক্রোধে, ক্ষমাতে, এই কথা বুঝতে দেয় না সেই পশু যে আজও মানুষের মধ্যে মরে নি। তাই মানবের সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ক'রে মানবের গুরু বলেছেন: ক্রোধকে জয় করবে অক্রোধের দ্বারা, নিজের ক্রোধকে এবং অন্যের

ক্রোধকে। এ না হলে মানুষ ব্যর্থ হবে, যেহেতু সে মানুষ। বাহুবলের সাহায্যে ক্রোধকে প্রতিহিংসাকে জয়ী করার দ্বারা শান্তি মেলে না, ক্ষমাই আনে শান্তি, এ কথা মানুষ আপন রাষ্ট্রনীতিতে সমাজনীতিতে যতদিন স্বীকার করতে না পারবে ততদিন অপরাধীর অপরাধ বেড়ে চলবে; রাষ্ট্রগত বিরোধের আগুন কিছুতে নিভবে না; জেলখানার দানবিক নিষ্ঠুরতায় এবং সৈন্যনিবাসের সশস্ত্র ভ্রূকুটিবিক্ষেপে পৃথিবীর মর্মান্তিক পীড়া উত্তরোত্তর দুঃসহ হতে থাকবে—কোথাও এর শেষ পাওয়া যাবে না। পাশবতার সাহায্যে মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন 'অক্রোধেন জিনেৎ ক্রোধং', আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মনুষ্যত্বের জগদ্‌-ব্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন এল : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি নঞর্থক নয়, সদর্থক; যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধু-কর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে; যে মুক্তি রাগদ্বেষবর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়। আজ স্বার্থক্ষুধান্ধ বৈশ্যবৃত্তির নির্মম নিঃসীম লুব্ধতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি যিনি আপনার মধ্যে বিশ্ব-মানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

[বৈশাখী পূর্ণিমা : ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২। কলকাতা মহাবোধি সোসাইটি হলে বুদ্ধজন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ।]

রবীন্দ্রসাহিত্যে বুদ্ধপ্রসঙ্গ

১ প্রবন্ধে

গ্রন্থের নাম		প্রবন্ধের নাম
সমালোচনা, ১৮৮৮	...	অনাবশ্যক
আত্মশক্তি	...	স্বদেশী সমাজ, ১৯০৪
		দেশীয় রাজ্য, ১৯০৫
ভারতবর্ষ	...	সমাজভেদ, ১৯০১
		নববর্ষ, ১৯০২
		ব্রাহ্মণ, ১৯০২
		চীনেম্যানের চিঠি, ১৯০২
		অত্যুক্তি, ১৯০২
বিচিত্র প্রবন্ধ	...	মন্দির, ১৯০৩
প্রাচীন সাহিত্য	...	ধম্মপদং, ১৯০৫
সাহিত্য	..	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৯০২
		সাহিত্যের সামগ্রী, ১৯০৩
		সৌন্দর্যবোধ, ১৯০৬
সমাজ	...	কর্তব্যনীতি, ১৮৯৩
		ভারতবর্ষীয় বিবাহ, ১৯২৫
শিক্ষা	...	তপোবন, ১৯০৯
		বিদ্যাসমবায়, ১৯১৯
		শিক্ষার মিলন, ১৯২১
		বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ১৯৩২
		আশ্রমের শিক্ষা ১৯৩৬
রাজাপ্রজা	...	পথ ও পাথেয়, ১৯০৮
ধর্ম	...	উৎসবের দিন, ১৯০৫
সঞ্চয়	...	ধর্মের অধিকার, ১৯১১
পরিচয়	...	ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা, ১৯১১
জাপানযাত্রী	...	পরিচ্ছেদ সংখ্যা ৪ ১৯১৬
		১৩ ১৯১৬
		১৪ ১৯১৬
		১৫ ১৯১৬
		ধ্যানী জাপান ১৯২৯
লিপিকা	...	গল্প, ১৯২০
জাভা-যাত্রীর পত্র	...	পত্রসংখ্যা ১ ১৯২৭
		৭ ১৯২৭
		১৩ ১৯২৭

গ্রন্থের নাম		প্রবন্ধের নাম
জাভা-যাত্রীর পত্র	...	পত্রসংখ্যা ১৬ ১৯২৭
		১৯ ১৯২৭
মানুষের ধর্ম, ১৯৩৩	...	দ্বিতীয় অধ্যায়
		তৃতীয় অধ্যায়
ভারতপথিক রামমোহন	...	ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ১৯২৯
শান্তিনিকেতন	...	নবযুগের উৎসব
		স্বাভাবিকী ক্রিয়া, ১৯০৯
		আদেশ, ১৯০৯
		ব্রহ্মবিহার, ১৯০৯
		ভূমা, ১৯০৯
		মুক্তির পথ, ১৯০৯
		ভক্ত, ১৯০৯
		বিশ্ববোধ
		রসের ধর্ম
		সামঞ্জস্য
		সুন্দর, ১৯১১
কালান্তর	...	কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, ১৯১৭
		স্বাধিকারপ্রমত্তঃ, ১৯১৮
		বাতায়নিকের পত্র, ১৯১৯
		সত্যের আহ্বান, ১৯২১
		চরকা, ১৯২৫
		শূদ্রধর্ম, ১৯২৫
		বৃহত্তর ভারত, ১৯২৭
		নবযুগ, ১৯৩২
		আরোগ্য, ১৯৪০
পথের সঞ্চয়	...	যাত্রার পূর্বপত্র, ১৯১২
		অন্তর বাহির, ১৯১২
আত্মপরিচয়	...	ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ১৯৪০
সাহিত্যের স্বরূপ	...	সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা, ১৯৪১
বিশ্বভারতী	...	পরিচ্ছেদ সংখ্যা ১ ১৯১৯
		২ ১৯১৯
		৪ ১৯২২
		৮ ১৯২৩
		৯ ১৯২৩
		১১ ১৯২৪
		১৫ ১৯৩২
		পরিশিষ্ট ১৯২১
ইতিহাস, ১৯৫৫	...	ভারত-ইতিহাস-চর্চা
		গ্রন্থসমালোচনা, আবদুল করিমের 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত'। প্রথম খণ্ড

গ্রন্থের নাম		প্রবন্ধের নাম
বুদ্ধদেব	...	বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১০১৮ পৌষ
		বুদ্ধদেব, প্রবাসী ১০৪২ আষাঢ়
		মৈত্রীসাধন, প্রবাসী ১০৪৮ মাঘ
খৃস্ট	...	খৃস্ট, ১৯০৬

২ কবিতায়

গ্রন্থের নাম		কবিতার নাম
কথা	...	শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, ৫ কার্তিক, ১০০৪
		মস্তক বিক্রয়, ২১ কার্তিক, ১০০৪
		পূজারিনী, ১৮ আশ্বিন, ১০০৬
		অভিসার, ১৯ আশ্বিন, ১০০৬
		পরিশোধ, ২০ আশ্বিন, ১০০৬
		সামান্য ক্ষতি, ২৫ আশ্বিন, ১০০৬
		মূল্যপ্রাপ্তি, ২৬ আশ্বিন, ১০০৬
		নগরলক্ষ্মী, ২৭ আশ্বিন, ১০০৬
পুনশ্চ	...	শাপমোচন, পৌষ ১০০৮
পরিশেষ	...	বুদ্ধজন্মোৎসব (১) ২১ ফাল্গুন, ১০০০ (হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি)
		বোরোবুদুর, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭
		সিয়াম—প্রথম দর্শনে, ১১ অক্টোবর, ১৯২৭
		সিয়াম—বিদায়কালে, ৩০ আশ্বিন, ১০০৪
		বুদ্ধদেবের প্রতি, ২৪ অক্টোবর, ১৯০১
		প্রার্থনা, ২৯ জুলাই ১৯০০
		*বুদ্ধজন্মোৎসব (২), বৈশাখীপূর্ণিমা, ১০০৮ (সকলকলুষতামসহর)
পত্রপুট	...	কবিতা সংখ্যা ১৭, পৌষ, ১০৪৪
নবজাতক	...	বুদ্ধভক্তি, ৭ জানুয়ারি, ১৯০৮
জন্মদিনে	...	কবিতা সংখ্যা ৩, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১
		কবিতা সংখ্যা ৬, বৈশাখ ১০৪৭

*'নটীর পূজা' ও 'গীতবিতান' ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে এটি স্থান পায় নি। তবে 'বুদ্ধজন্মোৎসব' (১)-এর ন্যায় এটিও 'পরিশেষ' গ্রন্থের সংযোজন অংশে স্থান পেতে পারে।

৩ নাটকে*

মালিনী	১৮৯৬
রাজা	১৯১০

* 'নটীর পূজা' ও 'চণ্ডালিকা' প্রত্যক্ষত বৌদ্ধবিষয়ক এবং 'শোধবোধ' বাদে অন্যগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

অচলায়তন	১৯১২
গুরু	১৯১৮
অরূপরতন	১৯২০
নটীর পূজা	১৯২৬
শোধবোধ (প্রাসঙ্গিক উক্তি)	১৯২৬
চণ্ডালিকা	১৯৩৩
নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা	১৯৩৮
শ্যামা	১৯৩৯
শাপমোচন (কথিকা)	১৯৩১

৪ উপন্যাসে

(প্রাসঙ্গিক উক্তি)

ঘরে বাইরে, ১৯১৬	নিখিলেশের আত্মকথা
শেষের কবিতা, ১৯২৯	পরিচ্ছেদ ১৩, আশঙ্কা

উৎসনির্দেশ

ক বাংলা

গ্রন্থ

অজিতকুমার চক্রবর্তী

কাব্যপরিক্রমা, ১৩৫১ সংস্করণ

রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৩ সংস্করণ

অক্ষয়কুমার দত্ত

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় ভাগ, ২য় সংস্করণ

অমূল্যচন্দ্র সেন

অশোকলিপি

কৃষ্ণবিহারী সেন

অশোকচরিত, ১৮৯২

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

চৈতন্যচরিতামৃত, বহরমপুর সংস্করণ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বুদ্ধদেব-চরিত, ১৮৮৭

চারুচন্দ্র বসু

ধম্মপদ, ১৯০৪

অশোক বা প্রিয়দর্শী, ১৯১১

জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ, ২য় সংস্করণ

দীনেশচন্দ্র সেন

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সংস্করণ

বৃহৎবঙ্গ, প্রথম খণ্ড, ১৩৪১

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত, ১৮৯৯

ধর্মরাজ বড়ুয়া

হস্তসার, ১৮৯৩

নবীনচন্দ্র সেন

আমার জীবন

অমিতাভ, বুদ্ধজয়ন্তী সংস্করণ

নলিনীনাথ দাশগুপ্ত

বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম, ১৩৫৫

নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

চণ্ডীদাস পদাবলী

নীহাররঞ্জন রায়
বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব
পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত
সাহিত্য প্রকাশিকা, ৩য় খণ্ড
প্রবোধচন্দ্র বাগচী
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, ১ম সংস্করণ
ভারত ও চীন, ১ম সংস্করণ
ভারত ও ইন্দোচীন, ১ম সংস্করণ
প্রবোধচন্দ্র সেন
ধর্মবিজয়ী অশোক, ১৯৪৭
ধম্মপদ-পরিচয়, ১৯৫৩
ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬২
প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা
ভগিনী নিবেদিতা
প্রমথ চৌধুরী
নানাচর্চা
প্রমথনাথ বিশী
রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ
রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ২য় খণ্ড, ১ম ওরিয়েন্ট সংস্করণ
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, ১৩৬৭ সংস্করণ
রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ
রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ
রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ খণ্ড, ১ম সংস্করণ
ফুলচন্দ্র বড়ুয়া
বৌদ্ধরঞ্জিকা, ১৮৭৩
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বিবিধ প্রবন্ধ
সাম্য, শতবার্ষিকী সংস্করণ
বিজয়চন্দ্র মজুমদার
কথা ও গাঁথি, ১৮৯৩
কথানিবন্ধ, ১৯০৫
থেরীগাথা
পঞ্চকমালা, ১৯১০
যজ্ঞভস্ম, ১৯০৪
হেঁয়ালি, ১৯১৫
বিনয়তোষ ভট্টাচার্য
বৌদ্ধদের দেবদেবী, ১ম সংস্করণ
বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত
রবীন্দ্রস্মৃতি

বেণীমাধব বড়ুয়া
বৌদ্ধ গ্রন্থকোষ
বৃন্দাবন দাস
চৈতন্যভাগবত, হরিনাম প্রচার সমিতি সংস্করণ
ভগিনী নিবেদিতা
স্বামীজিকে যেরূপ দেখিয়াছি, ৩য় সংস্করণ
ভিক্ষু শীলভদ্র
বুদ্ধবাণী, ১ম সংস্করণ
মহেশচন্দ্র ঘোষ
বুদ্ধ-প্রসঙ্গ, ১৩৬৩ সংস্করণ
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
চণ্ডীমঙ্গল, অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত
মোহিতলাল মজুমদার
বাংলার নবযুগ, ১৩৫২ সংস্করণ
রজনীকান্ত গুপ্ত
ভারতকাহিনী, ১৮৮৩
রমা চৌধুরী
বেদান্ত-দর্শন, ২য় সংস্করণ
রমেশচন্দ্র মজুমদার
বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় সংস্করণ
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙ্গালার ইতিহাস, ১০২১
রামদাস সেন
ঐতিহাসিক রহস্য, ২য় ভাগ, ১৮৭৬
ঐতিহাসিক রহস্য, ৩য় ভাগ, ১৮৭৯
বুদ্ধদেব, ১৮৯১
রামাই পণ্ডিত
শূন্যপুরাণ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
রাহুল সাংকৃত্যায়ন
বৌদ্ধ দর্শন, ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত
শশিভূষণ দাশগুপ্ত
উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস, ১ম সংস্করণ
বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি, ১ম সংস্করণ
ভারতীয় সাধনার ঐক্য, ১৩৫৮ সংস্করণ
শরৎকুমার রায়
বুদ্ধের জীবন ও বাণী, ১৯১৪
বৌদ্ধ-ভারত, ১৯২৩
সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়
সমন্বয় মার্গ, ১ম সংস্করণ
সতীশচন্দ্র ঘোষ
চাক্‌মা জাতি, ১ম সংস্করণ

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
 বৌদ্ধধর্ম, ২য় সংস্করণ
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
 বেলাশেষের গান
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
 বিবেকানন্দ চরিত, ১ম সংস্করণ
সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত
 শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব, বুদ্ধ-জয়ন্তী সংস্করণ
সুকুমার সেন
 পরিজন-পরিবেশে রবীন্দ্র-বিকাশ, ১ম সংস্করণ
 প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, ১৩৫৩ সংস্করণ
 বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ
 মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, ১৩৫২ সংস্করণ
সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়
 মৈত্রী-সাধনা, ১ম সংস্করণ
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
 রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ
সুরেন্দ্রনাথ সেন
 অশোক, ১৯৪০
স্বামী বিবেকানন্দ
 কর্মযোগ, ২০শ সংস্করণ
 দেববাণী, ১৩৫৩ সংস্করণ
 পত্রাবলী, ১ম ভাগ
 পত্রাবলী, ২য় ভাগ
 পরিব্রাজক, ৫ম সংস্করণ
 বর্তমান ভারত, ৬ষ্ঠ সংস্করণ
 মহাপুরুষ প্রসঙ্গ, ১৪শ সংস্করণ
 শিকাগো বক্তৃতা, ৮ম সংস্করণ
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
 বৌদ্ধধর্ম, ১৯৪৮
 হাজার বছরের বৌদ্ধ গান ও দোহা, ১৯১৬
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
 রবীন্দ্র-দর্শন, ২য় সংস্করণ

প্রবন্ধ

নগেন্দ্রনাথ বসু
 বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ, হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা, প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৩৮
প্রবোধচন্দ্র সেন
 রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৯, শ্রাবণ-আশ্বিন

প্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীমন্তকুমার জানা

সিংহল ও রবীন্দ্রনাথ, সাপ্তাহিক বসুমতী, ২০শে বৈশাখ, ১৩৭২

বেণীমাধব বড়ুয়া

বাংলাসাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ-অবদান, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫২শ ভাগ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৫২

ভবতোষ দত্ত

বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ, জগজ্জ্যোতিঃ, প্রবারণা সংখ্যা, ১৩৬৪

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬৬ বর্ষ রবীন্দ্র-সংখ্যা, ১৩৭১

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী-চীনভবন, গীতবিতান পত্রিকা, ১৩৬৮ বৈশাখ

সুধাংশুবিমল বড়ুয়া

ধর্মপাল ও বিবেকানন্দ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪
বাঙালি বৌদ্ধদের পূজাপার্বণ ও উৎসব, মাসিক বসুমতী, ১৩৭০ পৌষ
বাঙালিমানস ও বৌদ্ধসংস্কৃতি, প্রবাসী, ১৩৬৯ আষাঢ়
বিবেকানন্দের বুদ্ধভক্তি, উদ্বোধন, ১৩৭১ বৈশাখ
বিশ্বভারতী ও বৌদ্ধ ভাবধারা, ভারতবর্ষ, ১৩৭৩ বৈশাখ
বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চা, চিত্রাঙ্গদা, ১৩৭৪ বৈশাখ
বৌদ্ধধর্মবির্জিত দেশসমূহে রবীন্দ্রনাথ, নালন্দা, ১৩৭০ কার্তিক

খ পালি

গ্রন্থ

অত্থসালিনী, পি. ভি. বাপাত ও আর. ডি. ভাদেকর সম্পাদিত
অঙ্গুত্তরনিকায়, নালন্দা দেবনাগরী পালি সিরিজ
অভিধর্ম্মার্থ সংগ্রহ, বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী অনূদিত
উদানং, জ্যোতিপাল ভিক্ষু অনূদিত
জাতক নিদানকথা, এন. কে. ভাগবত সম্পাদিত
থেরীগাথা, ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত
দীঘনিকায়, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত
ধম্মপদ, চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত
ধম্মপদ, ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত
ভিক্খু পাতিমোক্খ ও ভিক্খুনী পাতিমোক্খ, বিধুশেখর ভট্টাচার্য অনূদিত
মজ্ঝিমনিকায় ১ম খণ্ড, বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত
মজ্ঝিমনিকায়, ২য় খণ্ড, ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত
মহাপরিনিব্বান সুত্তং, ধর্মরত্ন মহাস্থবির সম্পাদিত
মহাবগ্গ, প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত
সংযুত্তনিকায়, পালি টেক্সট সোসাইটি, লন্ডন
সুত্তনিপাত, ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত

নামনির্দেশ